

PRESENTED

9

31247 9/204
निजामुद्दौल

With best Compliments

NIR MOY-C LOJITA.
H. O. 78/1, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-700013,

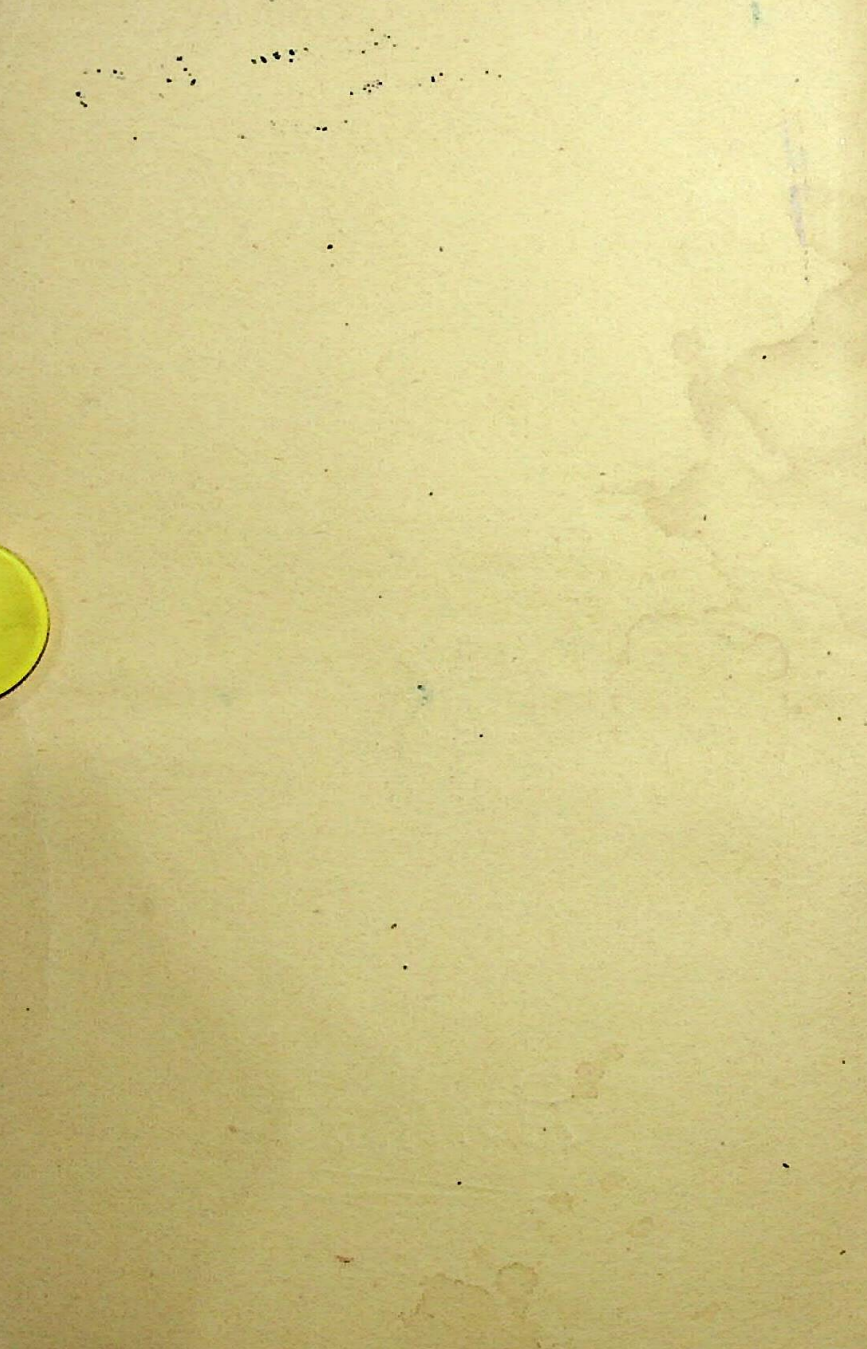
LIBRARY

No. 9/204

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

निजामुद्दौल

५



৪৮৮

LIBRARY

No... ৭/২০৪

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

সারস্বত ব্রাহ্মসমিতি সংখ্যা ২

যোগীপুরু

বা

যোগ ও সাধন-পদ্ধতি

জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগক্কাষ্টাঙ্গসংযুতম্ ।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥

—যোগী বাজবল্লভ



পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য তিন টাকা]

প্রকাশক
শ্রীমতী আত্মানন্দ সরস্বতী
সারস্বত মঠ
আসাম

মুদ্রাকর
শ্রীমন্তোষ কুমার পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩১১ হায়াং খান লেন,
কলিকাতা—২
ফোন : ৩৫-৪৬২১

[প্রথম সংস্করণ ১৩১২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৭, তৃতীয় সংস্করণ ১৩২১,
চতুর্থ সংস্করণ ১৩২৫, পঞ্চম সংস্করণ ১৩২৮, ষষ্ঠ সংস্করণ
১৩৩১, সপ্তম সংস্করণ ১৩৩৩, অষ্টম সংস্করণ ১৩৩৬,
নবম সংস্করণ ১৩৪৩, দশম সংস্করণ ১৩৫৫,
একাদশ সংস্করণ ১৩৫৯, দ্বাদশ সংস্করণ
১৩৬৫,—ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৩৭০,
চতুর্দশ সংস্করণ—১৩৭৫]

—প্রাপ্তিস্থান—

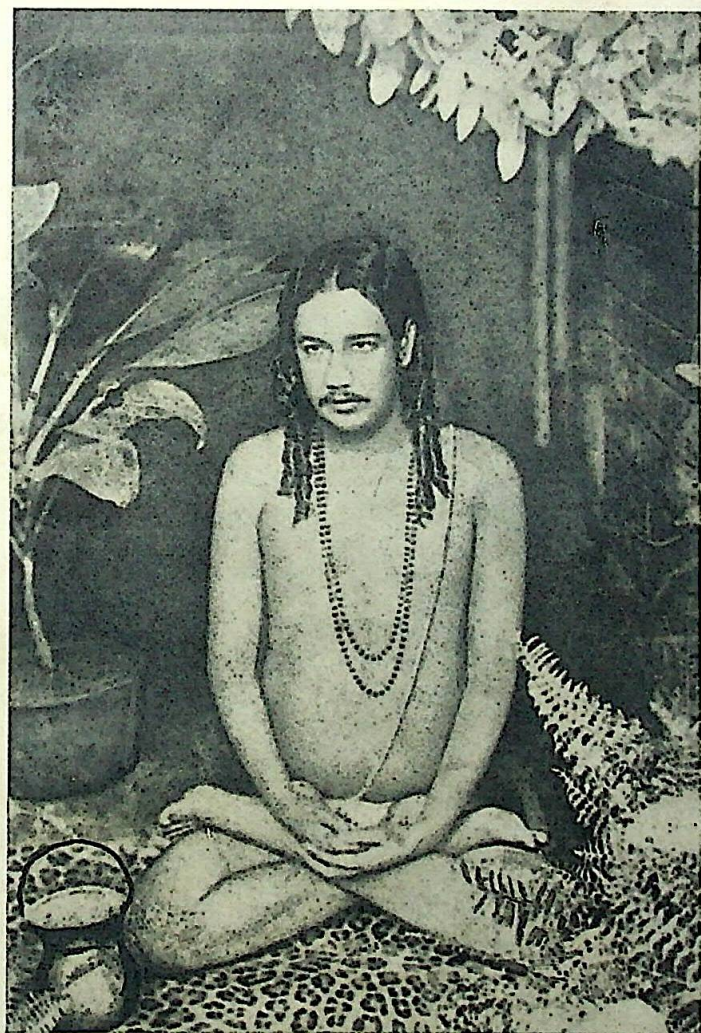
- ১। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)
- ২। দক্ষিণ বঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, পোঃ হালিসহর (২৪ পরগণা)
- ৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২১১, শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলকাতা)

কলিকাতা-১২

9/204

With best Compliments of.

NIRAMOY-C LUTTA.
H. O. 78/1, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-700013,



শ্রীমৎ ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস



ওঁ তৎ সৎ

উৎসর্গ

LIBRARY

No...

Shri Shri Ma Anandamayi
BANARAS

প্রাণের প্রবতারা—

জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা

উদাসীনাচার্য্য শ্রীমৎ সুমেরদাসজী

গুরুদেব শ্রীচরণসরোরুহেষু—

গুরো !

আমার প্রথম গুরু সংসার—অর্থাৎ পিতা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, মাতামহী, মাতৃষসা, আত্মীয়স্বজন। কেননা, তাঁহাদের ব্যবহারে বুঝিলাম, মায়া-মমতা স্বার্থের দাস। স্বার্থহানি হইলে পিতা—পুত্রস্নেহ বিসর্জন দিতে পারেন, ভাই-ভগ্নী - শত্রু হইতে পারে, স্ত্রী-পুত্র—বুকে ছোরা বসাইতে পারে, মাতামহী-মাতৃষসা—বিষ উদগীরণ করিতে পারেন, আত্মীয়-স্বজন—পদদলিত করিতে পারেন। যদিও সংসারে কোন অভাব অনুভব করি নাই,

তথাপি অলক্ষ্যে কে যেন জানাইয়া দিত, “সংসারে সকলেই স্বার্থ-দাস।” স্বার্থান্ধগণ কেহই দেখিলেন না যে তাঁহাদের ব্যবহারে আমার হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত হইতেছে। আরও বুঝিলাম, রোগে-শোকে মানবের পঙ্করাস্থি ভগ্ন, হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক ও মৰ্ম্মগ্রস্থি শিথিল হয়। ক্রমে বুঝিলাম, মহতে দরিদ্র দেখিলে উপহাস করে—নিরন্ন বা ব্যাধিগ্রস্তের কাতর প্রার্থনা পাগলের প্রলাপবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেয়—দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখিয়া পাপের ফল বলিয়া ঘৃণা করে। হায়! মনুষ্যহৃদয় দয়ামায়া, সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতার পরিবর্তে কেবল হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং প্রথম শিক্ষায় সংসারে বিতুষণ জন্মিল। তাই বলিতেছি “সংসার প্রথম গুরু”।

দ্বিতীয় গুরু—সাবিত্রী পাহাড়ের পরমহংস শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। যখন সংসারের নিষ্ঠুরতায় ও কালের করাল দংষ্ট্রাঘাত-জনিত কাতরতায় ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ত্রায় লুটিতেছিলাম—দাবদন্ধ হরিণের ত্রায় ছুটিতেছিলাম, তখন এই মহাত্মার কৃপায় শান্তিলাভ করিলাম; ভ্রম ঘুচিল—চমক ভাঙ্গিল। তিনি বেদ, পুরাণ সংহিতা, দর্শন, গীতা ও উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রসাহায্যে বুঝাইলেন, “সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ। জীব সাংসারিক স্তখে মুগ্ধ হইয়া জগন্মাতা ও পরমপিতার চরণ বিশ্বত হয়। জীবের চৈতন্যসম্পাদনজন্তই মঙ্গলময় জগদীশ্বর-কর্তৃক এ নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি হইয়াছে।” আমি এতদিনে জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। স্বল্পায়াসে নিগমের এই নিগূঢ় বাক্য বুঝিতে পারায় তিনি সানন্দে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিগমানন্দ নাম প্রদান করিলেন।

তৃতীয় বা শেষ গুরু আপনি। বিপথে পড়িয়া যখন পরমহংস-
 দেবের উপদেশে পথপ্রদর্শক অনুসন্ধান করিতেছিলাম, পূর্বজন্মের
 স্মৃতি-ফলে তখন আপনার চরণ দর্শন হইল। আপনার কৃপায়
 নবজীবন লাভ করিয়া, পূর্ণ সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়াছি।
 অভূতপূর্ব বিমল আলোকচ্ছটা দর্শনে নিয়ত শিরায় শিরায়
 আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের তায় মানব
 সুখের আশায় লালায়িত হইয়া বৃথা সংসারে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।
 আজি আমি গৃহায়ত্ত্ব হইয়াও অক্ষুণ্ণ মনে জীবনকে ধৃত ও শ্লাঘ্য
 জ্ঞান করিতেছি। যদি একজনও সংসারপীড়িত ব্যক্তি পূর্ণ
 সুখ-শান্তি লাভের বৃত্ত করে, সেই আশায় গুরুপদটি সাধন-ভজনের সুগম
 পন্থা গ্রহণকারে প্রকাশ করতঃ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার তায় আপনার চরণে
 অর্পিত হইল।

বিদায়-গ্রহণকালে নিবেদন, আপনার চরণসান্নিধ্যে অবস্থান-
 কালে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, “সন্তানের শত অপরাধ
 পিতার নিকট ক্ষমাহ” এই ভাবিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করতঃ
 আশীর্বাদ করুন—যেন অজপার শেষ জপে আপনার জপ সমর্পণ
 করিতে পারি। আরও প্রার্থনা, যাহারা আমাকে ‘আমার’ বলিয়া
 জানিয়াছে, তাহাদের লইয়া যেন চরমে আপনার পরমপদে লীন হইতে
 পারি। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

দেবতায় দর্শনঞ্চ করুণাবরুণালয়ম্।

সর্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুশ্রণমাম্যহম্ ॥

সেবক—শ্রীগুরুচরণ

গ্রন্থকারের নিবেদন

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরধৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীঃ সরস্বতীঃ ব্যাসঃ ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

শ্রীমদগুরুনারায়ণ-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-শ্রুদ্দমান মকরন্দ-পানে আনন্দিত হইয়া তদীয় কৃপায় অভিনব উত্তমে “যোগীগুরু” এতদিনে লোক-লোচন-গোচর করিলাম ।

আমাদের দেশে প্রকৃত যোগশাস্ত্র বা যোগোপদেষ্টা গুরু নাই । পতঞ্জলির যোগসূত্র বা শিব-সংহিতা, গোরক্ষ-সংহিতা, বাজ্রবল্ল্য সংহিতা প্রভৃতি যাহা যোগশাস্ত্র নামে প্রচলিত আছে, তৎপ্রদর্শিত পন্থায় সাধনে প্রবৃত্ত করাইরা প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারেন, এমন কেহ আছেন কি ? যোগ, তন্ত্র ও স্বরোদয়শাস্ত্র, সিদ্ধ সাধকের নিকট উপদেশপ্রাপ্ত না হইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই । যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, পাণ্ডিত্যবলে উক্ত শাস্ত্র বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই । যোগীগুরুও নিতান্ত দুর্লভ ; গৃহস্থগণের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । আমি বহুদিন তীর্থ ও পার্শ্বত্যাগ বন-ভূমিতে বহু সাধুসন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি, আজকাল যেসকল জটাজুটসমায়ুক্ত সন্ন্যাসীর বিরাট মূর্তি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে হাজারকরা একজন যোগী বা তন্ত্রোক্ত সাধক দুর্লভ । অনেকে পেটের দায়ে অনন্তোপায় হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে ; তাহাদের সাধনে প্রবৃত্তি ত যায়ই না, পরন্তু কতকগুলি ভেঙ্কি বুজুকি শিক্ষা করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্তে

বিনা-পরিশ্রমে উদর পোষণ করিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, “গোত্র হারাইলে কাশুপ, আর জাতি হারাইলে বৈষ্ণব”—এখন এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক গৃহস্থ বা সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগীশ্বর নিতান্ত বিরল। থাকিলেও তাঁহাদের দৌড় প্রাণায়াম পর্য্যন্ত; তাহাও যে উপযুক্ত শিক্ষায় অনুষ্ঠিত, বিশ্বাস হয় না। আজকাল বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি দুই একখানি যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও কবিত্বের কৃতিত্ব ব্যতীত সাধন-পদ্ধতির কোন স্ফুট পছন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসাদারগণের বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পড়িয়া কোন কোন সাধন-প্রয়াসী ব্যক্তি ঐ পুস্তক ক্রয় করেন, পাঠান্তে যখন বুঝিতে পারেন, “চাবি গুরু হাতে”, তখন অর্থনাশে মনস্তাপে শান্তি-স্বখে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ ঐসকল পুস্তক-প্রদর্শিত প্রাণায়ামাদি করিতে গিয়া কষ্টভোগ ও দেহ নষ্ট করেন। বহু মহাপুরুষ-পরম্পরায় প্রকাশিত জ্ঞানগরিমা গণ্ডুষে উদরসাৎ করিতে গেলে পরমার্থ লাভদূরের কথা, অনর্থউৎপাদিত হইবে, ঐব সত্য।

সমস্ত সাধনার মূল ও সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। স্বথের বিষয় এই যোগ-সাধনে আজকাল অনেকেরই প্রবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তি হইলে কি হইবে? উপদেশ ও শিক্ষা দেয় কে? গুরু ব্যতীত এই নিগূঢ় পথের প্রদর্শক কে? আজকাল যে সকল ব্যবসাদার গুরু দৃষ্ট হন, তাঁহারা ব্যবসার খাতিরে মন্ত্রদান করিয়া বেড়ান, শিশুর অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইবেন কিরূপে? বরং পৈতৃক গুরুদেব অপেক্ষা অনেক স্থলেই

শিশুকে জ্ঞানী দেখিতে পাওয়া যায়। আর শাস্ত্রে যে সকল যোগপন্থা উক্ত হইয়াছে, তাহা কোন যোগীগুরু হাতে-কলমে শিখাইয়া না দিলে তাহাতে ফললাভ করা সুদূরপরাহত। আর এক কথা, কলির জীব স্বল্পায়ু ও দুর্বল; বিশেষতঃ চব্বিশ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও আজকাল অনেকে অল্পবয়স্ক সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সদগুরু মিলিলেও অষ্টাদশাধনের কঠোর নিয়ম, সংযম ও প্রাণায়ামাদির আয় কায়িক ও মানসিক কঠিন পরিশ্রম এবং অভ্যাসের সুদীর্ঘ সময় কাহারও নাই। এই সব প্রতিবন্ধকবশতঃ কাহারও সাধন-প্রবৃত্তি থাকিলেও তাহা পক্ষ বিক্ষকলে কাকচঞ্চুপুটাঘাতের আয় বৃথা। এই সকল অভাব ও প্রতিবন্ধক দূর করাই আমার এই গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য। আমি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন বৃথা পরিশ্রম ও সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করি, পরে জগদগুরু ভূতভাবন ভবানীপতির কৃপায় সদগুরু লাভ করিয়া তদীয় কৃপায় লুপ্তপ্রায় গুপ্ত যোগসাধনের সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল-উপায়াদি শিক্ষা করিয়াছি। বহুদিন ধরিয়া সেই সকল কৌশলে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি। তাই আজ ভারতবাসী সাধক ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্র অসীম, জ্ঞান অসীম, সাধন অনন্ত। যে সকল সাধন-কৌশল শিক্ষা করিয়াছি, তাহার সমস্ত আলোচনা ও আন্দোলন করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে; আয়ত্তাধীন হইলেও মুদ্রিত করিতে না পারিলে কিরূপে সাধারণের উপকার হইবে? আমার ত “অন্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ”। মুদ্রিত করিতে মুদ্রার প্রয়োজন। বিশেষতঃ নেতি, ধৌতি, বস্তি, লৌলিকী, কপালভাতি ও গজকারিণী প্রভৃতি হঠযোগাঙ্গসাধন গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীরই সাজে। এই “হা-অন্ন,

যো-অন্ন” বাজারে চাকুরী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে সময় কুলায় না, সাধনের সময় এবং নিয়ম পালন হইবে কিরূপে? আর বাঙ্গালীর হঠাৎগাতি সাধনের উপযুক্ত শরীরও নয়। আরও এক কথা, যোগ-সাধনের এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে, যাহা মুখে বলিয়া, হাতে-কলমে দেখাইয়া না দিলে লেখনীসাহায্যে বুঝাইতে পারা যায় না। অকারণ সেই সমস্ত গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি বা বাহাদুরী লাভ করা এই পুস্তক-প্রকাশের উদ্দেশ্য নহে। তবে যদি কাহারও ঐরূপ সাধনে প্রবৃত্তি হয় এবং তিনি যদি অল্পগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হন, পরীক্ষা দ্বারা উপযুক্ত বুঝিতে পারিলে যত্নের সহিত শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।*

কলিকালে দুর্বল, স্বল্পায়ু ও অন্নসংস্থানের জন্ম অনিয়মিত পরিভ্রমকারী মানবগণের জন্ম যোগেশ্বর জগদগুরু মহাদেব সহজ ও সুখসাধ্য লয়যোগের বিধান করিয়াছেন। প্রাণায়ামাদি প্রকৃত যোগ নহে, যোগসাধনের বিশেষ অল্পকূল ও সহায়কারী বটে; কিন্তু অনিয়ম ও বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিকা, শ্বাস-কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মস্তকের পীড়াদি নানা রোগ উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া কয়েকটি সহজসাধ্য যোগদান-পদ্ধতি এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম, যাহাতে সাধারণে ইহার মধ্যে যে কোন একটি ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। কিন্তু লিখিত নিয়ম ও উপদেশমত কার্য্য করা চাই। নিজে নিজে ওস্তাদি এবং Principle খাটাইতে গেলে ফল হইবে না। যে কোন একটি ক্রিয়া নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ শরীর সুস্থ নীরোগ হইবে, মস্ত্রে অপার আনন্দ ও শান্তি বোধ করিবেন এবং দেহস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তির চৈতন্য ও আত্মার মুক্তি হইবে।

* গ্রন্থকার ১৩৪২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ মহাসমাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

যোগসাধন করিতে হইলে উত্তমরূপে দেহতত্ত্ব ও দেহস্থিত চক্রাদি অবগত হইতে হয়, নতুবা সাধনে কোন ফল হয় না। কিন্তু তৎসমুদয় যথাযথ বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সে সুদীর্ঘ সময় ও অজস্র গোলারূতি রজতখণ্ড কোথায় পাইব? তবে যে কয়েকটা সাধনকৌশল প্রদর্শিত হইল, সেই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীর বাহ্য অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহা তত্তৎস্থানে যথাযথ লিখিত হইয়াছে; সাধারণের বুঝিবার মত ভাষা ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করি নাই। ইহাতেও যদি কাহারও কোন বিষয় বুঝিতে গোলযোগ ঘটে, আমার নিকট উপস্থিত হইলে কিম্বা পত্র লিখিলে সংশয় অপনোদন করিয়া দিব।

স্বধর্মনিরত পাঠকগণের মধ্যে অনেকে মন্ত্রজপাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রজপ করিয়া কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। তাহার কারণ কি? মন্ত্র-জপ-রহস্য-সাধন ও জপনমর্পণ-বিধি ব্যতিরেকে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না; সূতরাং জপফল প্রাপ্ত হওয়া অনসম্ভব। বিধিপূর্বক জপ-রহস্যাদি সম্পাদন করিতে না পারিলে ও মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুরচক্রে তাহার ক্রিয়াদি না করিলে কখনই মন্ত্রের চৈতন্য হইবে না, সূতরাং প্রাণহীন দেহের আয় প্রাণহীন মন্ত্র জপ করিলেও কোন ফল হইবে না। ইহা আমার মনগড়া কথা নহে; শাস্ত্রে উক্ত আছে—

চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।

ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটীজপৈরপি ॥

—তন্ত্রসার

অর্চৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র, অর্চৈতন্য মন্ত্র লক্ষকোটী জপেও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবেই দেখুন, মালা বোলা লইয়া শুধু বাহ্যাড়ম্বর

ও অনুষ্ঠান করিলে মন্ত্রজপে ফল পাইবেন কিরূপে? কিন্তু কয়জন গুরু দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে মন্ত্র-চৈতন্তের উপায়াদি শিক্ষা দিয়া থাকেন? হয় ত গুরুদেবই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কাজেই শিষ্যবেচারী গুরুদত্ত সেই নীরস শুষ্ক মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিয়া যে তিমিরে—সেই তিমিরে!—তাহার হৃদয়ক্ষেত্রের অবস্থা সেই এক প্রকার! আজকাল এই শ্রেণীর গুরুদেবগণ বলিয়া থাকেন, “কলিকালে মানবগণ সাধু-গুরু মানে না”। কিন্তু সেইটি যে নিজেদের ক্রটিতে হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করেন না।* কেবল মন্ত্র দিয়া নিয়মিতরূপে বার্ষিকী আদায় করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলে ভক্তি থাকে কিরূপে? বিজ্ঞা-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, সাংসারিকতা বা ক্রিয়া-কর্মে শিষ্য হইতে গুরুদেবের কোন প্রভেদ নাই। শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া সংসারে ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ করিবার গুরুদেবের নিজেরই এক ক্রান্তি ক্ষমতা নাই, তাহার প্রতি প্রীতি, ভক্তি, সম্মান থাকিবে কিরূপে? এই সকল বিবেচনা করিয়া জাপকগণের উপকারার্থে মন্ত্রচৈতন্তের সহজ ও স্বগম পন্থা শেষকল্পে লিখিত হইল। সাধকগণ জপ-রহস্ত অবগত হইয়া পশ্চাত্তপ্ত প্রণালীতে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রচৈতন্ত হইবে এবং জপে সিদ্ধিলাভ করিবেন।

এই গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় আমার পুঁথিগত বিজ্ঞা নহে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের রূপায় যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া আমি সাফল্য লাভ করিয়াছি, তদীয় আদেশানুসারে তাহারই মধ্যে কয়েকটি সহজ ও সুখসাধ্য পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, নিজে নিজে শাস্ত্র পড়িয়া বা কাহারও ভড়ং-ভাড়ং

* মন্ত্রপ্রদান করিয়া বিধিপূর্বক মন্ত্রচৈতন্ত করাইয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়া দিতে পারিলে উন্নতকণ্ঠে বলিতেছি, অতি পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হইবে।

বচন-রচন দেখিয়া শুনিয়া তদীয় উপদেশে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। আনাড়ী ব্যবসাদারের উপদেশে ক্রিয়ালুপ্তান করিলে ফলনাভের আশা নাই, বরঞ্চ প্রত্যাবারভাগী হইবেন; শ্বাস-কাসাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, জন্মের মত সাধন-ভজনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং অকালে কালকবলে পতিত বা আজীবন স্বেপার্জিত রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত যোগপদ্ধতিকয়টি অতি সহজ ও সুখসাধ্য এবং সিদ্ধ-যোগিগণের অল্পমোদিত। ইহার মধ্যে যে-কোন একটি ক্রিয়া অল্পষ্ঠান করিলে নীরোগ হইয়া ও তৃপ্তিলাভ করিয়া দিন দিন মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। তবে ঘাঁহারা অজ্ঞানমলিন পৃথিবীতে পূর্ণ জ্ঞানপ্রভাবের বিমল আলোকচ্ছটা আকাজক্ষা করেন, অচঞ্চল অনন্ত আলোকাধার সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী মহা-আলোকময় মহাপুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহাদের মহাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবার নহে।

প্রথম প্রথম বায়ুধারণা অভ্যাসকালে অক্ষি, কর্ণ, পঞ্জরাস্থি ও শিরোবেদনা অল্পভূত হয়; এমন কি শ্বাস-কাসের লক্ষণও প্রকাশ পায়। হঠযোগ প্রভৃতিতে ঐরূপ রোগাদির উদ্ভবের কথা বটে, কিন্তু এই গ্রন্থসন্নিবেশিত সাধনে সে আশঙ্কা নাই। তথাপি স্বরকল্পে শরীর সুস্থ, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী এবং বলি-পলিরহিত কান্তিবিশিষ্ট করিবার কৌশল বর্ণিত হইল। পাঠকগণ! পরীক্ষা করিয়া সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

মানব ভুল-ভ্রান্তির দাস, তাহাতে আমার বিজ্ঞাবুদ্ধির পুঁজি নাই বলিলেও হয়। সদা-সর্বদা আমার নিকট শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে এবং এলাহাবাদ কুম্ভমেলা দর্শনে গমন করিব, এই জগৎ

তাড়াতাড়ি কাপি লিখিয়াছি, স্মৃতিরাং ভুল অবশ্যজ্ঞাবী। মরাল-
ধর্ম্মানুসরণকারী জাপক ও সাধকগণ দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া
স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইলে সফলকাম হইবেন এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থকারও সুখী
হইবে।

আসাম প্রদেশস্থ গারোহিলস্‌এর হাজং বস্তির আমার পরমভক্ত
অপত্যতুল্য শ্রীমান্ সীতারাম সরকার ও শ্রীমদনমোহন দাস কায়মনঃপ্রাণে
যে রূপ সেবা ও ব্যয়াদি বহন করিয়া আমার সাধনকার্যে সহায়তা করিয়াছে
তাহা প্রকাশ করিবার মত বাগ্‌বিভব আমার নাই। তাহাদের উপকারের
প্রত্যুপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। এই পরপিণ্ডভোজী ভিখারীর
আজকাল আশীর্বাদ সম্বল; তাই কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি,
বিরূপাক্ষবক্ষোবিহারিণী দাক্ষায়ণীর কৃপায় উক্ত বাবাজিহ্ম স্মৃষ্ণ ও কার্যক্ষম
শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সোপানে
অধিষ্ঠিত হউক।

পাতিলাদহ পরগণার তহশীল-কর্ম্মচারী আমার প্রিয়ভক্ত শ্রীউমাচরণ
সরকার ও তৎপত্নী শ্রীমতী হেমলতা দাসী সর্ব বিষয়ে এই গ্রন্থপ্রকাশে
যে রূপ যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা
নাই। ফল কথা, তাহাদের সাহায্য না পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা
অসম্ভব হইত।

এই পুস্তক প্রকাশের জন্ত শিক্ষিত বহু মহাত্মার উৎসাহ ও আর্থিক
সাহায্য পাইয়াছি। তাহার মধ্যে হরিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার আশ্রিত-
প্রতিপালক স্বধর্ম্মনিরত অকপটহৃদয় ও আমার অকারণ-বন্ধু প্রখ্যাতনামা
শ্রীযুক্ত বাবু রায় সারদাপ্রসাদ সিংহ আগাগোড়া যে রূপ সাহায্য করিয়াছেন
ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। হরিপুরনিবাসী উকীল
উদারহৃদয় বাবু নলিতমোহন ঘোষ বি,এল্, প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক যোগসাধনরত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সংস্কৃত-শিক্ষক মিষ্টভাষী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, পোষ্টমাষ্টার বিনয়ী বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি শিক্ষিত মহোদয়গণ স্বতঃ পরতঃ যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বমঙ্গলার নিকট তাঁহাদের সর্বদ্বন্দ্বীণ মঙ্গল কামনা করি।

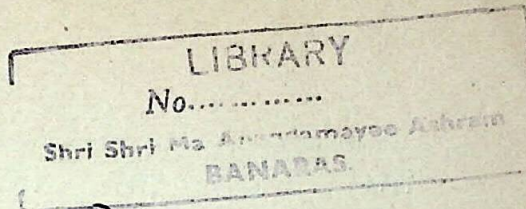
বিদায়গ্রহণ সময়ে পাঠকগণের নিকট সাহুস্র নিবেদন এই যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই আমার সকল আশা ও পরিশ্রম সফল হইবে। আমি নাম-যশ চাই না; এ বাজারে অখ্যাতিরও অভাব নাই। কিন্তু কিছুতেই আমার ভ্রক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; এই ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে একজন সাধকও যদি আমার বর্ণিত ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে লেখনীধারণ সার্থক ও গৃহান্নশূন্য হইয়াও অক্ষুণ্ণ-মনে জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি—

গারোহিল-যোগাশ্রম
১০ই পৌষ—বড়দিন
১৩১২ বঙ্গাব্দ

}

ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু
দীন—শ্রীনিগমানন্দ

৪৪০



সূচীপত্র

—:—

বাণী-আবাহন গ্রন্থমুখ

প্রথম অংশ—যোগকল্প

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকারের সাধন-পদ্ধতি সংগ্রহ	১	৭ম—ললনাচক্র	৫২
যোগের শ্রেষ্ঠতা	২০	৮ম—গুরুচক্র	৫২
যোগ কি ?	২৬	৯ম—সহস্রার	৫৩
শরীর-তত্ত্ব	২৮	কামকলা-তত্ত্ব	৫৫
নাড়ীর কথা	৩১	বিশেষ কথা	৫৫
বায়ুর কথা	৩৪	ষোড়শাধারং	৫৬
দশ বায়ুর গুণ	৩৬	ত্রিলক্ষ্যং	৫৬
হংসতত্ত্ব	৩৮	ব্যোমপঞ্চকং	৫৭
প্রণবতত্ত্ব	৪০	গ্রহিত্রয়	৫৭
কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব	৪৩	শক্তিত্রয়	৫৭
নবচক্রং	৪৬—৫৪	যোগতত্ত্ব	৫৮
১ম—মূলাধারচক্র	৪৬	যোগের আটটি অঙ্গ	৫৯—৭২
২য়—স্বাধিষ্ঠানচক্র	৪৭	যম	৬০
৩য়—মণিপূরচক্র	৪৮	নিয়ম	৬২
৪র্থ—অনাহতচক্র	৪৯	আসন	৬৫
৫ম—বিষুদ্বচক্র	৫০	প্রাণায়াম	৬৬
৬ষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র	৫০	প্রত্যাহার	৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারণা	৬৯	মন্ত্রযোগ	৭২
ধ্যান	৭০	হঠযোগ	৭৩
সমাধি	৭১	রাজযোগ	৭৩
		লয়যোগ	৭৪
চারি প্রকার যোগ	৭২—৭৭	গুহ্য বিষয়	৭৭

দ্বিতীয় অংশ—সাধনকল্প

সাধকগণের প্রতি উপদেশ	৭৯	ত্রাটকযোগ	১২৯
উদ্ধারিত	৯৬	কুণ্ডলিনী-চৈতন্যের কোশল	১৩০
বিশেষ নিয়ম	১০৮	লয়যোগ-সাধন	১৩৩
আসন-সাধন	১১৫	শব্দশক্তি ও নাদ সাধন	১৩৫
তত্ত্ববিজ্ঞান	১১৯	আত্মজ্যোতিঃ দর্শন	১৪৪
তত্ত্ব-লক্ষণ	১২০	ইষ্টদেবতা দর্শন	১৫০
তত্ত্ব-সাধন	১২৩	আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন	১৫৩
নাড়ী-শোধন	১২৬	দেবলোক দর্শন	১৫৪
মনঃস্থির করিবার উপায়	১২৭	মুক্তি	১৫৯

তৃতীয় অংশ—মন্ত্রকল্প

দীক্ষা-প্রণালী	১৭৩	মন্ত্র-জাগান	১৮৪
সঙ্গুত	১৭৯	মন্ত্র-সিদ্ধির সপ্ত উপায়	১৮৫
মন্ত্রতত্ত্ব	১৮০	মন্ত্র-সিদ্ধির সহজ উপায়	১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ছিদ্রাদি দোষ-শাস্তি	১৮৯	জপের কৌশল	১৯২
সেতু-নির্গম	১৮৯	মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ	১৯৫
ভূতশুদ্ধি	১৯০	শয্যাশুদ্ধি	১৯৫

চতুর্থ অংশ—স্বরকল্প

স্বরের স্বাভাবিক নিয়ম	১৯৭	যাত্রা-প্রকরণ	২১৫
বায়ু নাসিকার স্বাসফল	২০১	গর্তাধান	২১৮
দক্ষিণ নাসিকার স্বাসফল	২০১	কার্য-সিদ্ধিকরণ	২১৯
স্বয়ম্ভার স্বাসফল	২০২	শত্রু-বশীকরণ	২১৯
রোগোৎপত্তির পূর্বজ্ঞান		অগ্নি-নির্বাপণের কৌশল	২২০
ও তাহার প্রতীকার	২০৩	রক্তপরিষ্কার করিবার কৌশল	২২১
নাসিকা বন্ধ করিবার নিয়ম	২০৪	কয়েকটি আশ্চর্য্য সঙ্কেত	২২৩
নিঃশ্বাস পরিবর্তনের কৌশল	২০৫	চিরযৌবন লাভের উপায়	২২৮
বশীকরণ	২০৬	দীর্ঘজীবন লাভের উপায়	২৩০
বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য	২০৯	পূর্বেই মৃত্যু জানিবার উপায়	২৩৫
বর্ষফল নির্ণয়	২১৪	উপসংহার	২৪৩

বাণী-আবাহন

মরানরাসুরারাদ্যা বরদাসি হরিপ্রিয়ে ।

মে গতিস্তুৎপদাবুজং বাগ্‌দেবীং প্রণমাম্যহম্ ॥

—ঃ গীত :—

(ভৈরবী—একতাল)

কুরু করুণা জননি !

সরোজিনি—শ্বেত-সরোজ-বাসিনি !

অমল-ধবল উজল-ভাতি,

শ্রীমুখে জড়িত তড়িত-জ্যোতিঃ,

চাঁচর চিকুরে, চূড়া শিরোপরে, ফুল্লারবিন্দলোচনী ॥

শোভিছে কর্ণেতে কনক-কুণ্ডল, সৌদামিনী জিনি করে টলমল,
ঝলসে তাহাতে মাণিক-মণ্ডল, গজমতি মতিহার ,—

সুচারু দ্বিত্বজ মৃণাল-গঞ্জিতা

বীণা-যন্ত্র করে, করে সুশোভিতা,

কত শোভা করে, নখর-নিকরে, প্রভাকর-কর জিনি ॥

চরণে তরুণ অরুণ-কিরণ, লাজে দ্বিজরাজ লয়েছে শরণ ;

হংস'পরে রাখি যুগল চরণ, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে ;—

তোমারি রূপায় কবি কালিদাস,

বেদবিভাগ ক'রে নাম বেদব্যাস,

পুরাণ অভিলাষ নলিনের ভাষ, নৃত্য-গীতরূপিণী ॥

প্রণমামি পদাম্বুজে অম্বুজবাসিনি,
সুরাসুরনরারাদ্যা বিদ্যা-বিধায়িনি !

আমি হীন দীন-সত্ত্ব,
কি বুঝিব তব তত্ত্ব—
গীর্ব্বাণ গণেশ যার নাহি পান সীমা ?
মূঢ়মতি আমি অতি, না জানি মহিমা ।

শুন মা প্রাণের উন্মাদনা-আকুলতা—
তোমা বিনা কার কাছে জানাইব ব্যথা ?
বিধির বিচিত্র বিধি,
সাধ্য নাহি আমি রোধি ;
মম গতি যে শ্রীপতি, তাঁহার বিধানে
সৌধরাজি ত্যজি আজি নিবাস শ্মশানে !

নেমিনী-চক্রের মত অদৃষ্ট নিয়ত,
কর্ম্মসূত্রফলে হইতেছে বিঘ্নগিত ,
বিধির নিবন্ধ যাহা,
নিশ্চয় ফলিবে তাহা,
সুখ-দুঃখ সম ভাবি তাহে নাহি খেদ—
চরমে সমান গতি নাহিক প্রভেদ ।

শান্তি-সুখ নাই মাগো ভবের বিভবে—

প্রকৃত সুখের মুখ দেখিয়াছি এবে ।

গায়ে চিতাভস্ম মাখি,

“মা মা” ব’লে সদা ডাকি,

নীরব-নিশীথে শুনি অনাহত নাদ—

কতই উপজে মনে অমল আহ্লাদ ।

অন্তে যেন পাই আমি শ্রীহরিচরণ,

পার্থিব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন ।

খ্যাতি-প্রতিপত্তি-আশা,

শ্রীতি, প্রেম, ভালবাসা,

মায়া, মোহ, দয়া, ধর্ম, দিছি বিসর্জন—

হৃদয় শ্মশান-সম ভীতির কারণ !

মরু-সম এ বিষম আমার হৃদয়—

আশার অঙ্কুর কেন তাহাতে উদয় ?

উদাসীন ধর্ম নয়—

ছরাশার অভ্যুদয়,

ধৈর্য-বাঁধে রোধিবারে নারি আশা-নদী

সবেগে হৃদয়-ক্ষেত্রে বহে নিরবধি ।

লুপ্তপ্রায় গুপ্ত শাস্ত্র করিতে প্রকাশ,
হয়েছে আমার মনে বড় অভিনাষ ।

শ্রীগুরুর কৃপাবলে
সিদ্ধ-যোগিগণ-স্থলে,
যোগ-সাধনের যত সহজ কৌশল,
বহুদিন ঘুরে ঘুরে করেছি সম্বল ।

সেই সব সুখসাধ্য সাধন-পদ্ধতি,
প্রচার করিতে সাধ শুন মা ভারতি
কিস্ত কোন গুণ-ভরে,
লেখনী করেতে ধ'রে,
শিবোক্ত শাস্ত্রের কথা করিব প্রচার ?
বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবর্জিত আমি ছুরাচার ।

তবে কেন অসম্ভব আশা করি মনে,
খঞ্জের ছুরাশা যথা হিমাদ্রি-লজ্জনে ?
জম্বুক-শম্বুক কবে
সিংহ-নক্রে বিনাশিবে ?
তথাপি হ'তেছি কেন ছুরাশার দাস ?—
অসম্ভব মরুভূমে কমল বিকাশ !

যাহাদের উপকার সাধিবার ভরে
সাধন-পদ্ধতি লিখি সানন্দ অন্তরে
সেই বঙ্গ-ভ্রাতাগণ
করি পুস্তক পঠন,
কৌতুকে হাসিবে আর দিবে করতালি—
কোন নীচাশয় দিবে সুখে গালাগালি !

নাহি এ ধরায় এক বিন্দু অশ্রুজল,
খল-পিশাচেতে পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল !
কেহ যাক্ অধঃপাতে,
কারো ক্ষতি নাহি তাতে,
হিংস্রক পাষণ্ড যত পরশ্রীকাতর—
পাপে পরিপূর্ণ সব বাহির-অন্তর !

মদ-গর্বে স্ফীত বক্ষে ভ্রময়ে সংসারে—
হুর্বল দেখিলে সুখে পদাঘাত করে ।
দেখি ভবে অবিরত,
দুঃখী তাপী জন কত
আছে এই বিশ্বমারো সংখ্যা নাহি তার—
মনোদুঃখে মুহূমান মন সবাকার ।

নিরাশায় নিপীড়িত হইয়া জননি,
 ডাকি মা কাতরে তোরে মাধব-মোহিনি ।
 যার পানে মুখ তুলে
 চাও তুমি কুতূহলে,
 তার কি অভাব মাতঃ এ ভব-ভবনে ?
 সাক্ষী তার কালিদাস ভারত-গগনে ।

তোমার প্রসাদে মহাদস্যু রত্নাকর,
 লভিয়া ভাস্বর-জ্ঞান হ'ল কবীশ্বর ।
 তাই মা তোমারে ডাকি,
 হৃদি-মাঝে এস দেখি,
 চরণে সঁপিয়া মন ধরি মা লেখনী—
 বিদ্রূপের ভয়ে ভীত নহে এ পরাণী !

কাতরে করুণা মাতঃ, কর নিজ গুণে,
 কৃপাসিন্ধু ফুরা'বে না বিন্দু-বিতরণে ।
 বঙ্গের গৌরব-রবি,
 শ্রীমধুসূদন কবি,
 ঘ-য়ে র-ফলা ঈ দিয়া স্মৃত লিখিয়া সে,
 তোমার প্রসাদে কাব্য প্রকাশিল শেষে ।

তাই মা ভারতী তোমা করেছি শরণ,
অবশ্য হইবে মম বাসনা পূরণ ।

মনে হয় যার যাহা

সুখেতে বলুক তাহা

ধৈর্য্য শিক্ষা করিব মা তোর কৃপাবলে—
উপেক্ষা করিব সর্ব বচন-কৌশলে !

দেহ দিব্যজ্ঞান দাসে অজ্ঞাননাশিনী,
কুশল সুখশে যেন না টলে পরাণী !

সুখ দুঃখ সম জ্ঞানে,

র'ব স্বকার্য্য সাধনে,

নিত্যনিরঞ্জনে ভাবি নিত্যানন্দ পাব—

সর্বজীবে ব্রহ্মভাবে সদা নিরখিব ।

আর এক কথা মাগো নিবেদি চরণে—

বিরহ-বিধুর মম আত্মীয়-স্বজনে,

দেহ দিব্যজ্ঞান দিয়া,

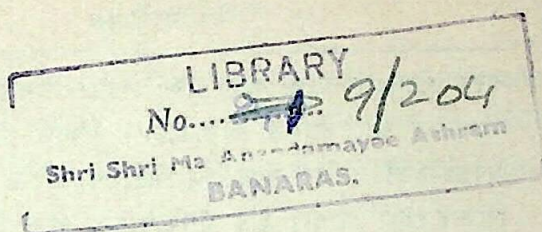
দিব্য পথ দেখাইয়া,

হতভাগা তরে যেন নাহি পান ব্যথা

রেখ মা ভারতী শেষ কিস্করের কথা !

সেবকাধম

শ্রীনলিনীকান্ত



যোগীপুত্র

প্রথম অংশ—যোগকল্প

গ্রন্থকারের সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং স্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

ভূতভাবন ভবানীপতির ভবভীতি-ভঞ্জন, ভক্তহৃদিরঞ্জন, যুগল-চরণ-
স্পর্শ ও পদাঙ্ক অঙ্গসরণ করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিলাম ।

বিশ্বপিতা বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্বত্র একই নিয়ম, চিরদিন
সমান যায় না । আজ যিনি স্বধা-ধবলিত সৌধমধ্যে স্থখে শয়ন
করিয়া চতুর্বিধ রসাস্বাদনে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, কাল
তিনি বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া এক মুষ্টি আগ্নের জগ্ন অগ্নের দ্বারস্থ ।
আজ যে পিতা পুত্রের জন্মোৎসবে মুক্তহস্তে অল্পশ্রম ধনব্যয় করিয়া
স্বাপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিতেছেন, কাল তিনি সেই নয়নানন্দ-

দায়ক পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করতঃ শাশানে পড়িয়া ছিন্নকণ্ঠ
 কপোতের হ্রায় ধড়ফড় করিতেছেন। আজ যিনি বিবাহ-বাসরে
 অবগুণ্ঠনবতী বালিকা-বধূর বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবী সুখে
 বিভোর হইয়া আশার হার গাঁথিতেছেন, কাল তিনি সেই প্রাণসমা
 প্রিয়তমাকে অপরের প্রণয়কাজিঙ্গী জানিয়া প্রাণ পরিত্যাগে উত্তত।
 আজ যিনি পর্য্যঙ্কপরে প্রিয় পতির পার্শ্বে বসিয়া প্রেমের তুফানে প্রাণ
 পরিতৃপ্ত করিতেছেন, কাল তিনি আলুলায়িতকেশা ছিন্নভিন্ন-মলিন-
 বেশা পাগলিনীপ্রায় মৃতপতির পার্শ্বে পড়িয়া ধূল্যবলুষ্ঠিতা হইতেছেন।
 অত্র দেশে অত্র জাতিগণ যে সময় দিগ্বসন পরিধান ও বৃক্ষকোটরে
 পর্বতগহ্বরে বাস করিয়া কষায় কন্দমূলফলে ক্ষুন্নিবারণ করিত, সেই
 সময় আর্য্যাবর্তের আর্য্যগণ সরস্বতী-তীরে বসিয়া স্থললিত স্বরে
 সামগানে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেন। কালে মুসলমানধর্ম্মের
 অভ্যুদয়ে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইয়া হিন্দুগণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে
 ক্রমশঃ বিপুল জ্ঞানগরিমা, আর্য্যবীৰ্য্য, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম হইতে
 বিচ্যুত হইলেন; ভারত-গগন ঘোর অজ্ঞান-অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইল।
 বীৰ্য্যেশ্বর্য্যশালী আর্য্যগণ শেষে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী
 হইয়া পড়িলেন। কালে মুসলমানরাজত্ব অন্তর্হিত হইয়া ব্রিটিশ-
 আধিপত্য বিস্তারিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুগণ বিকৃতমস্তিষ্ক
 ও পথহারা হইলেন। যে হিন্দুধর্ম্ম কত যুগ-যুগান্তর হইতে বিমল
 স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আসিতেছে, কত অতীত কাল হইতে
 এই ধর্ম্মের আলোচনা, আন্দোলন ও নাখনরহস্ত উদ্ভেদ হইতেছে, কত
 বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক
 করিয়াছেন, সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত হিন্দুগণকে বর্ত্তমান যুগের
 সভ্য শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক

ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাজ্জিল্য করিলেন। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই বর্তমান যুগে রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্মবিপ্লবের দিনে অশেষ অত্যাচার সহ করিয়াও সজীব রহিয়াছে।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ‘চিরদিন সমান যায় না’; স্রোত ফিরিয়াছে। এখন হিন্দুগণের হৃদয়ে জ্ঞান, ধর্ম ও স্বাধীনতালিপ্সা জাগিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, এই অতি বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায়? হিন্দুধর্ম গভীর, স্থল, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্মের নিখুঁত মর্ম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান অজ্ঞান হইয়া যাইতেছে। দিন দিন হিন্দুধর্মের ধেরূপ উন্নতি বুঝা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই ধর্মের অমল ধবল কৌমুদীতে সমগ্র দেশের সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত হইবে। আজকাল হিন্দুসন্তান হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, হিন্দুধর্ম মানেন, হিন্দুমতে উপাসনা করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র হইতে যুবক, প্রৌঢ় অনেকেরই সাধনভঞ্জে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু উপদেষ্টার অভাবে কেহই সাধন বিষয়ে প্রকৃত পথ দেখিতে পান না। অস্বদেশীয় প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ সাধনের ধেরূপ কঠিন বাঁধন ব্যক্ত করেন, সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, শুনিয়াই সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়; ধর্ম-ধর্মের ধেরূপ লম্বা-চওড়া পাতনামা প্রস্তুত করেন, আজীবন কষ্টোপার্জিত অর্থব্যয় করিয়াও তাহা সম্পাদন করা অনেকের পক্ষে স্বকঠিন। ধর্ম করিতে হইলে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, ধন-রত্নে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, ঘরবাড়ী ছাড়িতে হইবে, অনাহারে দেহ শুদ্ধ করিতে হইবে, সং সাজিয়া বৃক্ষতল-আশ্রয়ে শীতবাত সহ্য করিতে হইবে, নতুবা ভগবানের কৃপা

হইবে না—ধৰ্ম্মে যে এতটা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, বড়ই আশ্চর্যের কথা! আমি জানি, স্থখেরই জন্ত ধৰ্ম্মাচরণ, শাস্ত্রেও এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়—

স্থখং বাঞ্ছতি সৰ্ব্বা হি তচ্চ ধৰ্ম্মসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাদ্ধৰ্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সৰ্ব্ববর্গৈঃ প্রযত্নতঃ ॥

—দক্ষসংহিতা

তবেই দেখুন, ধৰ্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যই স্থখলাভ। অনাহার, অর্থব্যয় করিয়া কার্যিক ও মানসিক কষ্টভোগ অজ্ঞানতার পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবেই গৃহে প্রচুর অন্ন থাকিতেও উপবাস করিয়া কাল কাটাইতে হয়। আমাদের অসীম শাস্ত্র, অনন্ত সাধন-কৌশল। আমরা বৎসরের মধ্যে ভাদ্র মাসে একদিন শাস্ত্রগুলি রৌদ্রে দেই, পরে গাঁঠরী বাধিয়া শুষ্কমুখে পরের দিকে চাহিয়া থাকি; কিম্বা একটা বিকৃত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করি, নয় কলিকালের স্বপ্নে দোষের বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। পাঠক! আমি কিরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া, শেষে সৰ্ব্বমঙ্গলময় সত্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দ সদাশিবের অহুগ্রহে সদগুরু লাভ করি, তাহা আপনাদের না জানাইয়া প্রতিপাত্ত বিষয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে ফুল্ল প্রাণের সমস্ত স্থখ-শান্তি, আশা-ভরসা উত্তম ও অধ্যবসায় ভাদ্রের ভরা ভৈরবনদতীরস্থ কদম্বতলে ভস্মীভূত করতঃ স্মৃতির জলন্ত চিতা বুকে লইয়া বাটী হইতে বাহির হই। পরে কত নগর, গ্রাম, পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া স্থচাক্র কারুকার্য্যখচিত স্থা-ধবলিত স্তূপশ্য সৌধরাজি নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু প্রাণের আগুন নিভিল না। কত নদ, নদী, হ্রদাদির উত্তালতরঙ্গসমাকুল কলিজা-

কম্পিতকারী কলকল নাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু কালের করাল দংষ্ট্রাঘাতজনিত কাতরতা কমিল না। কত পর্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা অধিরোহণ করিয়া, বিশ্বপাতা বিধাতার বিশ্বস্থষ্টিকৌশলের বিচিত্র ব্যাপারাবলী অবলোকন করিলাম, কিন্তু জীবনের জালা জুড়াইল না। কত স্থাপদসঙ্কুল বনভূমে অপূর্ণ প্রকৃতি-পদ্ধতি ও বনকুহ্রমের হৃদৃশ হৃন্দর হৃষমা সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু অন্তরজালা অন্তর্হিত হইল না। বহু দিনান্তে আচ্ছা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা, বিদ্যাদ্রিনিলায়া মহামায়ায় রূপায় সাবিত্রী পাহাড়ে সাধকাগ্রগণ্য পরমহংস শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত হইল। পরমজ্ঞানী পরমহংসদেবের উপদেশে জীবের জন্ম ও জন্মান্তর-রহস্য, গতাগতি, কর্মফলভোগ, মায়াদি নিগমের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়া-মোহ দূরীভূত হইল। পার্থিব পদার্থের অসারতা বুঝিলাম, হৃদয়নিকুঞ্জে কোকিলা তখন তান ধরিল—কি এক অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় আগ্রত হইল। মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, মরজগতে আর মদন-মরণের অভিনয় করিতে ফিরিব না। আমি কার? কে আমার? কেন বৃথা ক্রন্দনের রোল? একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইব। সাধ করিয়া কেন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হই? হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে শাস্ত্র-বাক্য ধ্বনিত হইল,—

পিতা কশ্চ মাতা কশ্চ কশ্চ ভ্রাতা সহোদরাঃ ?

কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ—কা কশ্চ পরিদেবনা।

মায়ামোহের আবরণ অনেকটা অপসারিত হইল বটে, কিন্তু প্রাণে একটা প্রবল পিপাসা জাগিয়া উঠিল; স্থির করিলাম, কোন একটা সাধক-সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইয়া একটা সুখসাধ্য সাধনের

অল্পস্থান করিয়া লীলাময়ের বিচিত্র লীলার মধুর স্বাদ আশ্বাদন করিতে করিতে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিব। এই ভাবিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। বহু সাধু-সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলাম। কেহ ধূনীর ছাইকে চিনি করিতে শিখাইল, কেহ তপ্ত-তৈলে হাত দিবার কৌশল দেখাইল, কেহ কাপড়ে আগুন বাধিবার পন্থা প্রদর্শন করিল, কিন্তু আমার প্রাণের প্রবল পিপাসা পূর্ণ হইল না। একজন প্রখ্যাতনামা তান্ত্রিক-সাধকের সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ভূত্যের ত্রায় সেবা করিলাম। কিছুদিন পরে তিনি এক অস্বাভাবিক দ্রব্য সংগ্রহের আদেশ করিলেন। “শনি-মঙ্গলবারে বজ্রাহত গর্ভবতী চণ্ডাল-রমণীর উদরস্থ মৃত সন্তানের উপরি আসন ভিন্ন তত্ত্বোক্ত সাধনে সিদ্ধিলাভ সুকঠিন।” এই কথা শুনিয়াই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাঁহারা যোগী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা নেতি ধোতি প্রভৃতি একরূপ কঠিন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, আমার বংশের মধ্যে কেহ তদভ্যাসে সক্ষম হইবে না। বৈরাগী বাবাজীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিলেন, “বিষফলের ত্রায় মস্তক স্বেদন করিয়া সূদীর্ঘ শিখা রাখ, গলার মালায় পিতলের আংটার ঝুলি ঝোলাইয়া, কাঠের মালায় গুরুদত্ত মন্ত্র জপ কর—নিয়মিতরূপে হরিবাসর ও প্রত্যহ কিঞ্চিং গোপীমৃত্তিকা গাত্রে লেপন না করিলে গোপীবল্লভের কৃপা হইবে না।” আর এক সম্প্রদায় আধুনিক বৈরাগী-শাস্ত্রের কতকগুলি বাদ্ধলা পয়ার আওড়াইয়া নিজেদের অনুকূলে কদর্থ করিয়া বুঝাইলেন, “শক্তি ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই” এবং মাতামহীর সমবয়স্কা একটা মাতাজী গ্রহণের ব্যবস্থা দিলেন। এই হেতুবাদে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডবাসী পরোপকারপরায়ণ একটি

বাবাজী তদীয় অনাথা কণ্ঠাটিকে নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; আমি অকৃতজ্ঞ, এহেন উদার-হৃদয়, নিঃস্বার্থ পরোপকারীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া পলায়ন করি। পাজ্জাব প্রদেশস্থ অমৃতসহরের উদাসীন সম্প্রদায় বলিলেন, “ঐশ্বৰ্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ছত্রিশ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া বেড়াইলেই ব্রহ্মভাব সুরিত হইবে।” সন্ন্যাসিগণ অথগু বিভূতিলেপন, স্বদীর্ঘ জটাজুটধারণ, চিম্টাগ্রহণ ও ত্রিতানন্দের দমের কৌশল শিক্ষা দিলেন। নাগাসম্প্রদায়, নেংটা হইয়া কোমরে লোহার জিজির বারণ ও অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া ফলমূল ভক্ষণের ব্যবস্থা দান করিলেন। সাবিদ্রী পাহাড়ের পূজ্যপাদ পরমহংসদেব পূর্বে কিঞ্চিৎ পাকা করিয়া দিয়াছিলেন, তাই এইসব ককড়ের ফাঁকা কথায় মন বাঁকা হইল না। ইহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া জগদগুরু যোগেশ্বরের চরণ স্মরণ করিয়া স্বকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে ঘুরিতে লাগিলাম।

পশ্চিম প্রদেশে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া কামাখ্যামন্দির চরণ-দর্শনাভিলাষে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীর সমভিব্যাহারে আসাম বিভাগে আসিলাম। আসাম আসিয়া পরশুরামতীর্থ-দর্শনে বাসনা হইল! গোহাটি হইতে ষ্টিমারে ডিব্রুগড় আসিয়া তথা হইতে বাম্পীয় শকটারোহণে সদিয়া পহঁছিলাম ; সদিয়া হইতে প্রায় ২০।২৫ জন সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গম স্থাপদসঙ্কুল বনভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য টিলা উল্লঙ্ঘন করিয়া বহুকষ্টে পরশুরামতীর্থে উপনীত হইলাম। তীর্থটি নয়ন ও মন-প্রাণপ্রফুল্লতাপ্রদ স্বভাবসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। শাস্ত্রে কথিত আছে, ভার্গব সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণান্তে এই ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিয়া মাতৃহত্যাজনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পান এবং হস্তসংলগ্ন পরশু স্থলিত হয়। সেই অবধি এই স্থানের নাম “পরশুরামতীর্থ” বলিয়া

প্রসিদ্ধ। এই ব্রহ্মকুণ্ড হইতেই ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু আজকাল ব্রহ্মকুণ্ডের সহিত উক্ত নদের কোনও সংশব নাই। ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া আমিও সকলের গ্রায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান-পূজাদি করিয়া পরিশ্রম সার্থক ও জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।

যে দিবস ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হই, তাহার দুই দিন পরে আমি প্রবল জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইলাম। রাস্তায় কয়েক দিন অনিয়মিত পরিশ্রমে পূর্ব হইতেই কাতর ছিলাম, তাহার উপর জ্বর ও আমাশয়ে চারি পাঁচ দিনেই উত্থানশক্তি তিরোহিত হইল। সঙ্গীয় সন্ন্যাসিগণ প্রত্যাগমনের জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম; আমার এক পা চলিবার শক্তি নাই, কিরূপে সেই দুর্গম বনভূমি ও পর্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিব? সঙ্গিগণকে দুই চারি দিন অপেক্ষা করিবার জন্ত সনির্বন্ধ অন্তঃস্ব-বিনয় করিলাম; কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। তাঁহারা একদিন আমার অজ্ঞাতসারে সাধুজনোচিত সহৃদয়তা দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি একাকী সেই জনমানবশূন্য পার্বত্য প্রদেশে বিষম বিপদ জ্ঞান করিলাম। নাতিদূরে অসভ্য পার্বত্য জাতির একটি ক্ষুদ্র বস্তি ছিল। আমি নিরুপায় হইয়া তাহাদের নিকট কাতরে স্থান ভিক্ষা চাহিলাম। তাহারা সাধু-ব্রাহ্মণ মানে না, কিন্তু আমার নবীন বয়স, কাতর শরীর দেখিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক—সাদরে স্থান দান করিল। নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন ভাষা—কাজেই প্রথম প্রথম জড়ের মত থাকিতে বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহাদের ভাষা শিখিয়া লইলাম—ক্রমে তাহাদের সহিত সম্ভাব সংস্থাপিত হইল। তাহারা সেবকের গ্রায় আমার সেবা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের সদ্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আশাতীত

যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে স্বস্থ ও সবল হইতে
কিঞ্চিদধিক একমাস অতিবাহিত হইল। আমি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের
প্রত্যাশায় ব্রহ্মকুণ্ডে আসিলাম; কিন্তু সেখানে আনিয়া জানিলাম,
আগামী কার্তিক মাসের পূর্বে সদিয়া বাইবার সঙ্গী পাওয়া বাইবে
না। সেই স্থাপদসঙ্কুল বনভূমি একাকী অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যাত্ত
নহে। সুতরাং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুনরায় পূর্ব আশ্রয়দাতার শরণাপন্ন
হইলাম। তাহার সন্তুষ্টচিত্তে ছয় সাত মাসের জগ্ন স্থান দিতে স্বীকৃত
হইল। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থান ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বৃটিশ-
শাসনাধীন নহে।

সর্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতা বিধাতার চরণ ভরসা পূর্বক, “জব্ জৈসা তব
তৈসা” ভাবিয়া সেই সব অশিক্ষিত অসভ্যদিগের সঙ্গে একরূপ স্থখে-
স্বচ্ছন্দে কালবাণন করিতে লাগিলাম। তাহাদের উদার স্বভাব, সরল
প্রাণ, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার, সহানুভূতি, আতিথেয়তা প্রভৃতি যে
সকল সদগুণ দেখিয়াছি, বর্তমান যুগে শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমानी
ভারতবাসীর মধ্যে কুত্রাপি তাহা দৃষ্ট হয় না। কোনও দেশের কোনও
জাতির মধ্যে এরূপ ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব এ দুর্দিনে মিলিবে না। ইহা-
দিগকে আমরা অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করি; কিন্তু উচ্চকণ্ঠে
বলিতেছি, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব মরজগতে দেখিতে চাও, তবে এই
অসভ্য ব্যতীত অগ্ন কুত্রাপি মিলিবে না। আর আমরা যদি মানুষ্য
বলিয়া পরিচিত হই, তবে ইহারা দেবতা। হায়! কি কৃষ্ণণেই
আমরা সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলাম! একজন সভ্য-শিক্ষিত বাবুর
বাটিতে দাস-দাসী ও কুকুর-বিড়ালে অন্ন খাইয়া ফুরাইতে পারে না,
কিন্তু বাবু দেশের কি গ্রামের নিরন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা দূরে থাকুক,
তদীয় ভ্রাতা বাটীর পার্শ্বে বাস করিয়া সারাদিন অনাহারে ঘুরিয়া

অন্নসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া বেলাশেষে শুকমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিতেছেন, বাবু সেদিকে দৃকপাত করেন কি? ক্ষুধাতুর অতিথিকে এক মুঠা অন্ন দান করা আমরা অপব্যয় মনে করি। বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় পথিককে এক রাত্রির জন্ত স্থান দিতে কুণ্ঠিত হই। ইহাতেও যদি আমরা সভ্য, শিক্ষিত ও মানুষ হই, তবে অভদ্র, পাষণ্ড, পিশাচ কাহারো? জামাজোড়া পরিয়া, ঘড়ি-ছড়ি লইয়া, টেরি বাগাইয়া গাড়ী হাঁকাইলেই সভ্য হয় না; সভ্য করিয়া দুই চারিটি ইংরাজী বোল ছড়াইলেই তাহাদের শিক্ষিত বলা যায় না। হায়! কি অশুভক্ষণেই ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল—আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর অধম হইয়াছি। তাই নিজের অবস্থা নিজে বুঝিতে না পারিয়া শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়াছি। সেই অসভ্য ও অশিক্ষিতগণের মধ্যে যে ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি, এ জীবনে বুঝি তাহা আর ভুলিতে পারিব না। জগন্মাতা জগদম্বার নিকট কাতরে প্রার্থনা করি, আমার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণের ঘরে ঘরে সেইরূপ অসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হউক।

এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিতে করিতে ক্রমেই সাধারণের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। নিকটবর্তী অন্যান্য বস্তির ব্যক্তিগণও আমার নিকট ভ্রাতৃত্ব করিতে লাগিল। আমারও অনেক দিন ধরিয়া একস্থানে অবস্থান কিছু কষ্টকর বোধ হওয়ায় নূতন নূতন বস্তিতে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে ব্রহ্মকুণ্ডের প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে আসিয়া পড়িলাম। এই সকল স্থানে সমতল ভূমি নাই, কেবল স্তরে স্তরে পর্বতশ্রেণী সজ্জিত। পর্বতের পাদদেশে আট দশ ঘর লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র পল্লী। আমি খাই, নিদ্রা ঘাই, কোনদিন বা সাহস করিয়া পাহাড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে

যাই। একদিন বৈকালে ঐরূপ ভ্রমণে বাহির হইলাম। বর্ষাকাল, ভাবী বৃষ্টির আশঙ্কায় তালি দেওয়া একটি ছিন্ন-ছত্র সংগ্রহপূর্বক অনেক বন জঙ্গল, টালা অতিক্রম করিয়া একটি নূতন স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটী পর্বতের নিভৃত এক সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ। সেখানে জনমানবের প্রসঙ্গও নাই। কেবল পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঝরণা, ঝরণার কোলে নীলিম বনভূমি, বনভূমির কোলে খেত-পীত-লোহিত কুসুমগুচ্ছ, কুসুমের কোলে স্নগন্ধ আর শোভা। স্থানটী নয়ন-মন-তৃপ্তিকর দেখিয়া অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিলাম। বসিয়া স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টিরচনাকৌশল, প্রকৃতির বিচিত্র গতি প্রভৃতি আন্দোলন-আলোচনা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নদী-তরঙ্গের ত্রায় এক একটি করিয়া কত রকমের চিন্তা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইল। কত দেশের কথা, কত লোকের কথা, তাহাদের আচার-ব্যবহার, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার কথা, সর্ব্বশেষে নিজ জন্মভূমির কথা মনে পড়িল। সেই বাল্যকাল, পিতামাতা, তাঁহাদের আদর-মাখান কথা, ভাই-ভগ্নীর আব্দার, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ, বাল্যবন্ধুর সরল প্রাণের অকপট ভালবাসা, প্রণয়িনীর প্রাণমাতান কথা—এই সকল বিষয় মনে হইবামাত্র প্রাণের ভিতর একটা প্রবল ঢেউ উঠিল! হৃদয়ের বাঁধনগুলো টিলা হইয়া গেল, বুকের ভিতর ঢেঁকীর ‘পাড়’ পড়িতে লাগিল, চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিল, মুহূর্ত্তে পরমহংসদেবের উপদেশ-বাক্য তুণের ত্রায় পূর্ব্বস্মৃতির খরস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল—দর্শন, বিজ্ঞান, গীতা, পুরাণাদির শাস্ত্রজ্ঞান রসাতলে গেল—শেষে আত্মবিশ্বৃত হইলাম।

কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না; যখন পূর্ব্বজ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, তখন দেখি, ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় ময়ুখমালা উপসংহত

করিয়া অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যা নব বালিকা-
বধূর ত্রায় অন্ধকার-অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া দেখা দিয়াছেন।
পূর্বেই পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে, কচিং দুই একটা পাখী
শাখিশাখে বসিয়া স্থললিত স্বরে কর্ণকুহরে গীষ্মধারা ঢালিয়া দিতেছে।
মহামায়ার মায়ামোহের প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম;
ভাবিলাম “আমি বা তাই আছি। একটা তরঙ্গাবাতেই যখন ছদয়ের
সমস্ত গ্রন্থিগুলি এলাইয়া পড়িল, তখন শাস্ত্রাদি জ্ঞানের গরিমা বৃথা।”
যাহা হউক, অধিক ভাবিবার অবসর কৈ? বস্তিতে কিরিতে হইবে।
ভীতচকিতচিত্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া বুঝিতে
পারিলাম, পথ হারাইয়া বিপথে আসিয়াছি। তখন বনের ভিতর
অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রাণের ভয়ে আকুলি-বিকুলি
করিয়া বাহিরে বাহির হইবার জ্ঞান বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম;
কিন্তু সমস্ত বৃত্ত ও পরিশ্রম বৃথা হইল। বেদিকে যাই, কেবল অসীম
জঙ্গল ও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। হতান্ধান হইয়া এক স্থানে বসিয়া
পড়িলাম। শরীর হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল। এখন উপায়?—এই
নিবিড় অন্ধকারে দুর্ভেদ্য বনভূমি অতিক্রম করা আমার সাধ্যাত্ত
নহে। পর্বতের কোন্ পার্শ্বে বস্তু আছে, তাহা আদৌ ঠিক নাই।
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বস্তুর অনুসন্ধান করা বৃথা; বরং একপ
ভাবে নিরর্থক ভ্রমণ করিতে করিতে হয়ত ব্যাঘ্র-ভল্লুকের করাল
দংষ্ট্রাঘাতে ভবলীলা সংবরণ করিতে হইবে, নয় বহুহস্তিশূথের
পদদলিত হইতে হইবে। অকারণ বস্তুর অনুসন্ধানে কষ্টভোগ করি
কেন? এই স্থানেই অবস্থিতি করি, যাহা হয় হউক। বিপদ চিন্তা
ভীতির কারণ, কিন্তু বিপদে পতিত হইলে আপনা হইতেই সাহস
সঞ্চার হয়। একাকী সেই ভয়াবহ বনভূমিতে বসিয়া প্রতিক্রমেই

মৃত্যুর জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কখনও মনে হইতে লাগিল, ঐ বুঝি করাল বদন বিস্তার করিয়া হিংস্র জন্তু গ্রাস করিতে আসিতেছে, কখনও মনে হইতে লাগিল, ভীমদর্শন ভূত, প্রেত, পিশাচগণ বিকট দন্ত বাহির করিয়া অট্টহাস্তে বনভূমি কস্পিত করিতেছে। আমি প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, এরূপ যন্ত্রণাভোগ অপেক্ষা বুঝি মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল, অবশেষে সাহস সঞ্চার হইল, নানারূপে মনকে দৃঢ় করিতে লাগিলাম। শাস্ত্রকারগণের উপদেশ মনে পড়িল—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অথ বান্দশতান্তে বা মৃত্যুর্ভবৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।২৬

যখন একদিন মৃত্যু নিশ্চয়ই, তখন সেই মৃত্যুর জন্ম এত অধীর হইতেছি কেন?

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃত্যু চ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থো ন ত্বং শোচিতুমহীসি ॥

—গীতা ২।২৭

পূজনীয় পরমহংসদেবের প্রাণস্পর্শী বাক্যও মনে হইল—

“নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা।”

আপনা-আপনি মৃত্যুভীতি অনেকটা অন্তর হইতে অন্তহিত হইল। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা নিতান্ত কাপুরুষতার পরিচায়ক; বৃক্ষোপরি অধিরোহণ করিলে হিংস্র প্রাণীর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু গাছে উঠিবার উপায়

কি? আমি যে বৃক্ষ-আরোহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। পল্লীগ্রামে জন্ম হইলেও সময়ে সে কৌশল শিক্ষা করি নাই। তথাপি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নিকটে একটা প্রকাণ্ড পার্করত্ন বৃক্ষের শাখা প্রায় ভূমি-সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতেছিল। সামান্য চেষ্টায় শাখার উপরে উঠিয়া কল্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে শাখা বাহিয়া তাহার উৎপত্তিস্থানে আসিলাম। অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্য গহ্বর! যেখানে শাখাটা শেষ হইয়াছে, ঠিক তাহারই পার্শ্ব দিয়া গুঁড়ির ভিতর প্রকাণ্ড গর্ত্ত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, গহ্বরের ভিতর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ; কেবলমাত্র একজন মনুষ্য অক্লেশে বসিয়া থাকিতে পারে এমন স্থান আছে। আমি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে কোটরে নাগিলাম। কোনও ভয়ের কারণ নাই দেখিয়া তলায় উপবিষ্ট হইলাম এবং ছাতাটি খুলিয়া গহ্বরের মুখ সমাচ্ছাদিত করিলাম। কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া অপার করুণানিলয় জগৎপিতা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। কত সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু কালরাত্রি যেন আর যাইতে চাহে না! বহুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাতের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। বন্যকুক্কট ও অন্যান্য দুই একটি পাখী ডাকিতে লাগিল! হৃদয় প্রফুল্ল হইল। এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম ভাবিয়া মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও মৃত্যুচিন্তায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হওয়ায় ও উষাকালের মন্দ মন্দ স্নগীতল সমীরণ শরীরে লাগায় অত্যন্ত নিদ্রার আবেশ হইল। সেইরূপ ভাবে বসিয়াই বৃক্ষগাত্রে ঠেস দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, বনভূমি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ছাতাটা বন্ধ করিয়া ভয়ে ভয়ে মস্তক উত্তোলন

করিয়া দেখি, আমি যে বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছি, তাহার তলদেশে শুক-
বৃক্ষপত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া একটি মহুশ্মমূর্তি উপবিষ্ট আছেন।
রাত্রিশেষে সহসা এই নিবিড় জঙ্গলে মানুষ আসিল কোথা হইতে?
উনিও কি আমার শ্রায় বিপদাপন্ন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?
এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না।
চিন্তাহরূপ ভূত-প্রেতাদির কল্পনাও একবার মনে উঠিল। শেষে
হর্গানাম স্মরণ পূর্বক সাহসে নির্ভর করিয়া কোটর হইতে বহির্গত
হইলাম এবং পূর্বের বৃক্ষশাখা দিয়া অবতরণ করিয়া মহুশ্মমূর্তির সম্মুখে
গিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা বৃক্ষ হইতে আমাকে অবতরণ করিতে
দেখিয়া তিনি ভীত, চকিত, কি বিস্মিত হইলেন না। এমন কি মুখ
তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। দেখিলাম, মস্তক
অবনত করিয়া আপন মনে গাঁজা ডলিতেছেন। কৌপীন ভিন্ন সঙ্কে-
তদ্বিতীয় বস্ত্র নাই। তদীয় পার্শ্বে একটি বৃহৎ চিম্টা এবং একটি দীর্ঘ-
লাঙ্গুল কলিকা পতিত রহিয়াছে। এতদৃষ্টে তাঁহাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী
বলিয়া অনুমান করিলাম। কিন্তু এই পার্কৃত্য বনভূমে সন্ন্যাসীর
আশ্রম আছে, তাহা ত একদিনও কাহারও নিকট শুনি নাই। যাহা
হউক, কোন কথা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।
নিকটে উপবিষ্ট হইলাম। তাঁহার গাঁজা প্রস্তুত হইলে কলিকায়
সাজিয়া অগ্নি উত্তোলন করতঃ বিধিমতে দম লাগাইলেন এবং আমাকে
কলিকা দেওয়ার জন্ত হাত বাড়াইলেন। যদিও আমার গাঁজা খাওয়ার
অভ্যাস ছিল না, তথাপি ভয়ে ভয়ে কলিকা গ্রহণান্তর দুই এক টান
দিয়া প্রত্যর্পণ করিলাম। তিনি পুনরায় দম দিয়া অগ্নি ফেলিয়া
দিলেন, ভূমি হইতে চিমটা উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং
হস্তসঙ্কেতে আমাকে তদীয় অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া চলিতে

আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির গ্রায় আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিলাম, “কোথায় যাইতেছি? এ ব্যক্তি কে? ইহার মনের উদ্দেশ্য কি? আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, পরিচয় নইলেন না, অথচ সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন, ইহার কারণ কি?” একবার বঙ্কিমবাবুর “কপালকুণ্ডলা”র কাপালিকের কথা মনে পড়িল। অমনি বুকের ভিতর হুকু হুকু করিয়া উঠিল। তথাপি কালবারিণী কালবরণী কালীর চরণ ভরসা করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। তিনি গুণ্মলতা কণ্টকাদি উপেক্ষা করিয়া দানবের গ্রায় গমন করিতেছেন। গাঁজার নেশায় আমি চক্ষুতে সরিষাফুল দেখিতেছি, লজ্জাবতীর কাঁটায় পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। তথাপি যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহার পশ্চাৎ গমনে ত্রুটি হইতেছে না। বলা বাহুল্য, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ এইরূপে সেই নিবিড় বনভূমি অতিক্রম করিয়া একটি টিলার নিকট আসিলাম। এই স্থানটি স্বভাবসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; এক দিকে টিলার উন্নত শীর্ষ বীরের গ্রায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অন্য তিন দিকে দুর্ভেদ্য নীলিম বনভূমি। মধ্যে খানিকটা স্থান পরিষ্কার, বৃক্ষাদিশূন্য; একটি ক্ষুদ্র ঝরণা টিলার পার্শ্ব দিয়া সবেগে স্রমধুর শব্দ করিতে করিতে গমন করিয়াছে। এই স্থানে আসিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার তাঁহার প্রকৃত মূর্তি নয়নগোচর হইল। কি বিরাট মূর্তি!—তপ্ত কাঞ্চনের গ্রায় বর্ণ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, আজাহুলস্থিত মাংসল বাহুদ্বয়, রক্তাভ অধরোষ্ঠ; স্রমরক্তকুম্মুরো কুম্মুরো দীর্ঘ কেশগুচ্ছ; আকর্ষকবিশ্রান্ত নয়ন; সর্ব্বশরীরে সরলতা মাখা; ব্রহ্মতেজ শরীর ফুটিয়া বাহির হইতেছে সেই

অদৃষ্টপূর্ব অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত ! এ জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মধুর মূর্তি এ পর্যন্ত একটীও নয়নগোচর হয় নাই। কি এক অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রাণাধারে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইল ; কি এক অপূর্ব ভাবে বিভোর হইয়া গেলাম। আমার অজ্ঞাতনারে দেহ আপনা আপনি তদীয় চরণে লুপ্তিত হইল।

তিনি সন্নেহে আমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া ধীর গম্ভীর মধুর বাক্যে বলিলেন, “বাবা ! সহসা রাত্ৰিশেষে আমাকে বৃক্ষতলে দেখিয়া ও তোমার পরিচয়াদি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সন্নে আনিতে আদেশ করিয়াছি, ইহাতে তুমি কিছু ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ। কিন্তু ইতিপূর্বেই—তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে ঘুরিতেছ, আজি বৃক্ষকোটরেই বা কেন অবস্থিতি করিতেছ,—তাহা আমি অবগত হইয়াছিলাম ; সেই জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। নিশীথ সময়ে তোমার বিষয় অবগত হইয়া তোমাকে এখানে আনিবার জন্যই ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।”

আমি ত অবাক !—ইনি আমার বিষয় পূর্বেই কিরূপে অবগত হইলেন ? তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল। গত রাত্ৰের দারুণ কষ্ট বিশ্বত হইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। আমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম।

তিনি মিষ্টবাক্যে আমাকে আশ্বস্ত করিয়া আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের ও এই জন্মের অনেক গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিলেন এবং যোগ-শিক্ষা ও সাধন-কৌশল শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। গত রাত্ৰির বিপদ, সম্পদের কারণ বুঝিতে পারিয়া সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ

দিলাম। এতদিনে মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া হৃদয় প্রফুল্ল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পরে সেই সিদ্ধমহাপুরুষ টালার সম্মিহিত হইয়া কৌশলে একথানা বৃহদায়তন প্রস্তর অপসারিত করিলেন। আশ্চর্য্য দৃশ্য! প্রকাণ্ড গহ্বর !! আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গহ্বরটি একথানা ক্ষুদ্র গৃহের আয় প্রশস্ত ও পরিকৃত। তিনি আমায় কতগুলি হস্তলিখিত যোগ ও স্বরোদয় শাস্ত্র পাঠ করিতে দিলেন। আমি আপনাকে ধ্যাত্ত জ্ঞান করিয়া সিদ্ধমহাপুরুষের সহিত তদীয় আশ্রমে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

প্রত্যহ তিনি আমাকে অপত্যনির্কীর্ণশেষে সন্মোহে যোগ ও স্বরশাস্ত্রের গূঢ় কূটস্থানের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং মৌখিক উপদেশ ও সাধনের সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল দেখাইয়া দিলেন। আমি তথায় কিঞ্চিদধিক তিন মাস অবস্থিতি করতঃ সিদ্ধমনোরথ হইয়া কৃতজ্ঞ ও ভক্তিগদগদচিত্তে তদীয় চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রফুল্লচিত্তে আমাকে পূর্বের পার্কৃত্য বস্তিতে পৌছাইয়া দিলেন।

পূর্বপরিচিত আশ্রয়দাতাগণ সহসা আমাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইল। তাহারা তিন চারি দিন পার্কৃত্য বনভূমে আমার অহুসন্ধান করিয়াছিল। কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া হিংস্র জন্তুর কবলিত হইয়াছি সিদ্ধান্ত করিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ও মনোবেদনা পাইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলাম এবং দুই এক দিন করিয়া তাহাদের বাটীতে বাস করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলাম। পরে

সেখান হইতে তীর্থযাত্রিগণের সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলাম।

সিদ্ধমহাপুরুষ প্রদর্শিত পন্থায় ক্রিয়া অহুষ্ঠান করিয়া আমি শাস্ত্রোক্ত সাধনার স্বফল সম্বন্ধে বিশেষ সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। তাই আজ স্বদেশী সাধনপন্থানুসন্ধিস্থ ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে কয়েকটি সত্ত্ব প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজ ও সুখান্বিত সাধন-পদ্ধতি সন্নিবেশিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সাধকগণকে বাহাতে বিভ্রমনা ভোগ করিতে না হয়, আমার তাহাই একান্ত ইচ্ছা। এক্ষণে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। যদি কাহারও কোন বিষয় বুঝিতে গোল কি সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমাকে পত্র লিখিলে বা নিকটে উপস্থিত হইলে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার ঠিকানার ঠিক নাই। “কার্য্যাধ্যক্ষ—সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট, আসাম”—এই ঠিকানায় রিপ্লাই কার্ড লিখিয়া আমার অবস্থিতির বিষয় জানিয়া লইবেন।*

*পরম পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বর্তমানে স্থল ভ্রমণে নাই। বিগত ১৩৪২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তিনি মহাসমাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

যোগের শ্রেষ্ঠতা

সর্বসাধনার মূল ও সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, বেদব্যাসপুত্র শুকদেব পূর্বজন্মে কোন বৃক্ষোপরি শাখান্তরালে থাকিয়া শিবমুখনির্গত যোগোপদেশ শ্রবণ করতঃ পক্ষিযোনি হইতে উদ্ধার পাইয়া পরজন্মে পরম যোগী হইয়াছিলেন। যোগশ্রবণে যখন এই ফল, তখন যোগসাধন করিলে ব্রহ্মানন্দ লাভ ও সর্বসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যোগবিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই যে, অবিজ্ঞাবিমোহিত আত্মা 'জীব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ের অধীন হইয়াছেন। সেই তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভের উপায় যোগ। যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির মায়াকোশল জ্ঞাত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি যোগী, তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতি মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন। সোজা কথায়, সেই যোগীব্যক্তিতে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়েন। প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি আর পুরুষপদবাচ্য হন না, তখন কেবল আত্মা নামে সংস্বরূপে অবস্থিত হন। এই সংস্বরূপে অবস্থান করা যায় বলিয়া যোগ শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যোগই ধর্মজগতের একমাত্র পথ। তন্ত্রের মন্ত্র, মুসলমানের আল্লা, খৃষ্টানের খৃষ্ট পৃথক্ হইলেও যখন তাঁহারা সেই সেই চিন্তায় আত্মাহারা হন, তখন তাঁহারা অজ্ঞাতসারে যোগাভ্যাস করেন বৈ কি! তবে কোন দেশের কোন ধর্মশাস্ত্রেরই আধ্য-যোগধর্মের ত্রায় পরিণতি বা পরিপুষ্টি ঘটে নাই। ফলতঃ অজ্ঞাত জাতি সম্বন্ধে বাহা হউক, ভারতীয় তন্ত্র, মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি নমন্তাই যোগমূলক।

যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান হইতেই মানবাত্মার মুক্তি হইয়া থাকে। সেই মুক্তিদাতা পরমজ্ঞান, যোগ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠে লাভ করা যায় না। ভগবান্ শঙ্করদেব বলিয়াছেন—

অনেকশতসংখ্যাভিস্তর্কব্যাকরণাদিভিঃ ।

পতিতা শাস্ত্রজালেষু প্রজ্জয়া তে বিমোহিতাঃ ॥

—যোগবীজ, ৮

শত শত তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণাদি অল্পশীলন পূর্বক মানবগণ শাস্ত্র-জালে পতিত হইয়া কেবল বিমোহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞান যোগাভ্যাস ব্যতীত উৎপন্ন হয় না।

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ।

সারস্তু যোগিভিঃ গীতসুত্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৫১

বেদচতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্বন করিয়া তাহার নবনীতস্বরূপ সারভাগ যোগিগণ পান করিয়াছেন; আর তাহার অসার ভাগ যে তত্র (ঘোল বা মাঠা), পণ্ডিতগণ তাহাই পান করিতেছেন। শাস্ত্রপাঠে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা মিথ্যা প্রলাপমাত্র, প্রকৃত জ্ঞান নহে। বহিস্মৃৎখী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তঃস্মৃৎখী করতঃ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে সংযোজনা করার নাম প্রকৃত জ্ঞান।

একদা ভরদ্বাজ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—
“কিং জ্ঞানমিতি ?” ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন—“একাদশেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ
সদৃশরূপাসনয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈর্দৃগদৃশপ্রকারং সর্ব্বং নিরস্ত

সর্বান্তরস্থং ঘটপটাদিবিকারপদার্থেষু চৈতন্ত্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি
সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্।” অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদ-মুখ-পায়ু-উপস্থ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন—
এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহপূর্বক সদৃশ-উপাসনা দ্বারা শ্রবণ-মনন-
নিদিধ্যাসনসহকারে ঘট-পট-মঠাদি বাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের
নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব-বস্তুর বাহ্যভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্বব্যাপী
চৈতন্ত্য ব্যতীত আর কিছু মাত্র সত্য পদার্থ নাই, এতদ্রূপ অনুভবাত্মক
যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহার নাম জ্ঞান। যোগাভ্যাস না করিলে কখনই
জ্ঞান লাভ হয় না। সাধারণের যে জ্ঞান, তাহা ভ্রমজ্ঞান। কেন না
জীবমাত্রেরই মায়াপাশে বদ্ধ, মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে প্রকৃত
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক দর্শন
করিবার উপায় যোগ। যোগসাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনরূপেই
মোক্ষলাভের হেতুভূত যে দিব্যজ্ঞান, তাহা উদয় হয় না। যোগবিহীন
সাংসারিক জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র,—তদ্বারা কেবল সুখ-দুঃখ বোধ হইয়া
থাকে, মুক্তিপথে যাইবার সাহায্য পাওয়া যায় না। পরমযোগী মহাদেব
নিজমুখে বলিয়াছেন—

যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরী !

—যোগবীজ, ১৮

হে পরমেশ্বরী ! যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে
পারে ? সদাশিব যোগের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া পার্বতীর নিকট
বলিয়াছেন—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোহপি ধর্মজ্ঞোহপি জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

বিনা যোগেন দেবোহপি ন মুক্তিং লভতে প্রিয়ে ॥

—যোগবীজ, ৩১

হে প্রিয়ে ! জ্ঞানবান্, সংসারবিরক্ত, ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় কিম্বা কোন দেবতাও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যোগযুক্ত জ্ঞান ব্যতীত কেবল সাধারণ শুদ্ধজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। যোগরূপ অগ্নি অশেষ পাপ-পঙ্কজ দহন করে এবং যোগদ্বারা দিব্যজ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান হইতেই লোকসকল নির্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। যোগাহুষ্ঠানে সমাধি অভ্যাসের পরিপাক হইলেই অন্তঃকরণের অসম্ভবাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে আত্মদর্শন যাত্রেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সুতরাং আপনা-আপনিই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকে। যোগসিদ্ধি ভিন্ন কখনই প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। যোগী ভিন্ন অন্তের জ্ঞান প্রলাপ মাত্র।

যাবন্মৈব প্রবিশতি চরন্ মারুতো মধ্যমার্গে

যাবদ্ধিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ ।

যাবদ্ ধ্যানং সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং

তাবজ্ জ্ঞানং বদতি তদিদং দন্তমিথ্যাপ্রলাপঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৪র্থ অংশ

যে পর্যন্ত প্রাণবায়ু স্বপ্না-বিবরমধ্যে বিচরণ করিয়া ব্রহ্মরক্তে প্রবেশ না করে, যে পর্যন্ত বীর্ষ্য দৃঢ় না হয় এবং যে পর্যন্ত চিত্তের স্বাভাবিক ধোয়াকার বৃত্তিপ্রবাহ উপস্থিত না হয়, সেই পর্যন্ত যে জ্ঞান, তাহা মিথ্যা প্রলাপ মাত্র, উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্ষ্যকে বশীভূত করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। চিত্ত সততই চঞ্চল, স্থির হয় কিসে? শাস্ত্রেই তাহার উত্তর আছে। যথা—

যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো ময্যেকচিত্ততা ।

—আদিত্যপুরাণঃ

যোগাভ্যাসদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগদ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। স্ততরাং চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণসংরোধ।

কুস্তকদ্বারা প্রাণবায়ু স্থিরীকৃত হইলে চিত্ত আপনা-আপনিই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্থির হইলেই বীৰ্য্য স্থির হয়। বীৰ্য্য স্থির হইলেই প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়। কুস্তককালে প্রাণবায়ু স্ফূর্ত্য নাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মহাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেই স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়, প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হয় ; কারণ—

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্ত্ব মারুতঃ।

—হঠযোগপ্রদীপিকা, ২৯

মন ইন্দ্রিয়গণের কর্তা, মন প্রাণবায়ুর অধীন। স্ততরাং প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত নিশ্চয়ই স্থির হইবে। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। স্ততরাং যোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সকলেরই তদভ্যাসে নিযুক্ত হওয়া উচিত। যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ বা আত্মার মুক্তি হয় না।

এইজন্ত পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। এই যোগে সকলেই, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যোগবলে অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিতে পারে—কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সমাধিপদ লাভ করিতে পারে। মত, অনুষ্ঠান, কর্ম, শাস্ত্র ও মন্দিরে যাইয়া উপাসনা প্রভৃতি উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র। সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে থাকিয়াও সাধক এই যোগ-সাধনায় কৈবল্যপদ লাভ করিতে পারেন। অন্তর্ধর্মাবলম্বিগণও আর্ধ্য-শাস্ত্রোক্ত যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

যোগবলে অত্যাশ্চর্য্য অমানুষিক ক্ষমতা লাভ হয়। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি অগ্নিাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন। তাঁহার বাক্যসিদ্ধি হয়; দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, বীৰ্য্যন্তপ্তন, কায়বৃহধারণ ও পরশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে; বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণাদি ধাতুস্তর হয় এবং অন্তর্দান হইবার ক্ষমতা জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি লাভ হয় এবং অন্তর্য্যামিত্র ও অবিরোধে শূন্যপথে গমনাগমনের ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু সাবধান! অলৌকিক শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যোগসাধন করা কর্তব্য নহে, কেননা, তাহাতে মানব-সমাজে, দেশের মাঝে বাহবা পাওয়া যায়—কিন্তু যে যেমন, তাহাই থাকিবে। ব্রহ্মোদ্দেশ্যে যোগসাধন আবশ্যক—বিভূতি আপনি বিকশিত হইবে। যোগাভ্যাসে আসক্তিশূন্য হইতে গিয়া আবার যেন আসক্তির আগুনে দগ্ধ কিম্বা কর্শ্ববন্ধন ছিন্ন করিতে গিয়া কণ্টকপিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে না হয়।

আর এক কথা, সিদ্ধিলাভে যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে সন্দেহই সর্বাপেক্ষা গুরুতর। আমি এত খাটিতেছি, ইহাতে ফল হইবে কিনা—এই সন্দেহই সাধনপথের কণ্টক। কিন্তু যোগে সে আশঙ্কা নাই, যতটুকু অভ্যাস করিবে, তাহারই ফল পাইবে। কাহারও যোগসাধনে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সাংসারিক প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ঘটিয়া না উঠিলে, যদি সেই ইচ্ছা লইয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে পরজন্মে জন্মস্থানাদিরূপ একরূপ উৎকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইবে, যাহাতে যোগাবলম্বনের সুবিধা হইয়া মুক্তির পথ মুক্ত হইবে। যদি কেহ যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহত্যাগ করে, তবে এ জন্মে যতদূর অনুষ্ঠান করিয়াছে, পরজন্মে আপনিই সেই জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে যোগপ্রভ বলা যায়। যোগ-ভ্রষ্টের মৃত্যুর পরের অবস্থার কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে

বলিয়াছেন—“যোগভ্রষ্টজন পুণ্যকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থানে বহু দিনস অবস্থান করিয়া সদাচারসম্পন্ন ধনী-গৃহে অথবা ব্রহ্মবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চবংশে জন্মলাভ করে। সেইজন্য পৌরুষদেহিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভবিষয়ে অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে।”^১ এইরূপ শ্রেষ্ঠতা অবগত হইয়া যোগানুষ্ঠানে যত্ন করা সকলের কর্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক,—

যোগ কি ?

সর্বচিন্তাপরিত্যাগে নিশ্চিন্তা যোগ উচ্যতে ।

—যোগশাস্ত্র

যৎকালে মনুষ্য সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার সেই মনের লয়াবস্থা যোগ বলিয়া উক্ত হয়। অপিচ—

যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ ।

—পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২

চিন্তের বৃত্তিসকলকে রুদ্ধ বা নিরোধ করার নাম যোগ। বাসনা-কামনা-বিজড়িত চিন্তকে বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিপ্রবাহ স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই মানব-হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। চিন্ত সদা সর্বদাই উহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্তির জন্ত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাদিগকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। উহাকে দমন করা উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চিদ্ব্যন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে

* প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।

পুণীনাম্ অমিতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদৌদৃশম্ ॥

—গীতা, ৬।৪১-৪২

লইয়া যাওয়ার নাম যোগ। চিত্ত পরিকার না হইলে তাহাকে নিরোধ করা যায় না;—যেমন মলিন বস্ত্রে গাব ধরে না, তাহাকে কোন রঙে রঞ্জিত হইলে পূর্বে পরিকার করিয়া লইতে হয়। আমরা জলাশয়ের তলদেশ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ কি? জলাশয়ের জল অপরিষ্কার বশতঃ এবং সর্বদা তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ায় উহার তলদেশে দৃষ্টি পতিত হয় না। যদি জল নির্মল থাকে আর বিন্দুমাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। জলাশয়ের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—জলাশয় চিত্ত, আর উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তিস্বরূপ। আমাদের হৃদয়স্থ চৈতন্যঘন পুরুষকে দেখিতে পাই না কেন? আমাদের চিত্ত হিংসাদি পাপে মলিন এবং আশাদি বৃত্তিতে তরঙ্গায়িত; কাজেই আমরা হৃদয় দেখিতে পাই না। যম-নিয়মাদি সাধনে চিত্তমল বিদূরিত করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার নাম যোগ। যম-নিয়মাদি সাধনে হিংসা-কাম-লোভাদি পাপমল বিদূরিত ও কামনা-বাসনা-বিজড়িত চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে পারিলে হৃদয়স্থ চৈতন্যপুরুষের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ দর্শন ঘটিলে—“আমি কে?” “তিনি কে?”—সে ভ্রম দূর হয়। জগৎ কি, পুত্র-কনত্র কি, সোনার বাঁধন কি, লোহার বাঁধন কি, সে জ্ঞানও জন্মে। হৃদয় দৃঢ়ভক্তি ও অহেতুক প্রেমসম্পন্ন হয়। সেই শ্রামসুন্দর চিদ্‌ঘন রূপ আর ভুলিতে পারা যায় না। তখন দিব্যজ্ঞান জন্মে,—বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়,—দারা-পুত্র-ধনৈশ্বর্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে, ঘট-পট প্রেম-প্রীতি কিছু নহে, সেই আদি-অন্তহীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপই সত্য। সত্যস্বরূপের সত্যজ্ঞানে অসত্য দূরে যায়—রাধাশ্যামের মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যায়।

চিত্তের এই অবস্থা নাভের জন্ত যোগের প্রয়োজন। কিন্তু এই অবস্থা পাইতে হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এখন দেখা যাউক, কিরূপে সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়। কিন্তু তৎপূর্বে শরীর-তত্ত্ব জানা আবশ্যক।

শরীর-তত্ত্ব

যোগশিক্ষা করিবার পূর্বে আপন শরীরটির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। শরীর ও প্রাণ এই দুইটি বিষয়ের সম্যক তত্ত্ব অবগত না হইলে যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র; এই জন্ত যোগী হইবার পূর্বে বা তৎসঙ্গেসঙ্গে উহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ কায় ও প্রাণের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাত না হইলে প্রাণকে সংযত করা যায় না, দেহকেও অরুণ রাখা যায় না এবং কোন্ নাড়ীতে কিরূপে প্রাণ সংরক্ষণ করে, কিরূপে প্রাণকে অপানের সহিত সংযোগ করিতে হয়, তাহাও জানা যায় না। সুতরাং যোগসাধনও হয় না। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে,—

নবচক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।

স্বদেহে যে ন জানন্তি কথং সিদ্ধ্যন্তি যোগিনঃ॥

—উৎপত্তি তন্ত্র

✓ নবচক্র, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চাকাশ স্বদেহে যে ব্যক্তি জানে না, তাহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে? যে কোন সাধনজন্ত যাহা প্রয়োজন, সমস্তই দেহমধ্যে আছে।

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সৰ্ব্বাণি দেহতঃ ।

মেরুং সংবেষ্ট্য সৰ্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥

—শিবসংহিতা

“ভূত্বং স্বঃ” এই তিনলোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, তৎসমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে।

দেহেহস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমষ্টিতঃ ।

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সৰ্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ।

পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥

সৃষ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ ।

নভো বায়ুশ্চ বহিষ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥

—শিবসংহিতা

জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত স্মেরু পর্বত অবস্থিতি করে এবং সমুদয় নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া থাকে। মুনি-ঋষিসকল, গ্রহ-নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতাগণ এই দেহে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সৃষ্টিসংহারক চন্দ্র-সূর্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতও দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন।

জানাতি যঃ সৰ্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ।

—শিবসংহিতা

যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। স্মৃতরাং সৰ্ব্বাগ্রে দেহতত্ত্বটি জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক জীবশরীরই শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও স্বক—এই সপ্তধাতু দ্বারা নির্মিত। মৃত্তিকা, বায়ু অগ্নি জল ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে শরীর-নিৰ্মাণসমর্থ এই সপ্তধাতু এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শরীর-ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চভূত হইতে এই শরীর জাত বলিয়া ইহাকে ভৌতিক দেহ কহে। ভৌতিক দেহ নিৰ্জীব ও জড়স্বভাবাপন্ন; কিন্তু ইহা চৈতন্যরূপী পুরুষের আবাসভূমি হওয়াতে সচেতনের গ্রায় প্রতীয়মান হয়। শরীরাত্যন্তরে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানের জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, ঐ স্থানগুলিকে চক্র বলে। তাহারা আপন আপন চক্রে অবস্থান করতঃ শারীরিক সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেছে। গুহ্যদেশে মূলাধারচক্রটি পৃথিবীতত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রটি জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুরচক্রটি অগ্নিতত্ত্বের স্থান, হৃদয়ে অনাহতচক্রটি বায়ুতত্ত্বের স্থান, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রটি আকাশতত্ত্বের স্থান। যোগিগণ এই পাঁচটি চক্রে পৃথ্যাদিক্রমে পঞ্চমহাভূতের ধ্যান করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত চিন্তাযোগ্য আরও কয়েকটি চক্র আছে। ললাটদেশে আজ্ঞা নামক চক্রে পঞ্চতন্ত্রাত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, চিত্ত ও মনের স্থান। তদুর্দ্ধে জ্ঞান নামক চক্রে অহংতত্ত্বের স্থান। তদুর্দ্ধে ব্রহ্মরঞ্জে একটি শতদলচক্র আছে, তন্মধ্যে মহত্ত্বের স্থান। তদুর্দ্ধে মহাশূণ্ডে সহস্রদলচক্রে প্রকৃতি-পুরুষ পরমাত্মার স্থান; যোগিগণ পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব এই ভৌতিক দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন।

নাড়ীর কথা

সাদ্বিলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্ ।

প্রধানভূতা নাড্যন্ত তান্মু মুখ্যাশ্চতুর্দশঃ ॥

—শিবসংহিতা ২।১৩

ভৌতিক দেহটি কার্যক্ষম হইবার জন্য মূলাধার হইতে প্রধানভূতা সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী উৎপন্ন হইয়া, “গন্ধি অস্থি বা পদ্মপত্রের যেরূপ শিরাজাল দৃষ্ট হয়” তদ্রূপ অস্থিময় দেহের উপর ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেছে। এই সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে চতুর্দশটি প্রধান। যথা—

স্বষ্মেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা ।

কূহুঃ সরস্বতী পুষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥

বারুণ্যলম্বুশা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী ।

এতান্মু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়াশ্চষ্মিকাঃ ॥

—শিবসংহিতা ২।১৪-১৫

ইড়া, পিঙ্গলা, স্বষ্মা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কূহু, সরস্বতী, পুষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী অলম্বুশা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী—এই চতুর্দশটি নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্বষ্মা—এই তিন নাড়ী প্রধান। স্বষ্মা নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া নাভিমণ্ডলে যে ডিম্বাকৃতি নাড়ীচক্র আছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উখিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। স্বষ্মার বামপার্শ্ব হইতে ইড়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব হইতে পিঙ্গলা উখিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত ও

বিশুদ্ধ চক্রকে ধনুরাকারে বেষ্টন করতঃ ইড়া দক্ষিণ নাসাপুট পর্যন্ত এবং পিঙ্গলা বাম নাসাপুট পর্যন্ত গমন করিয়াছে। মেরুদণ্ডের রজ্জাভ্যন্তর দিয়া সুষুমা নাড়ী ও মেরুদণ্ডের বহির্দেশ দিয়া পিঙ্গলেড়া নাড়ীদ্বয় গমন করিয়াছে। ইড়া চন্দ্রস্বরূপা পিঙ্গলা সূর্য্যস্বরূপা এবং সুষুমা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্তা ও প্রস্ফুটিত ধূস্তরপুষ্পসদৃশ স্তেতবর্ণা।

পূর্বোক্ত অগ্নাত্ত প্রধানা নাড়ীর মধ্যে কুহু নাড়ী সুষুমার বাম দিক হইতে উত্থিত হইয়া মেট্রদেশ পর্যন্ত গমন করিয়াছে। বারুণী নাড়ী দেহের উর্দ্ধ এবং অধঃ প্রভৃতি সর্বগাত্রই আচ্ছাদন করিয়াছে। যশস্বিনী দক্ষিণ পদের অন্ত্রাগ্রভাগ পর্যন্ত, পুষ্যনাড়ী দক্ষিণ নেত্র পর্যন্ত, পয়স্বিনী দক্ষিণ কর্ণ পর্যন্ত, সরস্বতী জিহ্বাগ্র পর্যন্ত, শঙ্খিনী বাম কর্ণ পর্যন্ত, গান্ধারী বাম নেত্র পর্যন্ত, হস্তিজিহ্বা বামপদানুষ্ঠ পর্যন্ত, অলম্বুশা বদন পর্যন্ত এবং বিশোদরী উদর পর্যন্ত গমন করিয়াছে। এইরূপে সমস্ত শরীরটী নাড়ী দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। নাড়ীর উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে মনঃস্থির করিয়া চিন্তা করিলে বোধ হইবে, কন্দমূলটী ঠিক যেন পদ্মবীজকোষের চতুঃপার্শ্ব কেশরের মত নাড়ীসমূহ দ্বারা বেষ্টিত; এবং বীজকোষটীর মধ্যস্থল হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ী পরাগকেশরের মত উত্থিত হইয়া পূর্বোক্ত স্থান পর্যন্ত গমন করিয়াছে। ক্রমে ঐ সকল নাড়ী হইতে শাখা-প্রশাখাসকল উত্থিত হইয়া শরীরটিকে আপাদমস্তক বস্ত্রের টানা-পড়িয়ানের মত ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

যোগিগণ প্রধানভূতা এই চতুর্দশ নাড়ীকে পুণ্যনদী বলিয়া থাকেন। কুহু নামী নাড়ীকে নর্মদা, শঙ্খিনী নাড়ীকে তাপ্তী, অলম্বুশা নাড়ীকে গোমতী, গান্ধারী নাড়ীকে কাবেরী, পুষ্য নাড়ীকে

তাত্রপর্ণী এবং হস্তিজিহ্বা নাড়ীকে সিদ্ধু বলে। ইড়া গঙ্গারূপা, পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপা আর সুষুম্না সরস্বতীরূপিণী; এই তিন নদী আজ্ঞাচক্রের উপরে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের নাম ত্রিকূট বা ত্রিবেণী। এলাহাবাদে ত্রিবেণীতে লোক কষ্টোপার্জিত পয়সা ব্যয় করিয়া কিম্বা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া স্নান করিতে যান, কিন্তু ঐসকল নদীতে বাহস্নান করিলে যদি মুক্তি হইত, তবে তীর্থাদির জলে জলচর জীবজন্তু থাকিত না, সকলেই উদ্ধার পাইত। শাস্ত্রেও ব্যক্ত আছে যে—

“অন্তঃস্নানবিহীনশ্চ বহিঃস্নানেন কিং ফলম্ !”

অন্তঃস্নানবিহীন ব্যক্তির বাহস্নানে কোন ফল নাই। গুরুর কৃপার ধিনি আত্মতীর্থ জ্ঞাত হইয়া আজ্ঞাচক্রোদ্ধে এই তীর্থরাজ ত্রিবেণীতে মানস স্নান বা যৌগিক স্নান করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিপদ লাভ করেন, শিববাক্যে সন্দেহ নাই।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই প্রধান তিনটা নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সর্বপ্রধান। ইহার গর্ভে বজ্রাণী নামক নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী শিশ্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শিরঃস্থান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে। বজ্রনাড়ীর অভ্যন্তরে আত্মপ্রণবযুক্তা অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব দ্বারা আদিতেও অন্তে পরিবর্তন্যাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্মা চিত্রাণী নাম্নী আর একটি নাড়ী আছে। এই চিত্রাণী নাড়ীতে পদ্ম বা চক্রসকল প্রথিত রহিয়াছে। চিত্রাণীনাড়ীর মধ্যে আর একটি বিদ্যুৎপর্ণা নাড়ী আছে, তাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। ব্রহ্মনাড়ী মূলধারপদ্মস্থিত মহাদেবের মুখবিবর হইতে উৎখিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রদল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। যথা—

তন্মধ্যে চিত্রাণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা
 নৃতাতন্তুপমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্ ।
 ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ প্রথনরচনয়া শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা
 তস্তান্তব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবাস্তসংস্থা ॥

—পূর্ণানন্দ পরমহংসকৃত ষট্চক্র

এই ব্রহ্মনাড়ীটি অহর্নিশ যোগিগণের পরিচিন্তনীয়, কারণ, যোগ-
 সাধনার চরম ফল ব্রহ্মনাড়ীটি হইতে লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মনাড়ীর
 ভিতর দিয়া গমন করিতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং
 যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে কোন্
 নাড়ীতে কিরূপ বায়ু সঞ্চরণ করে জানা আবশ্যক।

বায়ুর কথা

ভৌতিক দেহে যত প্রকার শারীরিক কার্য্য হইয়া থাকে,
 তৎসমস্তই বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চৈতন্তের সাহায্যে এই জড়
 দেহে বায়ুই জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেহ
 কেবল যন্ত্র মাত্র; বায়ু ঐ যন্ত্রটি চালনা করিবার উপকরণ। স্ততরাং
 বায়ুকে বশ করার উপায়ের নাম যোগসাধন। বায়ু বশ হইলেই মনও
 বশ হয়, মন স্ববশে আসিলে ইন্দ্রিয় জয় করা যায়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই
 সিদ্ধিলাভের আর বাকী থাকে না। বায়ু জয় করিয়া যাহাতে
 চৈতন্তস্বরূপ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহার জন্তই যোগিগণ
 যোগসাধন করিয়া থাকেন, স্ততরাং সর্ব্বাংশে বায়ুর বিষয় জ্ঞাত হওয়া
 অতীব প্রয়োজন।

মানবদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অনাহত নামক একটি রক্তবর্ণ পদ আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে বায়ুবীজ (যং) নিহিত আছে; ঐ বায়ুবীজ বা বায়ুযন্ত্র প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; প্রাণবায়ু শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দৈহিক কার্য্যভেদে দশ নাম ধারণ করিয়াছে।

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানো চ বায়বঃ।

নাগঃ কূর্মোহথ কুকরো দেবদন্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২৯

প্রাণ, অপান, সমান উদান, ব্যান; নাগ, কূর্ম, কুকর দেবদন্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ নামে প্রাণবায়ু অভিহিত হইয়া থাকে। এই দশ বায়ুর মধ্যে, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্তঃস্থ এবং নাগাদি পঞ্চবায়ু বহিঃস্থ। অন্তঃস্থ পঞ্চপ্রাণের দেহমধ্যে পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট আছে।

স্থানা—

হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুহুমণ্ডলে,

সমানো নাভিদেহে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ;

ব্যানো ব্যাপী শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ।

—গোরক্ষসংহিতা, ৩০

প্রধান পঞ্চবায়ুর মধ্যে হৃদয়ে প্রাণবায়ু, অপানবায়ু গুহুমণ্ডলে, সমানবায়ু নাভিমণ্ডলে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে, ব্যানবায়ু সর্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

যদিও বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এক প্রাণবায়ু মূল ও প্রধান।

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।

—শিবসংহিতা

প্রাণবায়ুর বৃত্তিভেদে বিবিধ নাম সঙ্কলিত হইয়াছে। এক্ষণে এই—

দশ বায়ুর গুণ

জানা আবশ্যক। প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চবায়ু ও নাগাদি বহিঃস্থ পঞ্চবায়ু যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া শারীরিক সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেছে। যথা—

নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্ ।

অপানবায়োঃ কস্মৈতদ্বিন্মুত্রাদিবিসর্জ্জনম্ ॥

হানোপাদানচেষ্ঠাদিবিদ্যানকস্মৈতি চেষ্যতে ।

উদানকর্ম্ম তচ্চোক্তং দেহশ্চোন্নয়নাদি যৎ ॥

পোষণাদি সমানস্ত শরীরে কর্ম্ম কীর্ত্তিতং ।

উদগারাদিগুণৈ যন্ত নাগকর্ম্ম সমীরিতং ॥

নিমীলনাদি কূর্ম্মস্ত ক্ষুভ্র্ষে ক্বকরস্ত চ ।

দেবদত্তস্ত বিপ্রেন্দ্র তন্দ্রাকস্মৈতি কীর্ত্তিতং ।

ধনঞ্জয়স্ত শোষাদি সর্ব্বকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৪।৬৬—৬৯

নাসিকা দ্বারা হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস, উদরে ভুক্তান্ন-পানীয়কে পরিপাক ও পৃথক্ করা নাভিস্থলে অগ্নিকে পুরীষরূপে, পানীয়কে শ্বেদ ও মূত্ররূপে এবং রসাদিকে বীৰ্য্যরূপে পরিণত করা প্রাণবায়ুর কার্য্য; উদরে অগ্নিাদি পরিপাক করিবার জন্ত অগ্নিপ্রজ্বালন করা, গুহে মল-নিঃসারণ করা, উপস্থে মূত্রনিঃসারণ করা, অণ্ডকোষে বীৰ্য্য নিঃসারণ করা এবং মেট্র, উরু, জাহ্নু, কটিদেশ ও জজ্বাঘ্রয়ের কার্য্য সম্পন্ন করা অপানবায়ুর কার্য্য; পরিপক রসাদিকে বাহ্যন্তর হাজার নাড়ীমধ্যে

পরিব্যাপ্ত করা; দেহের পুষ্টিসাধন করা ও শ্বেদ নির্গত করা সমান-
বায়ুর কার্য; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থান ও অঙ্গের উন্নয়ন করা উদান-
বায়ুর কার্য; কর্ণ নেত্র, স্বন্ধ, গুল্ফ, গলদেশ ও কটির অধোদেশের
ক্রিয়া সম্পন্ন করা ব্যানবায়ুর কার্য। উদগারাদি নাগবায়ু,
সন্ধোচনাদি কূর্মবায়ু, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি কুকরবায়ু, নিদ্রা-তন্দ্রাদি
দেবদন্তবায়ু ও শোষণাদি কার্য ধনঞ্জয়বায়ু সম্পন্ন করিয়া থাকে।
বায়ুর এই সকল গুণ অবগত হইয়া বায়ুজয় করিতে পারিলে স্বেচ্ছামত
শরীরের উপর আধিপত্যস্থাপন এবং শরীর সুস্থ, নীরোগ ও পুষ্টিকান্তি-
বিশিষ্ট করা যায়।

শরীরে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাৎকাল দেহ জীবিত
থাকে। সেই বায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে
মৃত্যু সংঘটন হয়। প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রস্থি
পর্য্যন্ত গমনাগমন করে, আর যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রস্থি পর্য্যন্ত
অপান বায়ু অধোভাগে গমনাগমন করে। যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা
প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের উর্দ্ধভাগ স্ফীত করিতে থাকে,
সেইকালেই অপানবায়ু যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের
অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এইরূপ নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান
উভয় দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই দুই বায়ুই পূরককালে নাভি-
গ্রস্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচককালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে।
যথা—

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি ।

রজ্জুবদ্ধো যথা শোনো গতৌহপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥

তথা চৈতৌ বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিদম্ ।

—ষট্চক্রভেদটীকা

অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানবায়ুকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্বেনপক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, উড্ডীয়মান হইয়াও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে, প্রাণবায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়াও অপানবায়ু কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে, এই দুই বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয়। আর যখন ঐ দুই বায়ু নাভিগ্রস্থি ভেদ পূর্ব্বক একত্রে মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা দেহ ত্যাগ করে, পৃথিবীর ভাষায় জীবেরও মৃত্যু হয়। গমন কালে ঐ ভাবে নাভিগ্রাস বলে। বায়ুর ঐ সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হওয়া উচিত। অধুনা শরীরস্থ হংসাচারের বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

হংস-তত্ত্ব

মানবদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অনাহত নামক পদ্মে ত্রিকোণাকার গীঠে বায়ু-বীজ 'হং' আছে। এই বায়ুমণ্ডল মধ্যে কামকলারূপ তেজোময় রক্তবর্ণ গীঠে কোটাবিহ্যৎসদৃশ ভাস্বর সূর্যবর্ণ বাণলিঙ্গ শিব আছেন। তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ তেজোময় অতি সূক্ষ্ম একটা মণি আছে। তন্মধ্যে নির্ব্বাত দীপকলিকার স্তায় হংসবীজ-প্রতিপাত্ত তেজোবিশেষ আছে। ইনিই জীবের জীবাত্মা। অহংভাব আশ্রয় করিয়া এই জীবাত্মা মানবদেহে আছেন। আমরা মায়ায় মুহমান ও শোকে কাতর হই এবং সর্ব্বপ্রকার স্তম্ভস্থ ইত্যাদি ফলভোগ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের সকলেরই হৃদয়স্থিত ঐ জীবাত্মা ভোগ করিয়া থাকেন। অনাহত পদ্মে এই জীবাত্মা অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথবা ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন।

‘সোহং—হংসঃ’-পদে নৈব জীবো জপতি সর্বদা ।

হংসের বিপরীত “সোহং” জীব সর্বদা জপ করিতেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে হংস উচ্চারিত হয়। শ্বাসবায়ুর নির্গমন সময়ে হং ও গ্রহণ সময়ে সঃ এই শব্দ উচ্চারিত হয়। হং শিবস্বরূপ এবং সঃ শক্তিরূপিণী যথা—

হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্ত প্রবেশনে ।

হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরূচ্যতে ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র, ১১।৭

শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যদি গ্রহণ করা না গেল, তবে তাহাতেই মৃত্যু হইতে পারে, অতএব হং শিবস্বরূপ বা মৃত্যু। ‘সঃ’ কারে গ্রহণ, ইহাই শক্তিস্বরূপ। অতএব এই শ্বাস-প্রশ্বাসেই জীবের জীবন্ত, শ্বাসরোধেই মৃত্যু। সুতরাং হংসই জীবের জীবাত্মা। শাস্ত্রেও ভূতশুদ্ধির মধ্যে আছে “হংস ইতি জীবাত্মানং” অর্থাৎ হংস এই জীবাত্মা।

এই হংসশব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলে। যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয় ততবার “হংস” পরম মন্ত্র অজপা জপ হয়। জীব অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও সাধনা। ইহা জানিতে পারিলে মালা-ঝোলা লইয়া আর বাহ্যাহুষ্ঠান বা উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। দুঃখের বিষয়, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও সঙ্কেতের উপদেশাভাবে এমন সহজ জপ-সাধনা কেহ বুঝে না। গুরুপদেশে এই হংসধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংস বিপরীত “সোহং” সাধকের সাধনা। জীবাত্মা সর্বদা এই “সোহং” (অর্থাৎ আমিই তিনি, কি না আমিই সেই পরমেশ্বর) শব্দ জপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু আমাদের অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন বিষয়বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধক সামান্য কৌশলে এই স্বত-উথিত অশ্রুতপূর্ব অলোক-সামান্য “হংস” ও “সোহং” ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

প্রণব-তত্ত্ব

অনাহত পদ্যের পূর্বোক্ত “হংস”-ধ্বনিকে প্রণবধ্বনি বলে।
যথা—

শব্দব্রহ্মেতি তাং প্রাহ সাক্ষাদ্ভবঃ সদাশিবঃ ।

অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্যতে ॥

—পর্যাপরিমলোম্মাস

অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম। তাহা সাক্ষাৎ দেবতা সদাশিব। সেই শব্দ অনাহত চক্রে আছে। অনাহত পদ্যে হংস উচ্চারিত হয়। সেই হংসই প্রণব বা ওঁকার। যথা :—

হকারঞ্চ সকারঞ্চ লোপয়িত্বা ততঃ পরং ।

সন্ধিং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোহসৌ মহামনুঃ ॥

—যোগস্বরোদয়

অর্থাৎ “হংস” বিপরীত “সোহং” হয়; কিন্তু স আর হ লোপ হইলে কেবল ওঁ থাকিল। ইহাই হৃদয়স্থ শব্দব্রহ্মরূপ ওঁকার। সাধকগণ শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবধ্বনি (ওঁকার) শ্রবণলালসায় দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত পদ্য উচ্চ মুখে চিন্তা করিয়া গুরুপদেশাত্মসারে ক্রিয়া করিবেন, তাহা হইলে হংস বা ওঁকারধ্বনি কর্ণগোচর হইবে।

এই শব্দব্রহ্মরূপ ঔকার ব্যতীত আর একটি বর্ণব্রহ্মরূপ ঔকার আছে। তাহা আজ্ঞাচক্রোদ্ধে নিরালম্বপুরে নিত্য বিরাজিত। ভ্রমধ্যে দ্বিদলবিশিষ্ট স্বেতবর্ণ আজ্ঞাচক্র আছে। এই চক্রের উপর যে স্থানে সূর্য্যানাড়ীর শেষ ও শঙ্খিনীনাড়ীর আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানকে নিরালম্বপুরী বলে। তাহাই তেজোময় তারকব্রহ্ম স্থান। এইখানে ব্রহ্মনাড়ী আশ্রিত তারকবীজ প্রণব (ঔকার) বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রণব বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ এবং শিবশক্তিযোগে প্রণবরূপ। শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার গজকুন্তের ন্যায় অর্থাৎ “ও” কার। ঔ-কাররূপ পর্য্যঙ্কে নাদরূপিণী দেবী; তদুপরি বিন্দুরূপ পরম শিব। তাহা হইলেই ঔ-কার হইল। সূতরাং শিব-শক্তি বা প্রকৃতি-পুরুষের সমযোগেই ঔকার। তন্মধ্যে এই ঔকারের স্থূলমূর্ত্তি বা রাজরাজেশ্বরীরূপ মহাবিছা প্রকাশিত।* তাহার গুঢ় রহস্য ও বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নহে।

সাধক যোগানুষ্ঠানে যথাবিধি ষট্চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয়ে এই নিরালম্বপুরীতে আসিলে মহাজ্যোতিরূপ ব্রহ্ম, ঔকার অথবা আপন আপন ইষ্টদেবতা দর্শন হয় এবং প্রকৃত নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়েন। সকল দেব-দেবীর বীজস্বরূপ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ প্রণব-তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধন করিলে এই তারকব্রহ্মস্থানে জ্যোতির্গয় দেব-দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। তাহা হইলে আর তীর্থে তীর্থে ছুটাছুটি করিয়া অকারণ কষ্টভোগ করিতে হয় না।

*শ্রীমৎ স্বামী বিমলানন্দ কৃত ‘কলিকাতা চোরবাগান আর্টগ্যালারি’ হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীকালিকা-মূর্ত্তি প্রণবের স্থূলরূপ। পঞ্চপ্রত্যাসনে মহাকাল শায়িত, তাহার নাভিকমলে শিবশক্তি অবস্থিত। অপূর্ণ মিলন।

ওঁকার প্রণবের নামান্তর মাত্র। ওঁকারের তিন রূপ ; —শ্বেত, পীত ও লোহিত। অ, উ, ম যোগে প্রণব হইয়াছে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ মহেশ্বর প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যথা—

শিবো ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুরোঙ্কারে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

অকারশ্চ ভবেদ্ব্রহ্মা উকারঃ সচ্চিদানন্দকঃ ।

মকারো রুদ্র ইত্যুক্তঃ—

অ-কার ব্রহ্মা, উ-কার বিষ্ণু, ম-কার মহেশ্বর। স্তূতরাং প্রণবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেব ; ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন শক্তি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেজন্য ইহাকে ত্রয়ী কহে। শাস্ত্রে আছে “ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ” অর্থাৎ ত্রয়ী অকার উকার ও মকারবিশিষ্ট শব্দ প্রণবধর্ম সর্বদা ফলদাতা। যিনি প্রণবত্রয়যুক্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী জপে তিন প্রণব সংযুক্ত এবং ইষ্টমন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব দ্বারা সেতুবন্ধন করিয়া জপ না করিলে গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র জপ নিষ্ফল। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে দুই প্রণব যোগে জপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; আদি, ব্যাহতির পর ও শেষে এই তিন স্থানে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ করা কর্তব্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, অ, উ, ম যোগে প্রণব। প্রণবের এই অকার নাদরূপ, উকার বিন্দুরূপ, মকার কলারূপ এবং ওঁকার জ্যোতিরূপ। সাধকগণ সাধনাসময়ে প্রথমে নাদ শুনিয়া নাদলুপ্ত হন, পরে বিন্দুলুপ্ত, তৎপরে কলালুপ্ত হইয়া সর্বশেষে জ্যোতির্দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রণবে অষ্ট অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিহান, পঞ্চদেবতা প্রভৃতি আরও অনেক গুহ্যরহস্য আছে। কিন্তু সে সকলের সম্যক তত্ত্ব বা বিশদ ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

— — —

কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধারপদ আছে। তাহার মধ্যে পূর্বোক্ত ব্রহ্মনাড়ী-মুখে স্নায়ুভুলিঙ্গ আছেন। তাঁহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিন বার বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি আছেন।

যথা—

পশ্চিমাভিমুখী যোনিগুদমেট্রাস্তুরালগা।

তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা ॥

—শিবসংহিতা—

গুহ্য ও লিঙ্গ এই দুইয়ের মধ্যস্থানে পশ্চাদভিমুখী যোনিমণ্ডল আছে—সেই যোনিমণ্ডলকে কন্দও বলা যায়। যোনিমণ্ডলের মধ্যে কুণ্ডলিনীশক্তি নাড়ীসকলকে বেষ্টন করিয়া সার্ব্ব ত্রিকুটিলাকার সর্পরূপে আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্না-ছিদ্রকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

এই কুণ্ডলিনীই নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি ; তাঁহার দুই মুখ এবং বিদ্যুল্লতাকার ও অতি সূক্ষ্ম, দেখিতে অর্দ্ধ ওঙ্কারের প্রকৃতি তুল্য। মরামরাস্বাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী বিরাজিতা আছেন। পদ্যোদরে যেমন অলির অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে

কুণ্ডলিনী বিরাজিত থাকেন। ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কদলীকোষের
 ত্রায় কোমল মূলাধারে চিৎশক্তি থাকেন তাঁহার গতি অতি
 দুৰ্লভ্য।

কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপ দীপ্তিমতী এবং সহ,
 রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের প্রস্থিতি ব্রহ্মশক্তি। এই কুণ্ডলিনী-
 শক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্বশরীরস্থ
 চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। এই শক্তিই আমাদের জীবনীশক্তি। এই
 শক্তিকে আয়ত্তীভূত করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য।

এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তিই জীবাশ্মার প্রাণস্বরূপ। কিন্তু কুণ্ডলিনী-
 শক্তি ব্রহ্মার রোধ করতঃ স্থখে নিদ্রা যাইতেছেন, তাহাতেই
 জীবাশ্মা রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক চালিত হইয়া অহংভাবাপন্ন হইয়াছেন
 এবং অজ্ঞান-মায়াজ্জর হইয়া স্থখ-দুঃখাদি ভ্রান্তিজ্ঞানে কর্মফল
 ভোগ করিতেছেন। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা না হইলে শত শত
 শাস্ত্রপাঠে বা গুরুপদে প্রকৃত জ্ঞান সমুদ্ভূত হয় না এবং তপ-জপ
 ও সাধনভজন সমস্তই ব্যথা। যথা—

মূলপদ্যে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।

তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যত মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদিকম্ ॥

জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।

তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদিকম্।

—গৌতমীয় তন্ত্র

মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যাবৎ জাগরিতা না হইবেন তাবৎ
 কাল মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল। যদি পুণ্যপ্রভাবে
 সেই শক্তিদেবী জাগরিতা হয়েন, তবে মন্ত্রজপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে।

যোগাহুষ্ঠান দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই মানব-জীবনের পূর্ণত্ব। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যান পাঠে সাধকের ঐ শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিত হইয়া থাকেন। ধ্যান যথা—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্

তামিষ্টদেবতারূপাং সার্বভৌমবলয়াস্বিতাম্।

কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্ ॥

এক্ষণে শরীরস্থ নবচক্রাদির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; নতুবা যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র।

নবচক্রং কলাধারাং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্।

স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥

—যোগস্বরোদয়

শরীরস্থ নবচক্র, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চপ্রকার ব্যোম যে ব্যক্তি অবগত নহে, সে ব্যক্তি কেবল নামধারী যোগী অর্থাৎ সে যোগতত্ত্বের কিছুই জ্ঞাত নহে। কিন্তু নবচক্রের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করা এই নিঃস্ব লেখকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে এই গ্রন্থে যে কয়েকটি সাধন-কৌশল সন্নিবেশিত হইল, তৎসাধনোপযোগী মোটামুটি নবচক্রের বিবরণ বর্ণিত হইল। যিনি সম্যক্ জানিতে চাহেন, তিনি পূর্ণানন্দ পরমহংস রূত “ষট্চক্র” হইতে জানিয়া লইবেন। যোগসাধন ব্যতীত, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য জপ-পূজাদি করিতেও চক্রাদির বিবরণ জানা আবশ্যক।

নব চক্রং

মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোদ্ধে বর্ততে মহৎ ।
 লিঙ্গমূলে তু পীতাভং স্বাধিষ্ঠানন্ত বড়্দলম্ ॥
 তৃতীয়ং নাভিদেশে তু দিগদলং পরমাদ্বিতম্ ।
 অনাহতমিষ্টপীঠং চতুর্থ কমলং হৃদি ॥
 কলাপত্রং পঞ্চমন্তু বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ
 আজ্ঞায়াং ষষ্ঠকং চক্রং ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিপত্রকম্ ॥
 চতুঃষষ্টিদলং তালুমধ্যে চক্রন্তু মধ্যমম্ ।
 ব্রহ্মারক্রেহষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভম্ ॥
 নবমন্তু মহাশূলং চক্রন্তু তৎ পরাংপরম্ ।
 তন্মধ্যে বর্ততে পদ্মং সহস্রদলমদ্বিতম্ ॥

—প্রাণতোষিগীত তন্ত্রবচন

এই তন্ত্রবচনের ব্যাখ্যায় সাধকগণ নবচক্রের বিবরণ কিছুই জানিতে
 পারিবেন না ; অতএব ষট্চক্রের সংস্কৃতাংশ পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদ
 হইতে সাধকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইল ।

প্রথম—মূলাধার চক্র

মানবদেহের গুহদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উদ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে
 দুই অঙ্গুলি নিম্নে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত যে ষোনিমণ্ডল আছে, তাহারই
 উপরে মূলাধার পদ্ম অবস্থিত । ইহা অন্ন রক্তবর্ণ ও চতুর্দলবিশিষ্ট,
 চতুর্দল—ব শ ষ স এই চারি বর্ণাঙ্কক । এই চারি বর্ণের বর্ণ স্ববর্ণের
 আয় । এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অষ্টশূল-শোভিত চতুষ্কোণ পৃথ্বিমণ্ডল

আছে। তাহার একপার্শ্বে পৃথিবীজ লং আছে। তন্মধ্যে পৃথিবীজ-প্রতিপাত ইন্দ্রদেব আছেন। ইন্দ্রদেবের চারি হস্ত, তিনি পীতবর্ণ ও শ্বেত হস্তীর উপর উপবিষ্ট। ইন্দ্রের ক্রোড়ে শৈশবাবস্থায় চতুর্ভূজ ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মার ক্রোড়ে রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা সালঙ্কতা ডাকিনী নামী তৎশক্তি বিরাজিতা।

লং বীজের দক্ষিণে কামকলারূপ রক্তবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল আছে। তন্মধ্যে তেজোময় রক্তবর্ণ ক্লীং বীজরূপ কন্দর্প নামক রক্তবর্ণ স্থিরতর বায়ুর বসতি। তাহার মধ্যে ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মুখে অমৃতসুপ্তি আছেন। ঐ লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও কোটি সূর্যের তায় তেজোময়। তাঁহার গায়ে সাড়ে তিন বার বেঠন করিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তি আছেন। এই কুল-কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে চিংশক্তি বিরাজিতা। এই কুণ্ডলিনী-শক্তি সকলেরই ইষ্টদেবীস্বরূপিণী এবং মূলাধারচক্র মানব-দেহের আধারস্বরূপ, এজন্ত ইহার নাম আধারপদ্ম। সাধন-ভজনের মূল এই স্থানে, এই জন্ত ইহাকে মূলাধারপদ্ম বলে।

এই মূলাধারপদ্ম ধ্যান করিলে গন্ত-পত্নাদি বাক্সিদ্ধি ও আরোগ্যাদি লাভ হয়।

দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান চক্র

লিঙ্গমূলে সংস্থিত দ্বিতীয় পদ্বের নাম স্বাধিষ্ঠান। ইহা স্প্রদীপ্ত অরুণবর্ণ ও ষড়্দলবিশিষ্ট, ষড়্দল—ব ভ ম য র ল এই ছয় মাতৃকা-বর্ণাঙ্কক। প্রত্যেক দলে অবজ্ঞা, মূর্ছা, প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, সর্বনাশ ও ক্রুরতা এই ছয়টি বৃত্তি রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকাভ্যন্তরে

শ্বেতবর্ণ অঙ্কচন্দ্রাকার বরুণমণ্ডল আছে। তন্মধ্যে বরুণবীজ শ্বেত-
বর্ণ বৎ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে বরুণবীজপ্রতিপাদ্য শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ
বরুণ দেবতা মকরারোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎকোড়ে, জগৎ-
পালক নবযৌবনসম্পন্ন হরি আছেন। তাঁহার চতুর্ভুজ; চারি হাতে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষে শ্রীবৎস-কৌস্তভ
শোভিত এবং পরিধানে পীতাম্বর। তাঁহার কোড়ে দিব্যবস্ত্র ও
আভরণভূষিতা চতুর্ভুজা গৌরবর্ণা রাকিনী নাম্নী তৎশক্তি
বিরাজিতা।

এই পদ্ম ধ্যান করিলে ভক্তি, আরোগ্য ও প্রভুত্বাদি সিদ্ধি
হইয়া থাকে।

তৃতীয়—মণিপুর চক্র

নাভিদেশে তৃতীয় পদ্ম মণিপুর অবস্থিত। ইহা মেঘবর্ণ
দশদলযুক্ত, দশদল—ড চণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশ মাতৃকা-
বর্ণাঙ্কক। এই দশ বর্ণ নীলবর্ণ। প্রত্যেক দলে লজ্জা, পিণ্ডনতা,
ঈর্ষ্যা, স্নয়ুপ্তি, বিষাদ, কষায়, তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয় এই দশটি বৃত্তি
রহিয়াছে। মণিপুরপদ্মের কর্ণিকামধ্যে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল
আছে। তন্মধ্যে বহ্নিবীজ রং আছে; ইহাও রক্তবর্ণ। এই বহ্নি-
বীজমধ্যে তৎপ্রতিপাত চারিহস্তযুক্ত রক্তবর্ণ অগ্নিদেব মেঘারোহণে
অধিষ্ঠিত আছেন। তৎকোড়ে জগন্নাশক ভস্মভূষিত সিন্দূরবর্ণ
রুদ্র ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দুই হস্ত, এই দুই হস্তে
বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। তাঁহার ত্রিনয়ন ও পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম।

তাহার ক্রোড়ে পীতবসনপরিধানা, নানালঙ্কারভূষিতা, চতুর্ভুজা, সিন্দূর-বর্ণা লাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা।

এই পদ্য ধ্যান করিলে আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয় এবং জগন্নাশাদি করিবার ক্ষমতা জন্মে।

চতুর্থ—অনাহতচক্র

হৃদয়ে বন্ধুকপুস্পদশ বর্ণবিশিষ্ট দ্বাদশদলযুক্ত চতুর্থ পদ্য অনাহত অবস্থিত। দ্বাদশ দল—ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ মাতৃকাবর্ণাঙ্ক। বর্ণ কয়েকটির রং সিন্দূরবর্ণ। প্রত্যেক দলে আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা বিতর্ক ও অহুতাপ এই দ্বাদশটি বৃত্তি রহিয়াছে; এই পদ্যের কর্ণিকামধ্যে অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল এবং ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে। তাহার একপার্শ্বে ধূম্রবর্ণ, বায়ুবীজ যং আছে। এই বায়ুবীজ মধ্যে তৎপ্রতিপাত্ত ধূম্রবর্ণ, চতুর্ভুজ বায়ুদেব কৃষ্ণনারাধিরোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে বরাভয়-লসিতা ত্রিনেত্রা সর্কালঙ্কার-ভূষিতা মুণ্ডমালাধরা পীতবর্ণা কাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা। এই অনাহতপদ্যমধ্যস্থ বাণলিঙ্গ শিব ও জীবাত্মার বিষয় হংসতন্ময় বর্ণিত হইয়াছে।

এই অনাহতপদ্য ধ্যান করিলে অগ্নিমাди অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হইয় থাকে।

পঞ্চম—বিশুদ্ধচক্র

কঠিনদেশে ধূস্রবর্ণ ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধপদ্ম অবস্থিত। ষোড়শদল—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঋ ২৩ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোল মাতৃকাবর্ণাঙ্ক। বর্ণগুলির বর্ণ শোণপুষ্পের বর্ণসদৃশ। প্রত্যেক দলে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্তস্বর ও হ্র, ফট্, বৌষট্, বযট্, স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি রহিয়াছে। এই পদ্মের কর্ণিকায় ঋতবর্ণ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে স্ফটিকসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হং আছে। তাহার মধ্যে হংবীজপ্রতিপাত্ত আকাশ-দেবতা ঋতহস্তীতে আরুঢ়। তাঁহার চারি হাত, ঐ চারি হাতে পাশ অঙ্কুশ, বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। এই আকাশ-দেবতার ক্রোড়ে ত্রিলোচনারিত পঞ্চমুখলসিত দশভুজ সদস্যকর্ম্ম-নিয়োজক ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্বর সদাশিব আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে শর, চাপ, পাশ ও শূলযুক্তা চতুর্ভুজা পীতবসনা রক্তবর্ণা শাকিনী নারী তৎশক্তি অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে বিরাজিত। এই অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের নিকটে সকলেরই বীজমন্ত্র বা মূলমন্ত্র বিद्यমান আছে।

এই বিশুদ্ধপদ্ম ধ্যান করিলে জরা ও মৃত্যুপাশ-বিরহিত হইয়া ভোগাদি হয়।

ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র

ক্রিয়ামধ্যে ঋতবর্ণ দ্বিাদলবিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্ম অবস্থিত। দুই দল—হ্র স্ব এই দুই বর্ণাঙ্ক। এই পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে শরচ্চন্দ্রের স্তায় নির্মল ঋতবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল আছে। ত্রিকোণের তিন কোণে

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ এবং ত্রিগুণাবৃত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেব আছেন। ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে গুরুবর্ণ চন্দ্রবীজ ঠং দীপ্তিমান আছেন। ত্রিকোণমণ্ডলের এক পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ বিন্দু আছে। তাহার পার্শ্বে চন্দ্রবীজ-প্রতিপাদ্য বরাভয়-লসিত দ্বিভুজ দেববিশেষের ক্রোড়ে জগন্নিধান-স্বরূপ শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিনেত্র জ্ঞানদাতা শিব আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে শশিসম গুরুবর্ণা ষড়বদনা বিদ্যা-মুদ্রা-কপাল-ডমরু-জপবটি-বরাভয়-শর-চাপাদ্ব্যুশ-পাশ-পঙ্কজ-লসিতা দ্বাদশভুজা হাকিনী নায়ী তৎশক্তি বিরাজিতা।

আজ্ঞাচক্রের উপরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান। এই স্থানের নাম ত্রিকূট বা ত্রিবেণী। ত্রিবেণীর উর্দ্ধে সুষুম্নামুখের নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল আছে। অর্দ্ধচন্দ্রের উপর তেজঃপুঞ্জস্বরূপ একটি বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুর উপরি উদ্ধাধোভাবে দণ্ডাকার নাদ আছে। দেখিতে ঠিক যেন একটি তেজোরেখা দণ্ডায়মান। ইহার উপরে শ্বেতবর্ণ একটি ত্রিকোণমণ্ডল আছে। তন্মধ্যে শক্তিরূপ শিবাকার হকারাঙ্ক আছে। এই স্থানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার অগ্ন্যাত্ত বিষয় প্রণব-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

এই আজ্ঞাপদ্মের আর একটি নাম জ্ঞানপদ্ম। পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ইচ্ছা তাঁহার শক্তি। এখানে প্রদীপ্তশিখারূপিণী আত্ম-জ্যোতিঃ স্পীত স্বর্ণরেণুর আয় বিরাজমান। এই স্থানে যে-জ্যোতির্দর্শন হয়, তাহাই সাক্ষকের আত্মপ্রতিবিস্ম। এই পদ্য ধ্যান করিয়া দিব্য-জ্যোতিঃ দর্শন ঘটিলে যোগের চরম ফল অর্থাৎ প্রকৃত নিষ্কারণ প্রাপ্তি হয়।

সপ্তম—ললনাচক্র

তালুম্বে রক্তবর্ণ চৌষট্টিদলবিশিষ্ট ললনাচক্র অবস্থিত। এই পদ্মে অহংতত্ত্বের স্থান। এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সন্ত্রম, উর্ষি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশ বৃত্তি এবং অমৃতস্থানী আছে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে উন্মাদ, জ্বর, পিত্তাদিজনিত দাহ, শূলাদি বেদনা এবং শিরঃপীড়া ও শরীরের জড়তা নষ্ট হয়।

অষ্টম—গুরুচক্র

ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্বেতবর্ণ শতদলবিশিষ্ট অষ্টম পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকায় ত্রিকোণমণ্ডল আছে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ এই তিন বর্ণ রহিয়াছে। তন্মিত্ত তিন দিকে সমুদয় মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই ত্রিকোণমণ্ডলকে যোনিপীঠ ও শক্তিমণ্ডল কহে। ঐ শক্তিমণ্ডলমধ্যে তেজোময় কামকলা-মূর্তি। মস্তকে তেজোময় একটি বিন্দু আছে। তাহার উপর দণ্ডাকার তেজোময় নাদ রহিয়াছে।

ঐ নাদোপরি নিধুম, অগ্নিশিখার আয় তেজঃপুঞ্জ আছে। ইহার উপরে হংসপক্ষীর শয্যাকার তেজোময় পীঠ। তদুপরি একটি শ্বেত হংস, এই হংসের শরীর জ্ঞানময়, দুই পক্ষ আগম ও নিগম। চরণ দুইটি শিবশক্তিময়, চকুপুট প্রণবস্বরূপ এবং নেত্র ও কণ্ঠ কামকলারূপ। এই হংসই গুরুদেবের পাদপীঠস্বরূপ।

ঐ হংসের উপর শ্বেতবর্ণ বাগ্‌ভববীজ (গুরুবীজ) ঐং আছে। তাহার পার্শ্বে তদ্বীজপ্রতিপাদ্য গুরুদেব আছেন। তাঁহার শ্বেত বর্ণ এবং কোটিসূর্য্যাংশতুল্য তেজঃপুঞ্জ। তাঁহার দুই হাত—এক হস্তে বর ও অস্ত্র হস্তে অভয় শোভা পাইতেছে। শ্বেত মালা ও শ্বেত গন্ধ ধারণ এবং শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া হাশ্রবদনে, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার বাম ক্রোড়ে রক্তবসনপরিধানা সর্ববসনভূষিতা তরুণ-অরুণসদৃশ রক্তবর্ণা গুরুপত্নী বিরাজিতা। তিনি বাম করে একটি পদ ধারণ ও দক্ষিণ করে শ্রীগুরুকলেবর বেষ্টন করিয়া উপবিষ্টা আছেন। শ্রীগুরু ও গুরুপত্নীর মস্তকোপরি সহস্রদলপদ্মটি ছত্রের আয় শোভা পাইতেছে।

এই সহস্রদলপদ্মে হংসপীঠের উপর গুরুপাদুকা এবং সকলেরই গুরু আছেন। ইনিই অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই পদ্মে উপরি-উক্ত প্রকারে স-পত্নী গুরুদেবের ধ্যান করিতে হয়। এই শতদলপদ্ম ধ্যান করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ ও দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

নবম—সহস্রার

ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর মহাশূণ্ডে রক্তকিঞ্জক শ্বেতবর্ণ সহস্রদলবিশিষ্ট নবম চক্র সহস্রার অবস্থিত। সহস্রদলপদ্মের চারি দিকে পঞ্চাশ দল বিরাজিত এবং উপর্যুপরি কুড়ি স্তরে সজ্জিত। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশ দলে পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণ আছে।

সহস্রদলকমল-কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রিকোণ চন্দ্রমণ্ডল আছে। তাহার অন্ত্র নাম শক্তিমণ্ডল। এই শক্তিমণ্ডলের তিন কোণে যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ, এই তিন বর্ণ আছে এবং তিন দিকে সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ঐ শক্তিমণ্ডলমধ্যে তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডলবিশেষ আছে, তদুপরি মধ্যাহ্নকালীন কোটিসূর্য্যস্বরূপ তেজঃপুঞ্জ একটি বিন্দু আছে; তাহা বিদ্যুৎ স্ফটিকসদৃশ শ্বেতবর্ণ। এই বিন্দুই পরমশিব নামে জগৎপত্তি-পালন-নাশকরণশীল পরমেশ্বর; ইনিই অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মা। ইঁহাকেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সাধনবলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলে।

পরমশিব ঐ বিন্দু সততগলিত সূর্য্যস্বরূপ। ইহার মধ্যে সমস্ত সূর্য্যর আধার গোমূত্রবর্ণা অম্মা নামক কলা আছে। ইনিই আনন্দ-ভৈরবী। ইঁহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার নির্বাণ কামকলা আছেন। এই নির্বাণ কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। তন্মধ্যে তেজোরূপ পরম নির্বাণশক্তি—তৎপরে নিরাকার মহাশূন্য।

এই সহস্রদলপদ্মে কল্পতরু আছে। তন্মূলে চতুর্দ্বারসংযুক্ত জ্যোতির্মন্দির; তাহার মধ্যে পঞ্চদশ অক্ষরাগ্নিকা বেদিকা। তদুপরি রত্ন-সিংহাসনে চণকাকার মহাকালী ও মহারুদ্র আছেন; তাহা মহা-জ্যোতির্ময়। ইঁহারই নাম চিন্তামণিগৃহে মায়াম্বাদিত পরমাত্মা।

এই সহস্রদলপদ্ম ধ্যান করিলে জগদীশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়।

এক্ষণে কামকলা-তত্ত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেব ভক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি ব্যতীত—

কামকলা-তত্ত্ব

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই সাধারণ পাঠকগণের নিকট সে গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই পুস্তকে কামকলা বলিয়া যে যে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে ত্রিকোণাকার ভাবিয়া লইবেন। প্রোক্ত নবচক্র ব্যতীত মনচক্র, সোমচক্র প্রভৃতি আরও অনেক গুপ্ত চক্র আছে এবং পূর্বোল্লিখিত নবচক্রের প্রত্যেক চক্রের নীচে একটা করিয়া প্রস্তুত উর্দ্ধমুখ চক্র আছে। বাহ্যলভয়ে এবং মূদ্রা-অভাবে গ্রন্থখানি অমুদ্রিত থাকিবে এই চিন্তায় সম্যক্ তত্ত্ব বিশদ বর্ণনা করিতে পারিলাম না। তবে যে পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল, তাহাই সাধকগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। প্রোক্ত নবচক্রে ধ্যানকালে সাধকগণের একটা—

বিশেষ কথা

জানা আবশ্যক। পদ্যগুলি সর্বতোমুখী, কিন্তু যাহারা ভোগী, অর্থাৎ ফল কামনা করেন, তাঁহারা পদ্যসমুদয় অধোমুখী চিন্তা করিবেন—আর যাহারা যোগী অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা উর্দ্ধমুখ চিন্তা করিবেন। এইরূপ ভাবভেদে উর্দ্ধ বা অধোমুখ চিন্তা করিবেন। আর পদ্যসমুদয় অতি সূক্ষ্ম—ভাবনা করা যায় না বলিয়া চতুরঙ্গুলি কল্পনা করিয়া চিন্তা করিতে হয়।

ষোড়শাধারং

পাদানুষ্ঠৌ চ গুলফৌ চ * * * ।

পায়ুমূলং তথা পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেটুকং ॥

নাভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কণ্ঠকূপস্তথৈব চ ।

তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূলং চাক্ষুশ্চ মণ্ডলে ।

অবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ মূর্দ্ধা চ মুনিপুঙ্গবে ॥

—যোগী বাজবল্লভ

প্রথম—দক্ষিণ পাদানুষ্ঠ, দ্বিতীয়—পাদগুলফ, তৃতীয়—গুহদেশ, চতুর্থ—লিঙ্গমূল, পঞ্চম—নাভিমণ্ডল, ষষ্ঠ—হৃদয়, সপ্তম—কণ্ঠকূপ, অষ্টম—জিহ্বাগ্র, নবম—দন্তাধার, দশম—তালুমূল, একাদশ—নাসাগ্র-ভাগ, দ্বাদশ—ক্রমধ্য, ত্রয়োদশ—নেত্রাধার, চতুর্দশ—ললাট, পঞ্চদশ—মূর্দ্ধা ও ষোড়শ—সহস্রার, এই ষোলটি আধার। ইহার এক এক স্থানে ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠানে লয়যোগ সাধন হয়। ক্রিয়া-কৌশল সাধন-কল্পে লিখিত হইল।

ত্রিঃ ক্ষ্যং

আদিলক্ষ্যঃ স্বয়ম্ভুশ্চ দ্বিতীয়ং বাণসংজ্ঞকম্ ।

ইতরং তৎপরে দেবি জ্যোতীরূপং সদা ভজ ॥

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই তিন লিঙ্গই ত্রিলক্ষ্য। এই লিঙ্গত্রয় যথাক্রমে মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রে অধিষ্ঠিত আছেন।

ব্যোমপঞ্চকং

আকাশন্ত মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপরম্ ।

তত্ত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ, এই পঞ্চব্যোম। পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চাকাশ বলে। এই পঞ্চাকাশের বাসস্থান শরীর-তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রহিত্রয়

ব্রহ্মগ্রহি, বিষ্ণুগ্রহি ও রুদ্রগ্রহি এই তিনটিকে গ্রহিত্রয় বলে। মণিপুরপদ্ম ব্রহ্মগ্রহি, অনাহতপদ্ম বিষ্ণুগ্রহি ও আজ্ঞাপদ্ম রুদ্রগ্রহি নামে অভিহিত।

শক্তিত্রয়

উর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ গুদঃ ।

মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনম্

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

কণ্ঠদেশে—বিশুদ্ধচক্রে উর্দ্ধশক্তি, গুহদেশে—মূলাধারচক্রে অধঃশক্তি ও নাভিদেশে—মণিপুরচক্রে মধ্যশক্তি বিরাজিতা আছেন। ইহাদিগকে নামান্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অথবা গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী বলে। এই শক্তিত্রয়ই প্রণবের জ্যোতিঃস্বরূপ। যথা—

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী ।

ত্রিধা শক্তি স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি

—মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪

মূলা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে তিন গুণে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন।

সর্বার্থসাধিনী, সর্বশক্তিপ্রদায়িনী, সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী শত্ৰুসীমন্তিনী শিবানীর শক্তিতে স্বধী সাধকগণের সাধন-সরণি স্নগমসাধনোদ্দেশে ও স্ববিধার্থে সর্বাত্রে সানন্দে সাধ্যমত সম্যক্ শরীর তত্ত্ব সূশৃঙ্খলে ও সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিয়া অধুনা—

যোগ-তত্ত্ব

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যোগ কাহাকে বলে?—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগই যোগ। তন্নির দেহকে দৃঢ় করণের নাম যোগ, মনকে স্থস্থির করণের নাম যোগ, চিত্তকে একতান করার নাম যোগ, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ করার নাম যোগ, নাদ ও বিন্দু একত্র করার নাম যোগ, প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করার নাম যোগ, সহস্রারস্থিত পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির সংযোগের নাম যোগ। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার যোগের কথা উক্ত হইয়াছে। যথা—সাংখ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজ-যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ, বিভূতিযোগ, প্রকৃতিপুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, মোক্ষযোগ ও রাজাধিরাজযোগ। ফলে ভাব-ব্যাপক

কৰ্মমাত্রকেই যোগ বলা যায়। এবশ্রকার বহুবিধ যোগ ঐ এক প্রকার যোগেরই অর্থাৎ জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার সম্মিলনেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। বস্তুতঃ যোগ একই প্রকার বই দুই প্রকার নহে, তবে ঐ একই প্রকার যোগসাধনের সোপানীভূত যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে, সেই সমস্তই স্থানবিশেষে—উপদেশবিশেষে এক একটি স্বতন্ত্র যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মূলতঃ জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার সংযোগ-সাধনই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার সংযোগ সাধিত হয়। তাহার সহজ উপায় বক্ষ্যমাণ যোগের প্রণালী। যোগের আটটি অঙ্গ আছে। যোগ-সাধনায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে—

যোগের আটটি অঙ্গ

সাধন করিতে হইবে। সাধন অর্থে অভ্যাস। যোগের আটটি অঙ্গ, যথা—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ

প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৪৫

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ। যোগসাধন করিতে হইলে অর্থাৎ পূর্ণ-মানুষ হইয়া স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই অষ্টযোগাঙ্গের সাধনা অর্থাৎ অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমতঃ—

যম

কাহাকে বলে এবং তাহার সাধন-প্রণালী জানা আবশ্যক।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩০

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এইগুলিকে যম বলে।

অহিংসা—

মনোবাক্কায়েঃ সৰ্ব্বভূতানামপীড়নং অহিংসা।

মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা, সৰ্ব্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করার নাম অহিংসা। যখন মনোমধ্যে হিংসার ছায়াপাত মাত্র না হইবে, তখনই অহিংসা সাধন হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৫

যখন হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অপরে তাঁহার নিকট আপন আপন স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ চিত্ত হিংসাক্ষুণ্ণ হইলে সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও তাঁহার হিংসা করিবে না।

সত্য,—

পরহিতার্থং বাঙ্মনসো যথার্থত্বং সত্যম্।

পরহিতের জন্ত বাক্য মনের যে যথার্থ ভাব, তাহাকে সত্য বলে। সরল চিত্তে অকপট বাক্য, যাহাতে দুঃখভিসন্ধির লেশমাত্র নাই, তাহাই সত্যভাষণ। সত্য স্বভাবগত হইলে আর মনে যখন মিথ্যার উদয় হইবে না, তখনই সত্যসাধন হইবে

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৬

অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন ক্রিয়া না করিয়াই তাহার ফল-
লাভ হইয়া থাকে । অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাক্য সিদ্ধ হয় ।

অস্তেয়—

পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোহস্তেয়ম্ ।

পরের দ্রব্য অপহরণ পরিত্যাগ করার নাম অস্তেয় । পরদ্রব্য-
গ্রহণের ইচ্ছা মাত্র যখন মনে উদ্ভিত হইবে না, তখনই অস্তেয় সাধন
হইবে ।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ. ৩৭

অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার নিকট সমস্ত রত্ন আপনা আপনি
আসিয়া থাকে । অর্থাৎ অস্তেয়প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনই ধন-রত্নের অভাব
হয় না ।

ব্রহ্মচর্য্য,—

বীৰ্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্ ।

শরীরস্থ বীৰ্য্যকে অবিকলিত ও অবিকৃত অবস্থায় ধারণ করার নাম
ব্রহ্মচর্য্য । শুক্রই ব্রহ্ম ; স্ততরাং সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় মৈথুন
বর্জন করিয়া বীৰ্য্যধারণ করা কর্তব্য । অষ্টবিধ মৈথুন পরিত্যাগ করিলে
ব্রহ্মচর্য্য-সাধন হইবে ।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্য্যলাভঃ ।

—সাধন-পাদ, পাতঞ্জল, ৩৮

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীৰ্য্যলাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।*

অপরিগ্রহ,—

দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারোহপরিগ্রহঃ।

দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধন পরিত্যাগ করার নাম অপরিগ্রহ। স্থূল কথা, লোভ পরিত্যাগ করাকেই অপরিগ্রহ বলা যায়। যখন ‘ইহা চাই, উহা চাই’ মনেই হইবে না, তখনই অপরিগ্রহ-সাধন হইবে।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথস্তাসংবোধঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩২

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

এই সমস্তগুলির সাধনা হইলে যমসাধনা হইল। প্রকৃত মনুশ্য লাভ করিতে হইলে সকল দেশের সর্বশ্রেণীর লোকদিগকেই এই যমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ইহা না করিলে মানুষ ও পশুতে কিছু প্রভেদ থাকে না। এখন—

নিয়ম

কাহাকে বলে ও তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, অবগত হইতে হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ?

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩২

* আমাদের “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” নামক গ্রন্থে এতদ্বিধর সম্যক প্রকাশিত হইয়াছে ও ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার উপায় বর্ণিত আছে।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্বা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার নাম নিয়ম। ইহাদিগের অভ্যাসের নাম নিয়মসাধন।

শৌচ,—

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাত্মন্তরন্তথা ।

মূৰ্ছলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং, মনঃশুদ্ধিস্তথাত্তরম্ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

শরীর ও মনের মালিষ্ঠ দূর করার নাম শৌচ। তাই বলিয়া সাবান, ফুলেলা বা এসেন্স প্রভৃতির বিলাসিতার বাহার নহে; গোময়, মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা শরীরের এবং দয়াদি সদগুণ দ্বারা মনের মালিষ্ঠ দূর করিতে হয়।

শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা পঠৈরসংসর্গঃ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪০

শুচি থাকায় নিজ দেহকে অশুচিবোধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং পরসঙ্গ করিতেও ঘৃণা জন্মায়। তখন অবদূত-গীতার এই মহান বাক্য মনে পড়ে, যথা—

বিষ্ঠাদিনরকং ঘোরং ভগং চ পরিনির্মিতম্ ।

কিমু পশ্যসি রে চিন্ত ! কথং তত্রৈব ধাবসি ?

সন্তোষ,—

যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদिति ।

যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণম্ ॥

প্রতিদিন যাহা কিছু লাভে মনে সন্তুষ্টরূপ বুদ্ধি থাকাকেই সন্তোষ কহে। স্থল কথায় দুঃস্বাদাক্ষা পরিত্যাগ করার নাম সন্তোষ।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীৰ্য্যলাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।*

অপরিগ্রহ,—

দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারোহপরিগ্রহঃ।

দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধন পরিত্যাগ করার নাম অপরিগ্রহ। স্থূল কথা, লোভ পরিত্যাগ করাকেই অপরিগ্রহ বলা যায়। যখন ‘ইহা চাই, উহা চাই’ মনেই হইবে না, তখনই অপরিগ্রহ-সাধন হইবে।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথস্তাসংবোধঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩২

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইবে।

এই সমস্তগুলির সাধনা হইলে যমসাধনা হইল। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে সকল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগকেই এই যমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ইহা না করিলে মাহুষ ও পশুতে কিছু প্রভেদ থাকে না। এখন—

নিয়ম

কাহাকে বলে ও তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, অবগত হইতে হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ?

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩২

* আমাদের “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” নামক গ্রন্থে এতদ্বিধর সম্যক প্রকাশিত হইয়াছে ও ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার উপায় বর্ণিত আছে।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্বা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রতিপাদন—এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার নাম নিয়ম। ইহাদিগের অভ্যাসের নাম নিয়মসাধন।

শৌচ,—

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাত্ম্যন্তরন্তথা ।

মূচ্ছলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং, মনঃশুদ্ধিস্তথাস্তরম্ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

শরীর ও মনের মালিন্য দূর করার নাম শৌচ। তাই বলিয়া সাবান, ফুলেলা বা এসেন্স প্রভৃতির বিলাসিতার বাহার নহে; গোময়, মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা শরীরের এবং দয়াদি সদগুণ দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিতে হয়।

শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪০

শুচি থাকায় নিজ দেহকে অশুচিবোধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং পরসঙ্গ করিতেও ঘৃণা জন্মায়। তখন অবদূত-গীতার এই মহান বাক্য মনে পড়ে, যথা—

বিষ্ঠাদিনরকং ঘোরং ভগং চ পরিনির্মিতম্ ।

কিমু পশ্যসি রে চিন্ত ! কথং তত্রৈব ধাবসি ?

সন্তোষ,—

যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি ।

যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণম্ ॥

প্রতিদিন যাহা কিছু লাভে মনে সন্তুষ্টিরূপ বুদ্ধি থাকাকেই সন্তোষ কহে। স্থল কথায় দুঃস্বাদাক্ষণ্য পরিত্যাগ করার নাম সন্তোষ।

সন্তোষাদনুত্তম-সুখলাভঃ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪২

সন্তোষ সিদ্ধ হইলে অনুত্তম সুখলাভ হয়। সে সুখ অনির্বচনীয়, বিষয়-নিরপেক্ষ সুখ অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত এই সুখের কোন সম্বন্ধ নাই।

তপস্তা,—

বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্ৰচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ।

শরীরশোষণং প্রাহস্তপস্তাং তপ উত্তমম্ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

বেদবিধানানুসারে কৃচ্ছ্ৰচান্দ্রায়ণাদি ত্রতোপবাস দ্বারা শরীর শুষ্ক করাকে উত্তম তপস্তা বলে। তপস্তা না করিলে যোগসিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে না। যথা—

নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি ।

তপস্তা সাধন করিলে অগ্নিমাди ঐশ্বর্য লাভ হয়। যথা—

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্রিয়ান্তপসঃ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৩

তপস্তা দ্বারা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ দেহশুদ্ধি হইলে ইচ্ছানুসারে দেহকে সূক্ষ্ম বা স্থূল করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইলে সূক্ষ্ম দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শ ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়সকল গ্রহণে শক্তি জন্মে।

স্বাধ্যায়,—

স্বাধ্যায়ঃ প্রণবশ্রীকৃষ্ণপুরুষসূক্তাদিমন্ত্রাণাং পঃ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নঞ্চ ।

প্রণব ও সূক্তমন্ত্রাদি অর্থচিন্তাপূর্বক জপ এবং বেদ ও ভক্তি-শাস্ত্রাদি ভক্তিপূর্বক অধ্যয়ন করাকে স্বাধ্যায় বলে।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৪

স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরপ্রণিধান,—

ঈশ্বরপ্রণিধানাং।

—পাতঞ্জল-দর্শন

ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাং।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৫

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা যোগের চরম ফল সমাধি-সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা যত শীঘ্র চিন্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, অল্প প্রকারে তত শীঘ্র কখনই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। কেননা তাঁহার চিন্তায় তাঁহার ভাস্বর জ্যোতিঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া সমস্ত মনরাশি বিদূরিত করিয়া দেয়। এক্ষণে যোগের তৃতীয়ান্ধ—

আসন

কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা জানিতে হইবে।

স্থিরসুখমাসনম্।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৬

শরীর না নড়ে, না টলে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ না জন্মে, এইরূপ ভাবে স্থখে উপবেশন করার নাম আসন। যোগশাস্ত্রে বহু প্রকার আসনের কথা উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি আসন ও সাধন-কৌশল “সাধনকল্পে” প্রদর্শিত হইল।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৮

আসন অভ্যাস দ্বারা সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসকল যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে পারে না। আসন অভ্যাস হইলে যোগের শ্রেষ্ঠ ও গুরুতর বিষয় চতুর্থাঙ্গ—

প্রাণায়াম

অভ্যাস করিতে হয়। আগে দেখা যাউক, প্রাণায়াম কাহাকে বলে।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৯

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিধৃত করার নাম প্রাণায়াম। তন্নিম্ন প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলে। যথা—

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।

প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুস্তকৈঃ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।২

প্রাণায়াম বলিলে আমরা সাধারণতঃ রেচক, পূরক ও কুস্তক এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই বুঝিয়া থাকি। বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া অভ্যন্তর

অংশ পূরণ করাকে পূরক, জলপূর্ণ কুন্ডের জ্বায় অভ্যন্তরে বায়ু ধারণ করাকে কুন্তক এবং ঐ ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করাকে রেচক বলে। প্রথমে হস্তের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ু রোধ করিয়া প্রণব (ওঁ) অথবা আপন আপন ইষ্টমন্ত্র ঘোড়শ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করিয়া, বায়ু রোধ করতঃ ওঁ বা মূলমন্ত্র চৌষটিবার জপ করিতে করিতে কুন্তক করিবেন; তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ নাসাপুট হইতে তুলিয়া লইয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু রেচন করিবেন; এই ভাবে পুনরায় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই ওঁ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক এবং উভয় নাসাপুট ধরিয়া কুন্তক, শেষে বাম নাসায় রেচন করিবেন। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বারের জ্বায় নাসাধারণক্রমানুসারে পূরক, কুন্তক ও রেচক করিবেন। বাম হস্তের কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবেন।

প্রথম প্রথম প্রাপ্ত সঙ্খ্যায় প্রাণায়াম করিতে অসমর্থ হইলে, ৮৩২১৬ অথবা ৪১৬৮ বার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবেন। অল্প ধর্মাবলম্বিগণ বা ঘাহাদের মন্ত্রজপের সুবিধা নাই, তাঁহারা ১১২ এইরূপ সংখ্যার দ্বারাই প্রাণায়াম করিবেন, নতুবা ফল হইবে না। কেননা তালে তালে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর সাবধান! যেন সবেগে রেচক বা পূরক না হয়। রেচকের সময় বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হওয়া কর্তব্য। এরূপ অল্প বেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যে হস্তস্থিত শক্তু যেন নিঃশ্বাসবেগে উড়িয়া না যায়। প্রাণায়াম-কালীন স্থাসনে উপবেশন করিয়া মেরুদণ্ড, স্বাভাৱ ও মস্তক সোজা ভাবে রাখিতে হয় এবং জ্বর মাঝারে দৃষ্টি

রাখিতে হয়। ইহাকে সহিত-কুস্তক বলে। যোগশাস্ত্রে অষ্টপ্রকার কুস্তকের কথা উল্লেখ আছে। যথা—

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা ।

ভজ্রিকা ভ্রামরী মূর্ছা কেবলী চাষ্টকুস্তিকা ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১৯৫

সহিত, সূর্য্যভেদ; উজ্জায়ী, শীতলী, ভজ্রিকা, ভ্রামরী, মূর্ছা ও কেবলী এই আট প্রকার কুস্তক।* ইহাদের বিশেষ বিবরণ মুখে বলিয়া কৌশল দেখাইয়া না দিলে সাধারণের কোন উপকার দর্শিবে না, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। বিশেষতঃ তৎকার অভাব; তৎকা থাকিলে শঙ্কা ছিল না, ডঙ্কা মারিয়া এ-লঙ্কা সে-লঙ্কা লিখিতে পারিতাম।

ততঃ ক্রীয়তে প্রকাশাবরণম্।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৫২

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে মোহরূপ আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়; প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি সর্বরোগমুক্ত হইবেন, কিন্তু অহুষ্ঠানের ব্যতিক্রমে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। যথা—

প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ ।

অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্বরোগসমুদ্ভবঃ ॥

হিকা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাঙ্ঘ্রিবেদনা ।

ভবন্তি বিবিধা দোষাঃ পবনশ্চ ব্যতিক্রমাৎ ॥

—সিদ্ধিযোগ

* মৎপ্রণীত “জ্ঞানীশ্বর” গ্রন্থে উক্ত অষ্ট-প্রকার প্রাণায়ামের সাধন-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে।

নিয়মমত প্রাণায়াম করিলে সর্বরোগ ক্ষয় হয় ; কিন্তু অনিয়মে বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিকা, শ্বাস কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মস্তকের পীড়াদি নানা রোগ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ।

প্রাণায়াম রীতিমত অভ্যাস হইলে যোগের পঞ্চমাঙ্গ—

প্রত্যাহার

সাধন করিতে হয় ! প্রাণায়াম অপেক্ষা প্রত্যাহার আরও কঠিন ব্যাপার । যথা—

স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিন্তস্ত স্বরূপানুকর

ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ।

—পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৫৪

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতাবস্থায় চিন্তের অনুগত হইয়া থাকার নাম প্রত্যাহার । ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হইয়া থাকে, সেই বিষয় হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করাকে প্রত্যাহার বলে ।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ।

পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৫৫

প্রত্যাহার-সাধনায় ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় । প্রত্যাহারপরায়ণ যোগী প্রকৃতিকে চিন্তের বশে আনয়ন করিয়া পরম ধৈর্য লাভ করিবেন, ইহাতেই বহিঃপ্রকৃতি বশীভূত হইবেন । প্রত্যাহারের পরে যোগের ষষ্ঠাঙ্গ—

ধারণা

সাধনা করিতে হয় । ধারণা কহাকে বলে ?

দেশবন্ধুশিচিন্তা ধারণা ।

—পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ১

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ষোড়শাধারে কিছা কোন দেব-দেবীর প্রতিমূর্তিতে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা ।

বিষয়ান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যে কোন একটি বস্তুতে চিত্তকে আরোপণ করতঃ বাঁধিবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ চিত্ত একমুখী হইবে । ধারণা স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাই—

ধ্যান

নামক যোগের সপ্তমাস্ত্রে পরিণত হইবে । যথা—

তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্ ।

—পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ২

ধারণা দ্বারা ধারণীয় পদার্থে চিত্তের যে একাগ্রতা ভাব জন্মে, তাহার নাম ধ্যান । চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তা করাকে ধ্যান বলে । সপ্তগ ও নিগুণ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার ।

পরমব্রহ্মের কিছা সহস্রারস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করার নাম নিগুণ ধ্যান ।

সূর্য্য, গণপতি, বিষ্ণু, শিব ও আত্মপ্রকৃতি কিছা ঘটচক্রস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ধ্যান করার নাম সপ্তগ ধ্যান ।

সপ্তগ ও নিগুণ ধ্যান ভিন্ন জ্যোতির্ধ্যান অনেকে করিয়া থাকেন । ধ্যানের পরিপক্বাবস্থাই—

সমাধি ।

ধ্যান গাঢ় হইলে, ধ্যেয়বস্তু ও আমি—একরূপ জ্ঞান থাকে না ।
চিত্ত তখন ধ্যেয় বস্তুতেই বিনিবেশিত ; স্থূল কথায় তাহাতে লীন ।
সেই লয় অবস্থাকেই সমাধি বলে ।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ।

—পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ৩

কেবল সেই পদার্থ (স্বরূপ আত্মা) আছেন, এইরূপ আভাস
জ্ঞান মাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, চিত্তের ধ্যেয় বস্তুতে
এইরূপ যে তন্ময়তা, তাহার নাম সমাধি । জীবাত্মা-পরমাত্মার
সমতাবস্থাকে সমাধি বলে

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাঅনোঃ ।

—দত্তাত্রেয়-সংহিতা

বেদান্তমতে সমাধি দুই প্রকার । যথা—সবিকল্প ও নির্বিকল্প ।
জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বিতীয়
ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি ।
পাতঞ্জল দর্শনে ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে উক্ত আছে ।

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব
ইহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম
নির্বিকল্প সমাধি । পাতঞ্জলমতে ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ।

এই বক্ষ্যমাণ অষ্টাঙ্গযোগের প্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট । পর পর এই
অষ্টাঙ্গযোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মরজগতে অমরত্ব

লাভ হয়। অধিক কি, কোন প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া ইহার যম-নিয়ম পালনেই প্রকৃত মনুষ্ঠান জন্মে। অষ্টাঙ্গ সাধন করিলে আর চাই কি? মানবজন্ম-ধারণ সার্থক! কিন্তু ইহা যেমন সর্বোৎকৃষ্ট, তেমনি কঠিন ও গুরুতর ব্যাপার। সকলের সাধ্যাত্ত নহে। তাই সিদ্ধযোগিগণ এই মূল অষ্টাঙ্গযোগ হইতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সহজ স্মৃতিসাধ্য যোগের কৌশল বাহির করিয়াছেন; আমি সেই কারণে প্রাপ্ত অষ্টাঙ্গযোগের বিশেষ বিবরণ বিশদ ভাবে ব্যক্ত না করিয়া এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে সারিলাম।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহারাও তিনজনে যোগ-সাধন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে পরমযোগী সদাশিবের পঞ্চম আশ্রয়ে দশবিধ যোগের কথা আছে। তন্মধ্যে—

চারি প্রকার যোগ

প্রধানতঃ প্রচলিত। যথা—

মন্ত্রযোগা হঠশৈব লয়যোগস্তুতীয়কঃ।

চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ ॥

— শিবসংহিতা, ৫।১৭

মন্ত্রযোগ, হঠযোগ লয়যোগ ও রাজযোগ এই চারিপ্রকার যোগ যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন—

মন্ত্রযোগ

সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ এক প্রকার অসম্ভব।

মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ

মন্ত্রজপ করিতে করিতে যে মনোলায় হয়, তাহার নাম মন্ত্রযোগ । মন্ত্রজপ-রহস্য ও জপসমর্পণ ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ সিদ্ধ হয় না । বিশেষতঃ উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব । গুরু বা উপদেশের অভাব না হইলেও বল্জন্ম না খাটিলে মন্ত্রযোগ সিদ্ধি হয় না । এজন্য সর্বপ্রকার সাধনের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথা—

মন্ত্রযোগশ্চ যঃ প্রোক্তো যোগানামধমঃ স্মৃতঃ ।

অল্পবুদ্ধিরিমাং যোগং সেবতে সাধকামধমঃ ॥

—দত্তাত্রেয়সংহিতা

যোগসমূহের মধ্যে মন্ত্রযোগ অতি অধম ; অধম অধিকারী এবং অল্পবুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্ত্রযোগ সাধন করিয়া থাকেন । দ্বিতীয়—

হঠযোগ

সাধন আজকাল একরূপ সাধ্যাতীত । হঠযোগের লক্ষণে উক্ত আছে ;—

হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যার্চকারশ্চন্দ্র উচ্যতে ।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌর্যোগাঙ্কঠযোগো নিগচ্ছতে ॥

—সিদ্ধ-সিদ্ধান্তপদ্ধতি

হ শব্দে সূর্য্য এবং ঠ শব্দে চন্দ্র, হঠ শব্দে চন্দ্র-সূর্য্যের একত্রে সংযোগ । অপান-বায়ুর নাম চন্দ্র এবং প্রাণ-বায়ুর নাম সূর্য্য ; অতএব প্রাণ ও অপান বায়ুর একত্র সংযোগের নাম হঠযোগ । হঠযোগাদি সাধনের উপযুক্ত অবস্থা ও শরীর বান্ধালীর অতি কম । আর—

রাজযোগ

দৈতভাববর্জিত হইলেও সংসারী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ রাজযোগের ক্রিয়াদি মুখে বলিয়া বুঝাইয়া

না দিলে পুস্তক পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব। এই জন্ত স্বল্পজীবী নিরন্ন কলির মানবগণের জন্ত সহজ ও সুখসাধ্য—

লয়যোগ

নির্দিষ্ট হইয়াছে। অত্যাশ্রয় যোগ ব্যতীত লয়যোগের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকেই সহজে ও শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। আমিও সেই সত্ত্বপ্রত্যক্ষফলপ্রদ লয়যোগ সাধারণে প্রকাশ মানসে এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি।

লয়যোগ অনন্ত প্রকার। বাহ্যভ্যন্তরভেদে যত প্রকার পদার্থের সম্ভব হইতে পারে, তৎসমস্তই লয়যোগ সাধনা হইতে পারে। অর্থাৎ চিন্তকে যে কোন পদার্থের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে একতান হইতে পারিলেই লয়যোগ সিদ্ধ হয়।

সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলয়বিধানানি বসন্তি লোকে।

—যোগভারাবলী

জগতে সদাশিব-কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লয়যোগ বিद्यমান আছে, কিন্তু সাধারণতঃ যোগিগণ চারি প্রকার লয়যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। চারি প্রকার লয়যোগ, যথা—

শান্তব্য্য চৈব ভ্রামর্য্য খেচর্য্য যোনিমুদ্রয়া।

ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্বিধা ॥

—ঘেরঙসংহিতা

শান্তবীমুদ্রা দ্বারা ধ্যান, খেচরীমুদ্রা দ্বারা রসানন্দ, ভ্রামরী কুস্তক দ্বারা নাদশ্রবণ ও যোনিমুদ্রা দ্বারা আনন্দভোগ, এই চারি প্রকার উপায় দ্বারাই লয়যোগ সিদ্ধি হয়।

এই চারি প্রকার লয়যোগের আরও সহজ কৌশল সিদ্ধযোগিগণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধান; আত্মজ্যোতিঃ দর্শন ও কুণ্ডলিনী উত্থাপন—এই তিন প্রকার প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও সুখসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত করেন। ইহার মধ্যে কুণ্ডলিনী উত্থাপন কিছু কঠিন কার্য। ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন পূর্বক মূলাধার সঙ্কোচ করিয়া জাগরিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপন করিতে হয়। চিনে জ্যোঁক যেমন একটি তৃণ হইতে অপর একটি তৃণ অবলম্বন করে, তদ্রূপ কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে সহস্রারে লইয়া পরমশিবের সহিত সংযোগ করাইতে হয়। কিন্তু কিরূপে মূলাধার সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং কিরূপেই বা অতীব কঠিন গ্রন্থিত্রয় ভেদ করিতে হইবে, তাহা হাতে হাতে দেখাইয়া না দিলে; লিখিয়া বুঝাইবার মত ভাষা নাই। স্তত্রাং অকারণ কুণ্ডলিনী-উত্থাপন ক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যদি কাহারও তাহার ক্রম জানিবার ইচ্ছা হয়, আমার নিকট আসিলে সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।* কিন্তু অল্পযুক্ত ব্যক্তির নিকট কদাচ প্রকাশ করিব না।

লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতিঃ দর্শন ক্রিয়া অতি সহজ ও সুখসাধ্য। এই দুই ক্রিয়ার সাধনকৌশল প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের উপকার সাধনই এই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

সাধু-সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থগণের মধ্যে পশ্চাত্ত্বত সঙ্কেত অতি অল্প লোকেও জানেন কিনা সন্দেহ। নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতির্দর্শন এই দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে এক একটীর দুই তিন প্রকার কৌশল লিখিত হইল। যেটি যাহার মনোমত ও সহজ বলিয়া বোধ হইবে, সেইটি

* মৎপ্রণীত “জ্ঞানীশ্বর” গ্রন্থে কুণ্ডলিনী উত্থাপনের সাধনোপায় বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সচঃ প্রত্যক্ষফলপ্রদ ও বাহ্যতে আমি ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই “সাধন-কল্পে” বর্ণিত হইল। ইহার যে কোন একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ মনে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেন, আত্মারও মুক্তি হইবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের লোকের যে অবস্থা, তাহাতে প্রাপ্ত ক্রিয়ার অভ্যাসও অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে সন্দেহ নাই; সেইজন্য তাঁহাদের জন্য সাধন-কল্পের প্রথমেই লয়-সঙ্কেত লিখিলাম। যে কয়টি লয়-সঙ্কেত লিখিত হইল, তাহার মধ্যে যে-কোন এক প্রকার অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত লয় হয়। সাধকগণের মধ্যে ঘাঁহার যেরূপ সুবিধা হইবে, তিনি সেইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া মনোলায় করিবেন।

জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ।

জপ অপেক্ষা ধ্যানে শতগুণ অধিক ফল। ধ্যানাপেক্ষা শতগুণ অধিক লয়যোগে। অতএব জপাদি অপেক্ষা সকলেরই কোন প্রকার লয়যোগ সাধন কর্তব্য।

যোগাভ্যাসে আত্মার মুক্তি ব্যতীত অনেক আশ্চর্য্য ও অমানুষীয় ক্ষমতা লাভ হয়। কিন্তু বিভূতिलाভ যোগ-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, সেইজন্য আমিও এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা করিলাম না। বিনা চেষ্টায় বিভূতি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তৎপ্রতি অক্ষিপ না করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। বিভূতিতে মুগ্ধ হইলে মুক্তির আশা সুদূরপর্য্যন্ত।

আজি ইউরোপখণ্ডে এই যোগ-সাধনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে। পাশ্চাত্য নর-নারীগণ আধ্যাত্মোক্ত যোগ-যোগাঙ্গ শিক্ষা করিয়া থিয়সফিষ্ট নাম ধারণ করিতেছেন। মেস্‌মেরিজম, হিপ্পনোটিজম, ক্লেয়ারভয়েন্স, সাইকোপ্যাথি ও মেটাল্ টেলিগ্রাফী

প্রভৃতি বিদ্যা শিখিয়া জগতের নর-নারীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া দিতেছেন। আমরা আমাদের ঘরের পুঁথি রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করত ঘরে তুলিয়া ইন্দুর, আরঙলা ও কীটাদির আহাৰ-বিহারের সুবন্দোবস্ত ও “আমাদের অনেক আছে” বলিয়া গৌরব করিতেছি। কিন্তু কি আছে, তাহার অনুসন্ধান করি না বা সাধন করিয়া খাটাইয়া দেখি না। দোষ নিতান্ত আমাদের নহে। শাস্ত্রে যোগ-যোগাঙ্গের যে সকল বিষয় ও নিয়ম উক্ত আছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও জটিল। কেহ জানিলেও তাহা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহা অতি—

গুহ্যবিষয়

যোগ জটিল বা গুহ্যবিষয় নহে। টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ, আকাশের চন্দ্র বা সূর্য-গ্রহণ পরিদর্শন, ফনোগ্রাফে সঙ্গীত শ্রবণ যেমন বাহ-বিজ্ঞানের কাজ—যোগও সেইরূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কাজ। তবে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া প্রকাশ করেন না কেন? শাস্ত্রের নিষেধ আছে, যথা—

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।

ইয়ন্ত শাস্তবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রসকল প্রকাশ্য সামান্য বেষ্টার গ্রন্থ; কিন্তু শিবোক্ত শাস্তবী বিদ্যা কুলবধূতুল্য। অতএব যত্নপূর্বক ইহা গোপন রাখিবে—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই।

ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোহপ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।

—শিববাক্যম্

পরশিষ্ট, বিশেষতঃ অভক্ত জনের নিকট এই শাস্ত্র কদাচ প্রকাশ করিবে না। আরও কথিত আছে যে—

ইদং যোগরহস্যঞ্চ ন বাচ্যং মূর্খসন্নিধৌ।

—যোগস্বরোদয়

যোগরহস্য মূর্খসন্নিধানে বলিবে না। নিম্নুক, বঞ্চক, ধূর্ত, খল, দুহুতাচারী ও তামসিক ব্যক্তিগণের নিকট যোগরহস্য প্রকাশ করিতে নাই।

অভক্তে বঞ্চকে ধূর্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।

মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগুহ্যং কদাচন ॥

ভক্তিহীন, বঞ্চক, ধূর্ত, পাষণ্ড ও নাস্তিক, এই সকল হেতুবাদীকে গুরুকথিত গুহ্যবিষয় কখনও বলিবে না। এই সকল কারণে শাস্ত্রজ্ঞ যোগিগণ সাধারণের নিকট আত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া “গুহ্যবিষয়” বলিয়া গোপন করেন। কাহাকেও শিক্ষা দিবার পূর্বে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ নিষেধ থাকায় সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য এবং সকলের করণীয়, তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম। এতদনুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। এখন স্ত্রী সাধকগণ—

স্তুত্বো মেহপরাধঃ।

ওঁ শান্তিঃ

যোগীপুরু

দ্বিতীয় অংশ—সাধনকল্প

সাধকগণের প্রতি উপদেশ

ছুর্গাদেবি জগন্মাতর্জগদানন্দদায়িনি ।

মহিষাসুরসংহত্তি প্রণমামি নিরন্তরম্ ॥

মদন-মদ-দমন-মনোমোহিনী মহিষাসুরমর্দিনী ভবানীর মৃত্যুপতি-
লাঙ্ঘিত মরামরবাঙ্ঘিত পদপঙ্কজে প্রণতিপুরঃসর সাধনকল্প আরম্ভ
করিলাম ।

যোগাভ্যাসকালে সাধকগণকে কতগুলি নিয়ম-সংযমের অধীন
হইতে হয় । সাধারণ মানুষের মত চলিলে হয় না । যোগকল্পে
অষ্টাঙ্গযোগ-বর্ণনাকালে যম ও নিয়মে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে ।
কিন্তু গৃহ-সংসারে সে নিয়ম পালন করা যায় না । পারিলেও গুণধর
গ্রামবাসীর গুণে অচিরেই সর্বস্বান্ত হইয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে

হইবে। স্তূতরাং ঘরকন্না করিতে হইলে, শিবস্ত্র ছাড়িয়া বাহ্যে ঘোল-আনা জীবন্ত বজায় না রাখিলে চলে না। একরূপ অবস্থায় উপায় কি? ফোঁস্ ফোঁস্ কর, কামড়াইও না।

একটা রাস্তার পার্শ্বে একটা কুলাপানা চক্রধারী ভীষণ কেউটে সর্প বাস করিত। রাস্তা দিয়া লোক যাইতে দেখিলেই গর্জ্জন করিতে করিতে সববেগে ধাবিত হইয়া দংশন করিত। বাহাকে দংশন করিত সে সেইখানেই পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। ক্রমশঃ সর্পের কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইল। কেহ সে রাস্তা দিয়া ভয়ে গমন করিত না। এইরূপে সেই রাস্তায় লোক-যাতায়াত বন্ধ হইল।

একদিন একটা মহাপুরুষ ঐ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন; তাঁহাকে সর্পের কথা জানাইয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে অনেকে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। সর্পের নিকটস্থ হইবামাত্র সর্প গর্জ্জন করিতে করিতে দংশনমানসে ধাবিত হইল। মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন, সর্প নিকটে আসিলে এক মুষ্টি ধূলা তদীয় গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র সর্প শির নত করিয়া শান্তভাবে ধারণ করিল। তখন মহাপুরুষ জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “বেটা! পূর্বজন্মে এই হিংসার কারণে সর্পঘোনি প্রাপ্ত হইয়াছিস, তবুও হিংসা পরিত্যাগ করিতে পারিলি না?”

এই বাক্যে সর্পের দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল; সে নম্রভাবে বলিল, “প্রভো! আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইয়াছে, এখন উদ্ধারের উপায় কি?”

“সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ কর” এই বলিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি সর্প শান্তভাবে ধারণ করিল। দুই

একজন করিয়া সকলেই এ কথা জানিল। প্রথমতঃ ভয়ে ভয়ে সাবধানের সহিত লোকজন চলিতে লাগিল; বাস্তবিক সাপ আর কাহারও হিংসা করে না—পথে পড়িয়াই থাকে, পার্শ্ব দিয়া কেহ গমন করিলেও মাথা তুলিয়া দেখে না। সকলেরই সাহস হইল। তখন কেহ গ্রহণ করে, কেহ লাঠি দ্বারা দূরে ফেলিয়া দিয়া যায়। বালক-বালিকাগণ লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেড়ায়। তথাপি সর্প আর কাহাকেও হিংসা করে না। কিন্তু লোকের এইরূপ অত্যাচারে সে ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে পূর্বোক্ত মহাপুরুষ ফিরিলেন, সর্পকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এরূপ অবস্থা কেন?” সর্প উত্তর করিল, “আপনার উপদেশে হিংসা ছাড়িয়া এ দশা ঘটয়াছে।”

মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, “আমি তোকে হিংসা পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু গর্জন করিতে নিষেধ করি নাই। তোমার প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে সর্পের স্বভাবানুযায়ী ফোঁস ফোঁস করিও, কিন্তু কামড়াইও না।”

মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি নিকটে লোক দেখিলে পূর্ব্বে ধারণ করিত, কিন্তু কাহাকেও দংশন করিত না। পুনরায় পূর্ব্বে তেজ দর্শন করিয়া কেহ আর তাহার নিকটে ঘেষিত না।

আমিও তাই বলিতেছি, বাহিরে ষোল-আনা জীবন্ত বজায় রাখ। কিন্তু মনে যেন ঠিক থাকে, কাহারও অনিষ্ট করিব না। মন পবিত্র থাকিলে বাহিরের কার্যে কিছু যাইবে আসিবে না।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।

মনশ্চ তন্মনা ভূষা ন পুণ্যৈ নৃচ পাতকৈঃ ॥

—জ্ঞানসন্ধিনি-তন্ত্র ৪৫

অতএব মনকে দৃঢ় করিয়া সকল কার্য করা উচিত। যেন মনে থাকে, কেহ আমাকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলে, কেহ আমার কোন দ্রব্য চুরি করিলে, কেহ ছুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আমার যেমন কষ্ট হয়, কাহারও প্রতি আমার দ্বারা ঐ সকল কার্য অল্পকষ্টে হইলে সে ব্যক্তিও এইরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। নিজ হৃদয়ের বেদনা অল্পভব করিয়া পরের প্রতি ব্যবহার করিবে। যখন গণিতপত্র এবং বস্তুজাত কটু-কষায় কন্দমূলফল খাইয়াও মানুষ জীবিত থাকে, তখন পরের প্রাণে কষ্ট দিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া আহার-চেষ্টা কেন? প্রতিদিন বা' কিছু উপায়ে সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য। ধনীর সঙ্গে অবস্থা তুলনা করিতে গিয়া কষ্ট পাই কেন? ছুরাকাজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না। নির্ধন ব্যক্তি অনাহারীর কথা ভাবিয়া দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত থাকিবে, নিরাশ্রয় লোক দেখিয়া ভয় কুটীরে ছিন্ন মাছুরীতে শান্তিলাভ করিবে, শীতকালে জুতা সংগ্রহে অক্ষম হইলে আপনাকে ধিক্কার না দিয়া খঞ্জ ব্যক্তিকে স্মরণ করতঃ স্বীয় সবল পদের দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক নিজেকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবে। পুত্রহীন ব্যক্তি অসং পুত্রের পিতার দুর্দশা মনে করিয়া সুখী হইবে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমস্তই জীবের মঙ্গলের জ্ঞাত করিয়া থাকেন। পুত্র-নিধনে শোকে মুহমান না হইয়া গৃহ-দগ্ধ হইলে জ্ঞানশূন্য না হইয়া, বিষয়বিচ্যুত হইলে কাতরতা প্রকাশ না করিয়া ভাবা উচিত—ঐ পুত্র জীবিত থাকিলে হয়ত তাহার অসদ্ব্যবহারে আজীবন মর্শ্বপীড়া পাইতে হইত; গৃহ থাকিলে হয়ত গৃহস্থিত সর্পদংশনে জীবন ত্যাগ করিতে হইত; বিষয় থাকিলে হয়ত ঐ বিষয়লোভে কেহ হত্যা করিত; যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, তাহাতেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করা

কর্তব্য। ক’দিনের জন্ত ভবের বৈভব? যখন শৈশবের বিমল
জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায়, যৌবনের বল-বিক্রম
জোয়ারের জল, প্রৌঢ়াবস্থা তিন দিনের খেলা—সংসার পাতিতে না
পাতিতে ফুরাইয়া যায়, “এ পর্য্যন্ত উচিত অবস্থায় জীবন কাটান হয়
নাই,” “এর মনে কষ্ট দিয়াছি,” “তার সহিত এক্রূপ করা ভাল হয়
নাই,” যখন এই আক্ষেপ করিতে করিতে বার্কিক্য কাটিয়া যায়, তখন
হু’দিনের জন্ত আসক্তি কেন? অত্নের প্রতি বলপ্রকাশ কেন?
হুর্বলের প্রতি অত্যাচার করা কেন? পরনিন্দায় এত ক্ষুণ্ণি কেন?
পার্থিব পদার্থের জন্ত অনুশোচনা কেন? কিন্তু কি বলিতেছিলাম,
ভুলিয়া গেলাম।

হাঁ, মনে ভিন্ন বাহিরের কার্য দেখিয়া সদস্য ধার্য করা যায় না;
একজন বিপুল সমারোহে দোল-দুর্গোৎসব করিতেছে, কান্দাল-
গরীবকে ভোজন করাইতেছে; কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কারের সঞ্চার
হইলেই সব মাটি—নরকের দ্বার উদঘাটিত হইবে। একই কার্য
মনের বিভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে। সর্ব-
শ্রেণীর লোকই গাত্র মার্জনা করিয়া থাকে। কিন্তু অনন্ত-চিত্ত
কলুষিত নর-নারীগণ গাত্র-মার্জনা কালে নিজ দেহের প্রতি দৃষ্টি-পূর্বক
“কষিতকাঞ্চন বর্ণ দেখিয়া নর-নারীগণ মুগ্ধ হইবে, কত জনই আমার
মিলন কামনা করিবে” এই ভাবিয়া সমধিক পাট করিতেছে। তাহার
ফলে নরকের পথ পরিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। সংজ্ঞানসম্পন্ন
ব্যক্তিগণ দেহকে ভগবানের ভোগমন্দির ভাবিয়া পরিষ্কার করতঃ
হরিমন্দির-মার্জনের ফল লাভ করিতেছে। আর বিবেকিগণের দেহ
মার্জনা করিতে করিতে দেহের উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে।
নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ, রক্ত ক্লেদ মলমূত্র ফেনাদি দ্বারা দুর্গন্ধীকৃত;

ইহাকে সর্বদা পরিষ্কার না করিলে যখন ইহা অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তখন ইহার প্রতি এত আসক্তি কেন? তাহা হইলে আর রমণীর কবিকল্পনা-সম্ভূত স্বর্ণকান্তি, আকর্ণবিশ্রান্ত পটলচেরা নয়ন, রক্তাভ গণ্ড, তরুণ-অরুণ-ভাতি অধরোষ্ঠ ও ক্ষীণ কটির প্রতি চিত্ত ধাবিত হইবে না।

অথবা ধর্মাধর্ম কার্য বলিয়া কিছুই নির্দিষ্ট নাই। এক অবস্থায় বাহ্য পাপজনক, অবস্থান্তরে তাহাই পুণ্যজনক। পুরাণে কথিত আছে,—“বলাক নামক ব্যাধ প্রাণীহিংসা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিল, কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ সত্য কথা দ্বারা নরকে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং বাহ্য কার্যে ভাল-মন্দ নাই; মন সংলিপ্ত না হইলে তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হয় না। মানবের মনই বন্ধনের কারণ, যথা—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যে নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥

—অনুশ্রুতগীতা, ৫৫

মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ, যেহেতু মন বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু হয় এবং বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

বন্ধো হি কো?—যো বিষয়ানুরাগঃ ।

কো বা বিমুক্তিঃ?—বিষয়ে বিরক্তিঃ ॥

—মণিরত্নমালা

বন্ধন কাহাকে বলে?—বিষয়ভোগে মনের যে অনুরাগ, তাহার নাম বন্ধন। আর মুক্তি কাহাকে বলে?—বিষয়-বাসনা-রহিত বা

বিষয়ে বিরক্তি হওয়ার নাম মুক্তি। স্বতরাং আসক্তিপরিশূণ্য হইতে পারিলে, কিছুতেই দোষ নাই। কার্যের আসক্তিই দোষ,—

ন মত্তভক্ষণে দোষো ন মাংসে ন চ মৈথুনে ।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা ॥

—মহাসংহিতা

মত্তপানে, মাংসভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, কারণ ভূতগণের ইহাই প্রবৃত্তি কিন্তু উহার নিবৃত্তিই মহাফল। অর্থাৎ আসক্তিশূণ্য যে কার্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ। সংপথে থাকিয়া যত অর্থ উপার্জন করুন, কিন্তু ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাকুলতাই আসক্তি। যেন মনে থাকে সমস্তই ভগবানের, আমরা কেবল অনির্দিষ্ট সময়ের ছুঁদণ্ডের প্রহরী। পুত্র, কলত্র, বাস্তু, টাকা-কড়ি, গৃহ-আসবাব এই সকলের উপর যেন “আমার” মার্ক জোরে বসান না হয়। আমাদের শিয়রে করাল মৃত্যু নৃত্য করিতেছে। কর্মমৃত্তের পরিচ্ছেদে এই সংসার; এই বিষম-সম্পত্তি পড়িয়া থাকিবে—অনাদি অনন্তকাল হইতেই ইহা পড়িয়া আছে; আমার মত কতজন, আমারই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি এই বাড়ীর উপরে—ঐ জমির উপরে—ঐ পুকুর-বাগানের উপরে ছুঁদিনের জন্ত দানবী দীপ্তির চাহনী চাহিয়া; বাসনা-বিবশের আলিঙ্গন-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে, কালের স্রোতে সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন; বাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ—তাঁহারই ভাণ্ডারে পড়িয়া আছে। আমি তাঁহার ভৃত্য মাত্র, ইহ-সংসারের মৃত্যুরূপ জবাবপত্র পাইলেই সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ভৃত্য যেমন প্রভুর বাড়ীতে কার্য করিয়া, প্রভুর স্বন-দৌলত সমস্তই রক্ষণাবেক্ষণে সমধিক যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু

অবশ্যই তাহার জ্ঞান আছে, সে মনে মনে অবগত আছে, “আমি চাকরি করিতে আসিয়াছি, এই দ্রব্যজাত আমার নহে—প্রভু জবাব দিলেই চলিয়া যাইতে হইবে”—আমাদেরও সেইরূপ মনে করা উচিত। নতুবা ধন-দৌলতে আসক্তি জন্মিলেই এই পৃথিবীরাজ্যে প্রেতযোনি ধারণ করিয়া কত দীর্ঘ কাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যাতির উপরে মায়াও ঐরূপ জ্ঞানে সম্বন্ধ রাখা উচিত। ভগবান্ আমার উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণের ভারার্পণ করিয়াছেন, তাই সম্বন্ধে লালন-পালন করিতেছি। তাহাদের দ্বারা ভাবী সুখের আশা করিলেই আসক্তির আগুনে দগ্ধ হইতে হইবে। পুত্র বা কন্যার বিয়োগে মুহমান না হইয়া, ভগবানের গুরুতর ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি ভাবিয়া প্রফুল্ল হওয়া উচিত। আত্মসুখের জন্ত যাহা করা যায়, তাহাই বন্ধনের কারণ, আর ঈশ্বরপ্রেমে অন্তর্গত হইয়া তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তাহাতে পদপত্রের জলেক্স ত্রায় আসক্তি বা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ভক্তিব্যোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্ত যে কার্য করা যায়, তাহাকে কাম বলে; আর কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতির জন্ত যাহা করা যায়,

তাহাকে প্রেম বলে। সমস্ত কার্য নিজ সম্ভোগরূপে প্রয়োগ না করিয়া কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্যে প্রয়োগ করিলে তাহাতে আর ফলাফল ভোগ করিতে হইবে না। কাহারও পরের উপকার করিলে আনন্দ হয়, তাই সে পরোপকারী ; দুঃখীকে খাওয়াইলে একজনের সুখ হয়, তাই সে দাতা ; একজন খুব নাম-যশ হইলে সুখী হয়, তাই সে বাগ-যজ্ঞ-ব্রত-উপবাসাদি করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কার্য কামগন্ধশূন্য নহে ; সকলেরই মূলে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা রহিয়াছে, কেননা ঐরূপ করিলে আমার সুখ হয়, তাই আমি করি। ভগবান্ সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহারই প্রীত্যর্থে কৰ্ম করা ; তাঁহার সেবায় আনন্দ পাই, তাই তাঁহারই সুখের জন্ত কাজ করি। তিনি রূপ ভালবাসেন, আমরা রূপের উৎকর্ষসাধন করিব না কেন ? তিনি চন্দন-চুয়া ভালবাসেন, আমরা লেভেণ্ডার, অডিকোলন ব্যবহার করিব না কেন ? তিনি ফুল-মালা ভালবাসেন, আমরা চেন-আংটা পরিলে দোষ কি ? তাঁহার আনন্দই যে আমার আনন্দ। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, কাণা, খোঁড়া, রোগী, ভোগী ইহাদের উপকার করিয়া তাহাদের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের প্রতিভাসই আমার আনন্দ। পৃথক্ আনন্দ আর কি ? ইহারই নাম ঈশ্বরানন্দ। ভগবান্কে সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইয়া, ভগবানের সেবা করিয়া যে আনন্দের পূর্ণতম ভাব, তাহাই প্রেম। ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন লিখিয়াছেন—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।

বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন।

সুখ-বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ ॥

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।

তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আনন্দ হয় ॥

তাঁ সবার নাহি নিজ-সুখ-অনুরোধ।

তথাপি বাড়য়ে সুখ—পড়িল বিরোধ ॥

এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।

গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনে সুখের বাঞ্ছা নাই, কিন্তু কোটিগুণ সুখের উদয় হয়। বড়ই কঠিন কথা! ইহার ভাব অনুভব করা পাণ্ডিত্য-বুদ্ধির সাধ্যাত্ত নহে। গোপীগণকে দেখিয়া কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহা হইতে গোপীদের কোটিগুণ আনন্দ হয় কেন? গোপীদের সুখ যে কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত। কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া গোপীগণের সুখ, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদির সুখ নাই, কৃষ্ণসুখই সুখ। আহা কি মধুর ভাব! এই জন্ত গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তি এই নির্মল ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া, কদর্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্ণময় সর্বভূতের সুখে সুখী হইতে হইবে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইতে হইবে না, আমার কার্যে বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও সুখ। জী, পুত্র, দেশের, দশের ও সমাজের সেবা করিয়া তাহাদের যে আনন্দ, তাহাই আমার আনন্দ। সমুদয় ভূতের—সমুদয় বিশ্বের প্রীতি-ইচ্ছা—সাধনই প্রেম। ভোজন, বলসংগ্রহ, সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণ, বসন-ভূষণ পরিধান সমস্তই বিশ্বের সর্বভূতের প্রয়োজনের জন্ত। যখন যে

কাজে যাহা লাগিবে, তাহাই লাগাইতে হইবে। সে সকল করিতে হইবে না করিলে সর্বভূতের কাজ করিব কি প্রকারে? বিশ্বের কাজে লাগিবে বলিয়াই দেহের এত যত্ন। কিন্তু আসক্তির ছায়া পড়িলেই আর প্রেম হইল না, আসক্তিই কাম।

অতএব ফলাশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের তুষ্টি সম্পাদনোদ্দেশ্যে যে কার্য করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। পুত্র-কলত্র বল, বিষয়-বিভব বল, দানধ্যান বাগ-যজ্ঞ বল, সমস্তই ভগবানের—কিছুই আমার নহে; যেমন ভূত প্রভুর সংসারে থাকিয়া এ সকল করে, কিন্তু তাহার ফল তাহার নহে, তাহার প্রভুর,—তদ্রূপ আমরা ভগবানের এই বিরাট গৃহের এক কোণে পড়িয়া তাঁহারই কার্য করিতেছি। ইহাতে আমাদের শোক-দুঃখ ভাল-মন্দ আনন্দ-নিরানন্দের কি আছে?

এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কার্য করিতে শিখিলে আর আসক্তির দাগ লাগিবে না। কিন্তু একটা তুণেও যদি আসক্তি থাকে, তবে তাহার জন্ম কত জন্ম ঘুরিতে হইবে কে জানে? সর্বস্বত্যাগী পরমযোগী রাজা ভরত সসাগরা বহুদ্রবার মায়া ত্যাগ করিয়াও তুচ্ছ হরিণশিশুর আসক্তিতে কতবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্ম বলি, ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য কর, যেন ব্যাকুলতা না জন্মে—প্রাণে বাসনা-কামনার দাগ না লাগে। পূর্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাকুল না হইয়া, যখন যে কার্য উপস্থিত হইবে, ধৈর্যের সহিত সম্পাদন করা কর্তব্য। জীবের চিন্তা বিফল, স্ততরাং বুধা চিন্তা বা আশার হার না গাঁথিয়া পরমপিতার পদে চিত্ত সমর্পণপূর্বক উপস্থিত কার্য করিয়া যাইবে।

যা চিন্তা ভুবি পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপারসম্ভাষণে,

যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-যশসাং লাভে সদা জায়তে।

সা চিন্তা যদি নন্দনন্দন-পদ-দ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণ—

কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বারপ্রাণে প্রভো ॥

মর্ত্যভূমে আসিয়া, আপনহারা হইয়া পুত্র-পৌত্রাদির ভরণ-পোষণ-সন্তাষণ-ব্যাপারে বেকুপ চিন্তা করিয়া থাকি, বেকুপ চিন্তা ধন-ধাত্ত-ভোগ-বশ প্রভৃতি লাভ করিবার জন্ত ব্যয়িত করিয়া থাকি, সেই চিন্তা যদি ক্ষণকালের জন্তও নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলারবিন্দে নিয়োজিত করিতে পারি, তবে যমরাজের ভীম ভবনের দ্বারে প্রাণে কি এতটুকুও ভয় হয়? অতএব বৃথা বা ছুরাশার দান না হইয়া ফলাফল ভগবানে অর্পণ করত অবশুকর্তব্য কার্য্য করিয়া যাও। সাধকাগ্রগণ্য তুলসীদাস আপন মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

‘তুলসী, ঐসা ধ্যান ধর

জৈসী ব্যান কী গাঙ্গি ।

মুহমেঁ তৃণ চানা টুটে

চেং রক্খে বছাই ।

“তুলসী! এই ধ্যান ধর—যেমন বিয়ানো গাই, নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ ছোলা প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কিন্তু চিত্ত বাছুরের উপর ফেলিয়া রাখে, তেমনি সংসারের কাজ কর, চিত্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া রাখ ।”

আর এক কথা, সর্বদা সর্ব-অবস্থায় যেন মনে থাকে, আমাকে মরিতে হইবে। আমাদের মস্তকের উপর যমের ভীমদণ্ড নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। কোন্ মুহূর্ত্তে মরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কখন কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে অলক্ষিতে

আসিয়া সে গ্রাস করিবে—কে জানে? ভালমন্দ যে কোন কার্য করিবার পূর্বে “আমাকে একবার মরিতে হইবে” এই ভাবিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। মরণের কথা মনে থাকিলে আর মরজগতে মদন-মরণের অভিনয়ে মন অগ্রসর হইবে না।

মৃত্যুই জগৎপিতা জগদীশ্বরের পরম কারুণিক ব্যবস্থা। মৃত্যু নিয়ম-নির্ধারিত না থাকিলে পৃথিবী ঘোর অশান্তিনিয়ত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম-কর্মের মর্ম কেহই মর্মে স্থান দিত না। সতীর সত্যত্ব, দুর্ব্বলের ধন, নিধনের মান রক্ষা করা কঠিন হইত। মানব মৃত্যুর ভয় করিয়া পরকালের কথা ভাবিয়াই ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নতুবা স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন আপন বলবীৰ্য্য, ধন-সম্পদের গৌরবে নিরাশ্রয় দুর্ব্বলগণকে পদদলিত করিত। দুর্ব্বল দরিদ্রগণ প্রবলের অত্যাচার-উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া চক্ষুজলে গঙ ভাসাইত; আর গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া অদৃষ্টকে দিক্কার বা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিধির বিষম বিধানের নিন্দা করিত। মৃত্যু আছে বলিয়াই আমাদের মহুশ্যত্ব বজায় রহিয়াছে। এই পরিবর্তনশীল জগতে সকলই অনিশ্চিত, কোন বিষয়েই স্থিরতা নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী, মৃত্যুও তেমনি দেহীর সঙ্গী; শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি,—

অথ বাদ্ধশতান্তে বা মৃত্যুর্বে প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ।

আজ হউক, কাল হউক বা দু'দশ বৎসর পরেই হউক, একদিন সকলকেই সেই সর্বগ্রাসী শমন-সদনে যাইতে হইবে। অগণ্য সৈন্ত-সমাবৃত লোক-সংহারকারী শস্ত্রসম্বিত সন্মাত্র হইতে বৃক্ষতলবাসী ছিন্নকঙ্কাসম্বল ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মৃত্যু অনিবার্য্য; মৃত্যু বয়সের অপেক্ষা করে না, সাংসারিক

কার্যসম্পাদনের অসম্পূর্ণতা ভাবে না, মৃত্যুর মায়া-মমতা নাই, কালকাল বিচার নাই। মৃত্যু কাহারও উপরোধ-অহরোধ শুনে না, কাহারও স্ববিধা-অস্ববিধা দেখে না,—কাহারও স্বখ-দুঃখ বুঝে না, ভাল-মন্দ ভাবে না; কাহারও পূজা-অর্চনা চাহে না—কাহারও তোষামোদ বা প্রলোভনে ভুলে না,—কাহারও রূপ-গুণ-কুল-মান মানে না, কাহারও ধনগৌরবের প্রতি দৃকপাত করে না। কত দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপাধিত মহারথী এই ভারতে জন্মগ্রহণ করত আপন আপন বলবীৰ্য্যে সনাগরা বহুধরা প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই জীবিত নাই, সকলেই করাল মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন। বাস্তবিক মনুষ্যের এমন কোন সাধ্য নাই, যদ্বারা ভীষণ বিভীষিকাময় মৃত্যুর গতিরোধ করিতে পারে। শারীরিক বলবীৰ্য্য, ধনজন, সম্পদ, মান, গৌরব, দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপ, প্রভুত্ব প্রভৃতি সৰ্ব্ব গৰ্ব্ব মৃত্যুর নিকট খর্ব্ব হইবে। এই মৃত্যুর কথা ভাবিয়াই মহাদেহ রত্নাকর সৰ্ব্ব মায়া পরিত্যাগ পুরঃসর ধর্ম্মজগতের মহাজন-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্মশানে শবদাহ করিতে গিয়া নশ্বর দেহের পরিণাম দেখিয়া ক্ষণকালের জ্ঞাত কত জনের মনে শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

এই কারণে বলিতেছি, সৰ্ব্বদা মৃত্যুচিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে হৃদয়ে পাপপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে না—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে চিন্তা ধাবিত হইবে না—বিষয়-বিভব, আত্মীয়-স্বজনের মায়া শতবাহু সৃজন করিয়া আসক্তিশৃঙ্খলে বাঁধিতে পারিবে না। যেন মনে থাকে, আমাদিগের মত কতজন এই সংসারে আসিয়াছিলেন, এই ধনৈশ্বর্য্য, এই ঘরবাড়ী “আমার আমার” বলিয়াছিলেন, আমাদের মত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে স্নেহের শতবাহু সৃজন করিয়া জড়াইয়া ধরিতেন—কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায়? —যে অজানা দেশ হইতে

আসিয়াছিলেন, সেই অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। যেন মনে থাকে—ধন-সম্পদের অহঙ্কার, বলবিক্রমের অহঙ্কার, রূপবোবনের অহঙ্কার, বিজ্ঞাবুদ্ধির অহঙ্কার বা কুলমানের অহঙ্কার সকলি বৃথা। একদিন সকল অহঙ্কার—অহঙ্কারেরও অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হইবে। যেন মনে থাকে, আজ পার্থিব পদার্থের অহঙ্কারে উন্নত হইয়া একজন নিরাশ্রয় দুর্বলকে হয়ত পদাঘাত করিতেছি, কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, আশানে শবাকারে শয়ন করিলে শৃগাল-কুকুরে পদদলিত করিবে, পিশাচ-প্রেতে বুকে চড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবে; সেদিন নীরবে সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ পার্থিব পদার্থের অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আসক্তির বন্ধন টিলা হইয়া যাইবে।

আজকাল অনেকে শিক্ষার দোষে, সংসর্গের গুণে, বয়সের চাপল্যে পরকাল ও কর্মগুণে জন্ম-কর্ম-অদৃষ্ট স্বীকার করেন না; কিন্তু পরিণামে একদিন নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলেও জীবন তো চিরস্থায়ী নহে, একদিন মরিতেই হইবে; ধন-জন গৃহ-রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। স্মরণ্য হুঁদিনের জ্ঞান মায়ী কেন?—বৃথা আসক্তি কেন? মৃত্যুচিন্তায়, সেই স্মদূর অতীতের স্তম্বল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি পতিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে। পাঠক! আমিও যতদিন মৃত্যুর কোলে চলিয়া না পড়ি, ততদিন মৃত্যুচিন্তা জাগ্রত রাখিব বলিয়াই মরণের মহাক্ষেত্র মহাশ্মশান আমার বাসস্থান, মানবাস্থির দম্ভাবশেষ চিতাভস্ম আমার অঙ্গের ভূষণ, নরকপাল আমার জলপাত্র, আমি মরণ-পথের পথিক; দিবানিশি মরণের কোলে বসিয়া আছি!

সিদ্ধ যোগিগণ উপদেশ দিয়া থাকেন, অপরের সুখ দুঃখ পুণ্য ও পাপ দেখিলে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষ্যা করিও না; পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার ঈর্ষ্যানল দূরীভূত হইবে। তুমি যেমন সর্বদা আত্মদুঃখ নিবারণের অভ্যাস কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক সেইরূপ ইচ্ছা করিও। আপনার পুণ্য বা শুভাচরণে যেমন ফল হও, পরের পুণ্য বা শুভাচরণে সেইরূপ ফল হইও। পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, ঘৃণা করিও না, ভাল-মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না। সর্বতোভাবে উদাসীন থাকিও। ঐরূপ থাকিলে আমাদের চিত্তের অমর্ষমল নিবারিত হইবে। চিত্তের বৃত্তিসকল অল্পশীলন-সাপেক্ষ, বাস্তবিক প্রত্যেক অসদবৃত্তির পরিবর্তে সদবৃত্তি অল্পশীলন করিলে ক্রমশঃ চিত্তমল বিদূরিত হয়। ক্রোধের বিপরীত দয়া, কামের বিপরীত ভক্তি, এইরূপে প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে সাত্বিক বৃত্তিসকল উদিত করিতে করিতে চিত্ত অগ্নে অগ্নে নির্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্রতা-শক্তিসম্পন্ন হইবে। যাহার চিত্ত যত নির্মল, ভগবান্, তাহার তত নিকটে, আর যাহার চিত্ত পাপ-তমসাক্রম, তিনি ভগবান্ হইতে তত দূরে অবস্থিত। আরও এক কথা, পোশুবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে বলিয়া কষ্ট হও, যতদূর সম্ভব যত্ন ও চেষ্টা কর, কিন্তু তাই বলিয়া কদাপি যেন পাপে মগ্ন হইও না। অসং পথে অর্থোপার্জন করিলে তাহার ফল আমিই ভোগ করিব, আর কেহই সে পাপের অংশ গ্রহণ করিবে না। পোশুবর্গ সমাজের উপযোগী আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি না পাইলে মুখ ম্লান, করিও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কি করিব ?

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ।

—স্মৃতি

কৃতকৰ্ম শুভ বা অশুভ হউক, অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। পোস্তবর্গের মধ্যে যে যে রূপ অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে,—আমি শত চেষ্টাতেও তাহার অন্তথা করিতে পারিব না। কেবল অহঙ্কারের আগুন বৃকে লইয়া ছুটাছুটি করিয়া জন্মজন্মের তাপ সংগ্রহ করিব কেন। অসং উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া বাসনা-বহিতে দগ্ধ হইব কেন? ক’দিনের জন্ত জন্মজন্মান্তরের কষ্টের আগুন সৃষ্টি করিয়া আসক্তির দানবী-নিঃখাসে দগ্ধ হইব কেন? আর যদি পুত্র-কন্যার মলিন মুখ দেখিতে না পারিব, তবে ত্যাগী হইব কিরূপে? কিন্তু কৰ্ম করিব না, কৰ্মে সংসিদ্ধিলাভ করিব—ইহা তো জড়ের কথা। তবে অসং পথে যাইব না—কাহারও প্রাণে ব্যথা দিব না, যেন এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় থাকে। সংপথে থাকিয়া যেমন ভাবে চলে চলুক, বৃক্ষের ফল ও নদীর জল—ইহার ত অভাব হইবে না? আর সকল বিষয়ে ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা করা উচিত। তিনি কাহাকেও অভুক্ত রাখেন না। আমাদের জন্মগ্রহণের কত পূর্বে ভগবান্‌ মায়ের বক্ষে স্তনের সৃষ্টি করিয়া রাখেন, জন্মমাত্রেই সেই স্তন্যপান করিয়া আমরা পরিপুষ্ট হই। যাহার এমন ব্যবস্থা, এমন শৃঙ্খলা, এমন দয়া—আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া, তাঁহার কার্যশৃঙ্খলা ভুলিয়া, কেন ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরি?

আর একটি কথা বলিয়া এই বিষয় উপসংহার করিব। সেই কথাটী এই, যাহাতে জগজ্জীব অত্যাকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহা রমণীর মোহিনী মোহ। যোগসাধন কালে সকলেরই—

উদ্ধারেতা

হওয়া কর্তব্য। যোগাভ্যাস কালে জীসঙ্গাদি নিবন্ধন কোন কারণে
শুক্র নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় হয়। যথা—

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তশ্চ বিনশ্যতি।

আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে ॥

—দত্তাত্রেয়

যদি জীসঙ্গ করে, তবে বিন্দু নাশ হয়। বিন্দুনাশ হইলে আত্মক্ষয় ও
সামর্থ্যহীনতা হইয়া থাকে। অতএব—

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন রক্ষ্যো বিন্দুর্হি যোগিনা।

—দত্তাত্রেয়

এই জন্ত যোগাভ্যাসকারী যত্নের সহিত বিন্দুরক্ষা করিবেন।
শুক্র নষ্ট হইলে ওজোধাতু বিনষ্ট হইয়া থাকে, কারণ শুক্রই ওজঃস্বরূপ
অষ্টম ধাতুর আশ্রয়স্থল। বীৰ্য্যই ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার
অভাব হইলে মানুষের সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্তি,
স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। শুক্র-
নষ্ট হলে যক্ষ্মা, প্রমেহ, শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগের
উৎপত্তি হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতে হয়। নতুবা
অস্বাভাবিক আলস্য জন্মিয়া সর্বকার্য্যে ওদাসীত্ত্ব আসিবে, তখন জড়ের
ত্রায় জীবন যাপন করিতে হইবে। এই জন্ত সকলেরই সময়ে বীৰ্য্য-
রক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু বড়ই কঠিন কথা—

পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তীভূতং জগৎ।

—ভট্টহরি

মোহময়ী প্রমোদরুপ মদিরা পান করিয়া এই অনন্ত জগৎ উন্নত হইয়া রহিয়াছে। যে কোন জীবই হউক, তাহার পুরুষকে তাহার জীজাতি মোহাকর্ষণে টানিয়া রাখিয়াছে। সকলেই রিপূর উত্তেজনা, অজ্ঞানতার তাড়নায় নরকবহ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে। বিদ্যালয়ের বালক হইতে বুড়ো মিন্‌সে পর্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্ত শূক্ৰক্ষয় করিয়া জীবনের সুখ বিনষ্ট করত বজ্রদণ্ড তরুর ত্রায় বিচরণ করিতেছে। তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ আরও নির্বীৰ্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করত দুর্জয় রোগগ্রস্ত হইয়া সংসার অশান্তি-নির্লয় করিতেছে। এইরুপ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইলে নর-নারীগণের হৃদয়ে ক্বেল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; বস্তুগত্যা জ্ঞান থাকে না। কেবল আমরা নহি, দেবতাগণও প্রমোদমদিরায় উন্নত, তাহা মহামুনি দত্তাশ্রয়ে প্রকাশ করিয়াছেন—

ভগেন চর্ম্মকুণ্ডেন দুর্গন্ধেন ব্রণেন চ ।

খণ্ডিতং হি জগৎ সর্বং সদেবাস্থরমানুষম্ ॥

—অবধূতগীতা, ৮।১৯

এই আকর্ষণ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? অভ্যাস ও সংযমে সকলই হয়। তত্ত্বজ্ঞানে ও সংযমে অভ্যাসে ইহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিতে হইবে যে, যাহা নরকের কারণ—রোগের কারণ—আত্মার অবনতির কারণ—সে কার্য কেন করিব? যাহার জন্ত কৰ্ত্তব্য-পন্থা হইতে বিচলিত হইতেছি, সে জী কি?—

কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জিতা ।

কেনাপি নির্ম্মিতা নারী বন্ধনং সর্বদেহিনাম্ ॥

—অবধূতগীতা, ৮।১৪

অতএব বিবেচনা করা উচিত—কি দেখিয়া আমাদের প্রাণভরা পিপাসা? কিসের জন্ত এই পাশব-বাসনার আগুন?—দৈহিক সৌন্দর্য! কিন্তু দেহ কি? পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি অবস্থা ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। যাহার বিকাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া—যাহা বিশ্বের সকল বস্তুতেই বিद्यমান, তাহার জন্ত একটি সীমাবদ্ধ স্থানে আকর্ষণ কেন? বিশেষতঃ রূপ-যৌবন কয় মুহূর্তের জন্ত? সে বাল্যকালে কি ছিল,— যৌবনে কি হইয়াছে—আবার প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্যেই বা কি হইবে,— এইরূপ পরিবর্তনশীল দেহের পরিণাম কি, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ যে জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াছে, ঐ বৃদ্ধাও অবশ্য একদিন যুবতী ছিল, কিন্তু এখন কি হইয়াছে? আবার যৌবনেও রোগোৎপত্তি হইয়া এই সুন্দর দেহকে পচাইয়া ধসাইয়া প্রেতের অধম করিয়া দিতে পারে, তাহার জন্ত আসক্তি কেন? যেন মনে থাকে—

ভগাদিকুচপর্য্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্ ।

যে রমন্তে পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্ ॥*

—অবধূতগীতা, ৮।১৭

* এই শ্লোক কয়টির জন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাগণ ও জগন্মাতার অংশ-সমুত্তা ভারতমাতাগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন। গুরুর কৃপায় ঐরূপ জ্ঞান আমার হৃদয়ে সঞ্চার নাই; আমি জানি, শ্রী ও পুরুষ চৈতন্যেরই বিকাশ—আধারভেদে, গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র। সুতরাং ঐরূপ বিবেচনা আমি অসঙ্গত মনে করি। আমি জানি—

নৈব শ্রী ন পুমানেষ ন চৈবাং ন পুংসকঃ ।

যদ্যচ্ছরীরমাস্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে ।

—বেতাধরোপনিষৎ, ৫ অঃ

আরও এক কথা—দ্বী-সহবাসে আনন্দ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তত্ত্ববিচার করিয়া দেখা উচিত, সে আনন্দ কাহার নিকট? ব্রহ্মবস্তুর বীৰ্য্য আমাদের নিকট আছে বলিয়াই আনন্দ, নতুবা রমণীদেহে কিছুই নাই। বালকগণ রমণীর রমণীয় দেহ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া মাতার ক্রোড়ে থাকিতে ভালবাসে কেন? খোজাগণের নিকট বালিকা শ্রুতী বা বৃদ্ধা সবই সমান। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, পল্লীর পালিত কুকুর গ্রামমধ্যে আহাৰ না পাইলে গো-ভাগাড়ে গিয়া বহু দিনের পুরাতন গবাস্থি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসে; পরে কোন নির্জন স্থানে বসিয়া সেই শুষ্ক নীরস অস্থি ক্ষুধার জ্বালায় কামড়াইতে থাকে। কিন্তু অস্থিতে কি আছে? শুষ্ক কঠিন অস্থির আঘাতে তাহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধির নির্গত হয়; নিজ রক্ত রসনায় লাগিয়া স্বাদ অনুভূত হয়; তখন আরও যত্নে ও আগ্রহের সহিত সেই শুষ্ক অস্থি কামড়াইতে থাকে। পরে যখন নিজ মুখ জ্বালা করিতে থাকে, সেই সময় বুঝিতে পারে, আপন রক্তে রসনা পরিতৃপ্ত করিতেছি। কাজেই তখন অস্থি ফেলিয়া অগ্নি চেষ্টায় গমন করে। আমরাও তদ্রূপ আনন্দপ্রদ বস্তু নিজ শরীরভাঙ্গুরে রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণিক আনন্দের জগ্ন সেই বস্তু নষ্ট করিতেছি। স্বথের আশায় প্রধাবিত হইয়া শেষে প্রাণভরা স্নানুতাপ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছি। সুখ যে আমাদের নিকট, তাহা

অতএব হি যোগীন্দ্র দ্বীপুংভেদং ন মনুতে ।

সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শব্দং পশ্যতি নারদ ॥

—ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১অঃ

আমি দ্বী ও পুরুষের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ করি না।

উপলব্ধি করিতেছি না। পতঙ্গের গ্রায় রূপবহিতে বাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। যে জিনিষ শরীর হইতে বহির্গমনকালে ক্ষণকালের জন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিয়া যায়, না জানি তাহাকে সম্বন্ধে। শরীরে রক্ষা করিলে কতই অনন্তভবনীয় আনন্দ প্রদান করে। আমরা এমনি অজ্ঞ সেই পদার্থ বৃথা নষ্ট করিতে আপনার জীবন ও মন উৎসর্গ করিতেছি।

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে মনকে দৃঢ় করিয়া যিনি উদ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ নররূপী দেবতা। মহাদেব বলিয়াছেন—

ন তপস্তপ ইত্যাহ্বৰ্দ্ধাচর্য্যং তপোত্তমম্।

উদ্ধরেতা ভবেদ্ যস্ত স দেবো ন তু মানুষ্যঃ ॥

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীৰ্য্যধারণই সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্তা। যে ব্যক্তি এই তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উদ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই মানুষ্য নামে প্রকৃত দেবতা। যিনি উদ্ধরেতা, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন বীরত্ব তাঁহার করায়ত্ত। শুক্রের উদ্ধর্গমনে অতুল আনন্দ লাভ হয়।*

বীৰ্য্যধারণ না করিলে যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র। স্তত্রাং যোগাভ্যাসকারিগণ যত্নের সহিত বীৰ্য্য রক্ষা করিবে।

যোগিনস্তস্ত সিদ্ধিঃ স্ত্রাং সততং বিন্দুধারণাং।

* যোগে এমন কার্য্য আছে, বাহাতে কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত করা যায়, অথচ বীৰ্য্যক্ষয় হয় না। যোগশাস্ত্রে তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। আনন্দপ্রদ কার্য্য হইলেও তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি হয়। মৎপ্রণীত “জ্ঞানীশঙ্কর” পুস্তকে তাহা বর্ণিত হইলেও নৎপ্রণীত “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” পুস্তকে বীৰ্য্যধারণের সাধন ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। মৎপ্রণীত “প্রেমিকগুরু” পুস্তকে এই বিষয়ের উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে।

সতত বিন্দুধারণ করিলে যোগিগণের সিদ্ধিলাভ হয়। বীর্ঘ্য সঞ্চিত হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চয় হয়,—এই মহতী শক্তির বলে একাগ্রতাসাধন সহজ হয়। বাঁহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা একেবারে উর্দ্ধরেতা হইতে পারিবেন না। কারণ ঋতুরক্ষা না করিলে শাস্ত্রানুসারে পাপ হয়। স্ততরাং পুত্রকামনার, বংশরক্ষার্থে, ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য যোগমার্গানুগামী সাধক সংযতচিত্তে প্রত্যেক মাসে একদিন মাত্র স্বীয় স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করিবে।

প্রাপ্ত ক্রম নিয়মে চিত্ত সংযত করিয়া যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই অচিরে সাফল্য লাভ করিবে। নতুবা পার্থিব পদার্থের আসক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করতঃ ঈশ্বরধ্যানে নিযুক্ত হইলে অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যাইবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা নিতান্ত সহজ নয়। যেখানে-সেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু। ত্যাগই ইহার প্রধান কার্য্য। ত্যাগের সাধনা না করিলে ব্রহ্মচিন্তা নিষ্ফল।

পূর্বোক্ত তত্ত্ববিচারে আসক্তি-পরিশূন্য হইতে না পারিলে, শুধু কেশে বেশে, কি দেশে দেশে ভেসে বেড়ালে কিছু হবে না। ভবের ভাবে না থাকিয়া, ভাবের ভাবে ডুবিয়া থাকিলে সকলই সফল হয়। একপ ভাবে বাটীতে বসিয়াও বনিতা ও বেটাবেটী ঘটিবাটি লইয়া—বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকিয়াও খাটিকপে খাটিতে পারিলে ফলও খাটি। এ-তীর্থ ও-তীর্থ ছুটিতে, সন্ন্যাসীর দলে জুটিতে বা ভগ্নমীর সাজে সাজিতে হয় না। প্রত্যুত ভয় বা মাটি মাথিতে—জটাজুট রাখিতে—রঙীন বসন পরিতে—উপবাস করিয়া মরিতে—সংসার-ধর্ম ছাড়িতে—নানা কর্ম করিতে—নানা পন্থা ধরিতে—নানা শাস্ত্র খুঁজিতে—নানা কথা বুঝিতে—পরিণামে রজা চুষিতে হয় না।

উপলব্ধি করিতেছি না। পতঙ্গের ছায় রূপবহিতে বাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। যে জিনিষ শরীর হইতে বহির্গমনকালে ক্ষণকালের জন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিয়া যায়, না জানি তাহাকে সমস্ত শরীরে রক্ষা করিলে কতই অননুভবনীয় আনন্দ প্রদান করে। আমরা এমনি অজ্ঞ সেই পদার্থ বৃথা নষ্ট করিতে আপনার জীবন ও মন উৎসর্গ করিতেছি।

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে মনকে দৃঢ় করিয়া যিনি উদ্ধারেতা হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ নররূপী দেবতা। মহাদেব বলিয়াছেন—

ন তপস্তপ ইত্যাহব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।

উদ্ধারেতা ভবেদ্ যস্ত স দেবো ন তু মানুষঃ ॥

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্ধ্যধারণই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্তা। যে ব্যক্তি এই তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উদ্ধারেতা হইয়াছেন, তিনিই মানুষ নামে প্রকৃত দেবতা। যিনি উদ্ধারেতা, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন বীরত্ব তাঁহার করায়ত্ত। শুক্রে উদ্ধারগমনে অতুল আনন্দ লাভ হয়।*

বীর্ধ্যধারণ না করিলে যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র। স্মৃতরাং যোগাভ্যাসকারিগণ যত্নের সহিত বীর্ধ্য রক্ষা করিবে।

যোগিনস্তস্ত সিদ্ধিঃ স্ত্যং সততং বিন্দুধারণাং।

* যোগে এমন কার্য্য আছে, যাহাতে কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত করা যায়, অথচ বীর্ধ্যক্ষয় হয় না। যোগশাস্ত্রে তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। আনন্দপ্রদ কার্য্য হইলেও তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি হয়। মৎপ্রণীত “জানীগুরু” পুস্তকে তাহা বর্ণিত হইলেও মৎপ্রণীত “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” পুস্তকে বীর্ধ্যধারণের সাধন ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। মৎপ্রণীত “প্রেমিকগুরু” পুস্তকে এই বিষয়ের উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে।

সতত বিমুখধারণ করিলে যোগিগণের সিদ্ধিলাভ হয়। বীৰ্য্য সঞ্চিত হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চয় হয়,—এই মহতী শক্তির বলে একাগ্রতাসাধন সহজ হয়। যাঁহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা একেবারে উর্দ্ধরেতা হইতে পারিবেন না। কারণ ঋতুরক্ষা না করিলে শাস্ত্রানুসারে পাপ হয়। স্ততরাং পুত্রকামনায়, বংশরক্ষার্থে, ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় রাখিবার জন্ত যোগমার্গানুগামী সাধক সংযতচিত্তে প্রত্যেক মাসে একদিন মাত্র স্বীয় স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করিবে।

প্রাপ্তকৃত্ত নিয়মে চিত্ত অসংযত করিয়া যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই অচিরে সাফল্য লাভ করিবে। নতুবা পার্থিব পদার্থের আসক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করতঃ ঈশ্বরধ্যানে নিযুক্ত হইলে অন্ধকার ভিন্ন অণু কিছুই দেখা যাইবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা নিতান্ত সহজ নয়। যেখানে-সেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু। ত্যাগই ইহার প্রধান কার্য্য। ত্যাগের সাধনা না করিলে ব্রহ্মচিন্তা নিষ্ফল।

পূর্বোক্ত তত্ত্ববিচারে আসক্তি-পরিশূন্য হইতে না পারিলে, শুধু কেশে বেশে, কি দেশে দেশে ভেসে বেড়ালে কিছু হবে না। ভবের ভাবে না থাকিয়া, ভাবের ভাবে ডুবিয়া থাকিলে সকলই সফল হয়। একরূপ ভাবে বাটীতে বসিয়াও বনিতা ও বেটাবেটী ঘটিবাটি লইয়া— বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকিয়াও খাটিকপে খাটিতে পারিলে ফলও খাটি। এ-তীর্থ ও-তীর্থ ছুটিতে, সন্ন্যাসীর দলে জুটিতে বা ভণ্ডামীর সাজে সাজিতে হয় না। প্রত্যুত ভস্ম বা মাটি মাখিতে—জটাজুট রাখিতে—রঙীন বসন পরিতে—উপবাস করিয়া মরিতে—সংসার-ধর্ম ছাড়িতে—নানা কর্ম করিতে—নানা পন্থা ধরিতে—নানা শাস্ত্র সুঁজিতে—নানা কথা বুঝিতে—পরিণামে রস্তু চুষিতে হয় না।

শুধু মালা-ঝোলা লইয়া হরিবোলা হইলে—মাটি মাখিয়া চৈতন-
 চুটকী রাখিয়া গোপীবল্লভ রব ছাড়িলে—জটাজুট রাখিয়া ভস্ম মাখিয়া
 বোম্ বোম্ রবে হরদম্ গাঁজায় দম মারিলে—কালী কালী বলিয়া
 গাঙ্গের বালিতে পড়িয়া মদ খাইলে মদনমোহনের চরণ পাওয়া যায়
 না। নিশ্চয় জানিবেন, বনবাসে হয় না, মনোবশে হয়—তীর্থ-
 বাসে হয় না, ঘরে বসে হয়; রোষে রস মিলে না—কাম থাকিলে
 রাম মিলে না—লোভ থাকিলে ক্ষোভ হয়—অভিমান থাকিলে পাপ
 অপরিমাণ—পাপ থাকিলে তাপ—কপটতা থাকিলে অপটুতা হয়—
 মায়া থাকিলে কায় ছাড়ে না—বাসনা থাকিলে সাধনা হয় না—
 আশা থাকিলে পিপাসাবৃদ্ধি—গৌরবজ্ঞানে রৌরব নরক—প্রতিষ্ঠা
 প্রত্যাশা করিলে ইষ্টচিত্তা হয় না—গুরুত্বজ্ঞানে গুরুকৃপা হয় না—
 গুরু না ধরিলে গুরুতর ভোগ—বাঞ্ছা থাকিলে বাঞ্ছাকল্পতরুর বাঞ্ছা
 করা বৃথা—অহংজ্ঞানে সোহং হবে না। কেবল ভগ্নামিতে সকল
 পণ্ড—অবশেষে দণ্ডধারীর প্রচণ্ড প্রতাপে লণ্ডভণ্ড হইয়া দণ্ডভোগ
 করিতে করিতে চোখের জলে গণ্ড ভাসাইতে হইবে। অতএব
 যদি খাটি মানুষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মাটির দেহে অভিমান
 মাটি করিয়া—মাটি হইয়া—মাটি চাটিয়া—মাটিতে পড়িয়া খাটিতে
 হইবে। তাহা হইলে সব খাটি—মাটির দেহও খাটি। অন্ততঃ
 মোটামুটি ভাবে সব মাটি করিয়া যদি মাটির মানুষ হইতে না পারি,
 তবে সাধন-ভজন মাটি—মাটির দেহও মাটি—গোটা মানব-জীবনটাই
 মাটি হইবে।

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা বলে যে, সংসারে থাকিয়া
 সাধন-ভজন হয় না। কেন? সংসারী ধর্ম বা সাধন কিম্বা সদগতি
 লাভ করিবে না, তাহার কারণ কি? সংসার তো ভগবানের। তুমি

সংসারের 'সং' ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর। দুরাশার আসারে ডুবিয়া অসাররূপে সং না সাজিয়া 'সার' হইয়া অসার সংসারে আশার স্রসার কর এবং সংসারে সার প্রসার করিয়া পসার কর। কেবল সাংসারিক গোলমালের ভিতর পড়িয়া ঘোর রোলে গণ্ডগোল না করিয়া, গোলমালের গোল ছাড়িয়া দিয়া মাল বাছিয়া লইতে পারিলে সর্বদা সামাল সামাল করিয়া গোটা মানব-জীবনটাকে পয়মাল করিতে হইবে না। প্রত্যুত সারাংসারের সার ভগবানের সৃষ্ট সংসারের সারে সারী হইয়া আশার অধিক স্রসার ও অপার আনন্দ ভোগ করিবে। কর্তব্য-জ্ঞানে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন পূর্বক মনের সহিত ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে ও ভাবার মত ভাবিতে পারিলে সংসারধর্ম বজায় রাখিয়াও পরমাগতি লাভ করা যায়।

কেহ কেহ আবার সময়ের আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "পরিবারাদি পালনের জন্ত অর্থ উপার্জন করিতে সমস্ত দিন যায়, সাধন-ভজন কখন করিব?" অর্থ উপার্জন ও সাংসারিক কার্য-সম্পাদনে যদি সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়, তবে নিত্য রাত্রে যতক্ষণ নিদ্রাসুখ উপভোগ করি, তদপেক্ষা এক ঘণ্টা কম ঘুমাইয়া সেই ঘণ্টা নিশ্চিন্ত চিত্তে নিত্যনিরঞ্জনের আরাধনা করিলে তাহাতেই আশাতীত ফল পাইব। কাহারও আবার অর্থাভাবে পরমার্থচিন্তা হয় না। অর্থ হইলে হয় ত খুব চা'ল-কলা চিনি-সন্দেশ সংগ্রহ করিয়া, রসে রসিয়া, রোশনাই করিয়া, মেঘ-মহিষ বলি দিয়া, ধূমধামের সহিত ঢাক-টোল বাজাইয়া লোক মজাইতে পারা যায়; অর্থাভাবে সেইটা হয় না। কিন্তু পূজার যে সমস্ত উপকরণ, সকলই তো তাঁহার। সুতরাং তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে দিলে আমাদের আর বাহাদুরী কি? আমরা সর্বান্তঃকরণে সর্বপ্রকারে চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ

করিয়া তাঁহার ভক্তের মত ভাষায়—তাঁহার ভক্তের মত প্রেমকরণকণ্ঠে
ডাকিয়া বলি—

“রত্নাকরসুত গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা,
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায় ?
আভীরবামনয়নাপহৃতমানসায়

দত্তং মনো মে যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ!”

“হে যদুপতি! রত্নসকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম, অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়াছি নাকি আভীরতনয়া বামনয়না প্রেমময়ী রমণীগণ তোমার মন হরণ করিয়া লইয়াছেন। তাহা হইলে কেবল তোমার মনের অভাব। অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ করিতেছি—হে প্রেমবশ গোপীবল্লভ, তুমি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ কর।” এই তো তোমাদের সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হইল। ফলে এই সব কিছুই নহে। আমার বিশ্বাস—যাঁহার প্রাণ সেই প্রেমময়ের পাদপদ্মে প্রধাবিত হয়, কোন সাংসারিক ওজরে তাঁহাকে জোর করিয়া বাঁধিত পারে না। দেখুন, শিশু প্রহ্লাদ বিষ্ণুদেবী পিতার পুত্র, দিক্‌হন্তী-পদতলে, অপার জলধি-জলে, ছত্ৰাশনের তীব্র দহনে ও কালসর্পের তীক্ষ্ণ দংশনেও হরিনাম গাহিত, আর কত পাষাণ ধ্বংসমাঝে লালিত হইয়া, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের নাম উচ্চারণে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণা অনুভব করে। বৃদ্ধদেব অতুল সাম্রাজ্য, অগণন বৈভব, বৃদ্ধ পিতা-মাতার বিমল স্নেহ, প্রেমময়ী পতিব্রতা প্রণয়িনীর অনন্ত প্রেম ও শিশু-সন্তানের স্নানলিত কণ্ঠে আধ আধ ভাষা সমস্তই উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ

করিলেন; আর আমরা অশেষ প্রকার নিরাশায় নিপীড়িত হইয়াও ভগ্ন কুটিরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। কেহ ঈশ্বরস্বষ্ট জগতে কেবল বাক্‌ছল ও অর্থবিত্যাসের উপাদান দেখে; কেহ সেই জগতে চিন্ময়ী মহাশক্তির বৈচিত্র্যময়ী ক্রীড়া দেখেন। কোল্‌রিজ সাহেব কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া বলিতেন, "Poetry has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me." আবার আর এক জন প্রতিভাপরায়ণ সাহেব সেই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া বলেন, "The end of Poetry is the elevation of the soul * * the improvement and elevation of the moral and spiritual nature of man."—ইহার কারণ কি? বলা বাহুল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্যফলে এইরূপ ঘটয়া থাকে। যিনি যেমন প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার চিন্তের গতি সেইরূপে ধাবিত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব নানারূপ ওজর আপত্তি দর্শাইয়া স্ব স্ব স্বভাব গুপ্ত করত সাধারণের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিতে গেলে পরিণামে আক্ষেপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

অনেক ফুলষ্টকিংখারী ফুলবাবু "ধর্ম-কর্ম করিবার বয়স হইলে করা যাইবে" বলিয়া শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে স্বীয় যুক্তি যোজনা করত মুক্তিবিশয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সবল থাকিতে দুশো রগড় লুটিয়া মদন-মরণের অভিনয় করিয়া লই, তৎপরে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইলে অক্ষমতা-নিবন্ধন হরিনামে মত্ত হওয়া যাইবে। ধর্মের কি আর একটা বয়স নির্দিষ্ট আছে? মরজগতে আসিবার সময় মরণের কর্তার নিকট হইতে মৌরনী মোকররী পাট্টা

প্রাপ্ত হইলে “পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেং” এই প্রমাণে নিশ্চিত থাকাইত। কিন্তু ভাবী মুহূর্তের চিত্রপটে কি অঙ্কিত আছে, তাহা যখন লোকলোচনের গোচরীভূত নহে, তখন পঞ্চাশের আশা ছরাশা মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইলে যখন সামান্য সাংসারিক কার্যে সক্ষম হইবে না, তখন সেই অনন্তের অনন্ত ভাব ধারণা করিবে কি প্রকারে? সত্ত্ব-বিকশিত কুসুমকলিকা যেমন সুগন্ধি বিকীর্ণ করে, বাসিফুলে সে সুবাস সুদূরপর্যন্ত। বিশেষতঃ যৌবনের অপ্রতিহত প্রভাবে চিত্ত একবার যথেষ্টাচারী হইলে পুনরায় তাহাকে স্ববশে আনা সাধ্যাভীত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলি,—

এক ব্যক্তি আজীবন চুরি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। কিন্তু চোরের পুত্রটী স্বীয় কর্মফলে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। ছেলে মোটা মাহিনায় চাকুরী করেন, সংসারে কোন অভাব নাই; তবু সে স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সাধারণে সর্বদা এই বিষয় আন্দোলন-আলোচনা করে। চোরকে একদিন তাহার পুত্র বলিলেন ‘বাবা, তুমি খেতে-পরতে পাও না, তাই আজও চুরি কর? তোমার জন্ত লোক-সমাজে লজ্জায় আমি মুখ দেখাইতে পারি না।’

উপযুক্ত পুত্রের তাড়নায় তদীয় সমক্ষে “আর চুরি করিব না” বলিয়া চোর অঙ্গীকার করিল।

সেই দিন হইতে সে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি করিয়া বাটী আনয়ন করে না বটে, কিন্তু একজনের দ্রব্য অথবা একজনের বাটীতে, আবার তাহার কোন দ্রব্য অপরা একজনের বাটী রাখিয়া আইসে। কিছুদিন পরে এ কথাও সর্বত্র প্রচারিত হইল। তাহার পুত্র শুনিলেন, পিতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া ঐরূপ করার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

চোর উত্তর করিল, “আমি এখন চুরি করি না। চুরি না করিলে রাতে আমার নিদ্রা হয় না, কোনরূপ শান্তি পাই না—তাই চুরি না করিয়া একজনের দ্রব্য অপরের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াও কতকটা তৃপ্তি লাভ করি।”

অতএব যৌবনের প্রারম্ভে যখন চিত্তবৃত্তিসকল বিকশিত হয়, তখন দৃঢ় অভ্যাসে তাহাদের সংযম না করিলে পরিশেষে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতি রোধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে তুলসীদাস, বিষ্ণুমঙ্গলের সামান্য কর্ম-আবরণে প্রতিভা আবৃত ছিল। উন্মুক্ত মাত্র সতেজে ধাবিত হইয়া ধর্ম-মহাজনপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কয়জন সেইরূপ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? অতএব—

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরুপা চেৎ পতিব্রতা ।

রোগী চ দেবভক্তঃ স্রাৎ বৃদ্ধবেশা তপস্বিনী ॥

ঐরূপ না হইয়া সময়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য। নতুবা অন্তর বিষয়চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, ঘেঁষ ও অহংভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের অক্ষমতানিবন্ধন মালা-ঝোলা লইয়া লোকদেখান বৈড়ালিক ব্রত অবলম্বন করিলে অন্তরের ধন অন্তর্ধ্যামী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না।

প্রাপ্তান্ত নির্লিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিলে গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়। কারণ আমরা দু'কূল বজায় রাখিতে পারি নাই,—সংসার-ধর্ম ছাড়িয়া আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া এক কূল অবলম্বন করিয়াছি। যাহারা এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া এবং সাংসারিক কার্যের মধ্যে থাকিয়া সর্বদা ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ও চরণ ধ্যান করিতে পারে, তাহাদের সোনায়ে সোহাগা, তাহাতে আর সন্দেহ

নাই। কিন্তু নিখিতে-পড়িতে বা বলিতে-গুনিতে যত সহজ বলিয়া বোধ হয়, নিয়ম পালন করা তত সহজ নহে। যাহা হউক, যোগসাধন করিতে করিতে এবং দৃঢ় অভ্যাসের সহিত অল্পশীলন করিতে করিতে সাংসারিক আসক্তি দূরীভূত হইবে। তবে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিতে হইলে মোটামুটি কতকগুলি—

বিশেষ নিয়ম

পালন করিতে হইবে; নতুবা যোগ-সাধন হয় না। প্রথমতঃ আহার। খাওয়ার সঙ্গে শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ, আবার শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধন-ভজন হয় না। এই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ।

—যোগশাস্ত্র

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ লাভ করিতে হইলে সর্বতোভাবে শরীর রক্ষা করা অতীব কর্তব্য। শরীর পীড়াগ্রস্ত বা অকর্ম্মণ্য হইলে সাধনই হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যাহা দেহ ও মনের উন্নতিকর এবং হিতজনক তাহাই প্রশস্ত খাদ্য। যাহা উদরস্থ হইলে দেহে কোন প্রকার রোগ না হয়, অথচ শরীর বলিষ্ঠ হয়, চিত্তের প্রশান্তা-সংসাধিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়, শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহার্য্যই প্রশস্ত। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর খাদ্য ভক্ষণ করা আহারের চরম উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ইহ-পরকালের সুখ হয়, ইহকালে অরোগী এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহাই আহার করিলে পরজীবনে সুখী হইতে পারা

যাইবে। ফল কথা, আহারীয়েৰ গুণানুসারে মানুষেৰ গুণেৰ তারতম্য হয়। অতএব আহাৰ্য্যবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কৰ্তব্য। আহাৰ সম্বন্ধে শাস্ত্ৰেৰ উক্তি এই—

আহাৰশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্ৰুৱা স্মৃতিঃ।

স্মৃতিলাভে সৰ্ব্বগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

✓ আহাৰশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্মৃতিলাভ হয় এবং স্মৃতিলাভ হইলে মুক্তি অতীব স্থলভ হইয়া আইসে। অতএব সৰ্ব্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা দ্বাৰা আহাৰশুদ্ধিবিষয়ে যত্ন কৰিতে হইবে। সত্ত্ব গুণই সকলেৰ চরম লক্ষ্যস্থানীয়, সুতরাং সাধকগণ রজস্তমোগুণবিশিষ্ট খাদ্য কদাপি ভোজন কৰিবে না। শালি আতপ-তণুল, পাকা কলা, ইক্ষু-চিনি, দুগ্ধ ও ঘৃত যোগিগণেৰ প্রধান খাদ্য।

অতিশয় লবণ, অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রক্ষ, বিদাহী দ্রব্য, পেঁয়াজ, রসুন, হিং, শাক-সজ্জী, দধি, ঘোল প্রভৃতি বর্জন কৰিবে। পরিষ্কৃত, স্থবস, স্নেহযুক্ত ও কোমল দ্রব্য দ্বাৰা উদরের তিন ভাগ পূৰ্ণ কৰিয়া বাকী অংশ বায়ু-চালনেৰ জন্ত শূন্য ৰাখিবে।

✓ শাকের মধ্যে বালশাক, কালশাক, পলতা, বেতুয়া ও হিষ্কা এই পঞ্চবিধ শাক যোগীৰ ভক্ষ্য। লঙ্কার ঝাল খাওয়া উচিত নহে। প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি তেজস্কর দ্রব্য ভক্ষণ কৰিবে।

✓ যোগসাধন-সময়ে অগ্নিসেবা, নারীসঙ্গ, অধিক পথ পর্যটন, সূৰ্য্য-দৰ্শন, প্রাতঃস্নান, উপবাস কিম্বা গুরুভোজন এবং ভারবহনাদি কোন প্রকার কায়ক্ৰেশ কৰা কৰ্তব্য নহে।

স্বরূপান বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন বিধেয় নহে। আহার-
করিয়া বা ক্ষুধার্ত হইয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, পরিশ্রান্ত বা
চিন্তাযুক্ত হইয়া যোগাভ্যাস করিবে না। ক্রিয়ার পর পরিশ্রম-
জনিত ঘর্ষ দ্বারা অঙ্গ মর্দন করা উচিত; নতুবা শরীরের সমস্ত ধাতু
নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রথম বায়ু ধারণা অভ্যাস কালে খুব অল্পে অল্পে ধারণ করিবে, যেন
রেচকের পর হাঁপাইতে না হয়। যোগ-সাধনকালে মন্ত্র-জপাদি বিধেয়
নহে। উৎসাহ, ধৈর্য, নিশ্চিত বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান, সাহস এবং লোকসঙ্গ
পরিত্যাগ—এই ছয়টি যোগসিদ্ধির কারণ।

আলস্য যোগসাধনের একটি প্রধান বিঘ্ন, নিরলস হইয়া
সাধনকার্য করা আবশ্যক। যোগশাস্ত্র পাঠ কিম্বা যোগের কথা
অনুশীলন করিলে যোগসিদ্ধি হয় না। ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ।
পরিশ্রম না করিলে কোন কার্যই সফল হয় না। মহাজন-বাক্য
এই যে—

“উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ।”

মালুষ চেষ্টা না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। এক একটি বিষয়
সুসিদ্ধ করিবার জন্য মানবের কত যত্ন, কত ক্লেশ, কত অক্লান্ত
করিতে হয়, কত উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা কার্য-
কারক ব্যক্তিমাत्रেই অবগত আছেন। অতএব সর্বদা আলস্য ত্যাগ
করিয়া ক্রিয়া করা চাই। সাধনকার্যে না খাটিলে ফল হয় না।
একাগ্রচিত্তে নিত্য নিয়মিতরূপে পশ্চাত্ত্বিৎ যে কোন ক্রিয়া যথানিয়মে
অভ্যাস করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

যোগাভ্যাস-কালে অত্যাবশ্যক পরধন-ধারণ, প্রাণিহিংসা ও
পীড়ন, লোকদ্বेष, অহঙ্কার, কৌটিল্য, অসত্যভাষণ এবং সংসারে

অত্যাঙ্গি অবশ্য পরিবৰ্জনীয়। অপর ধর্মের নিন্দা করিতে নাই। গোড়ামি ভাল নহে—ধর্মের নামে গোড়ামিতে মহাপাতক হয়। ধর্মের নিন্দা নরকের কারণ। সকলের ভাবা উচিত, যিনি যে নামে ডাকুন, যে ভাবে ডাবুন, যেকোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? সে অবশ্য ভগবান্ ব্যতীত আমার বা তোমার উপাসনা করিতেছে না, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বা নীচতা নাই; যিনি স্ব-ধর্মে থাকিয়া স্ব-ধর্মোচিত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—

শ্রৈয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্যাং স্নুষ্টিতাং ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রৈয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

এই বাক্য দৃঢ় রাখ, কিন্তু কদাচ অগ্র ধর্মের নিন্দা করিও না। মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন—

সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌ কা লিজিয়ে নাম ।

হাঁজী হাঁজী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥

সকলের সহিত বৈস, সকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর, সকলকেই হাঁ মহাশয়—হাঁ মহাশয় বল, কিন্তু আপনার ঠাই বসিয়া রহিও অর্থাৎ আপনার ভাব দৃঢ় রাখিও ।

শাস্ত্র লইয়া বাদানুবাদ করা যোগিগণের উচিত নয়। এ শাস্ত্র ও শাস্ত্র করিয়া কতকগুলি পুঁথি পড়াও ভাল নহে। কারণ শাস্ত্র অনন্ত, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পরম্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের ও সর্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক এবং ফলও এক। গুরুকুপায় প্রকৃত জ্ঞান না হইলে শাস্ত্রপাঠ করিয়া তাহা বুঝা যায় না। শাস্ত্রপাঠ করিয়া কেবল বিরাট তর্কজাল বিস্তারপূর্বক বৃথা কচ্‌কটি করিয়া বেড়ান।

এইরূপ পল্লবগ্রাহী কখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—

সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্যসাধনম্ ।

জ্ঞানানাং বহুতা সেয়ং যোগবিদ্বকরী হি সা ॥

সাধন-পথের সারভূত ও কার্য-সাধনোপযোগী জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। তদ্ব্যতীত অজ্ঞসমাজে বিজ্ঞ সাজিবার জন্ত পল্লবগ্রাহিতা যোগবিদ্বকরী হয়। অতএব—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিদ্বাঃ ।

যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবানুমধ্যাৎ ॥

এই মহাজনবাক্যানুসারে কার্য করাই সাধারণের কর্তব্য। এই জন্ত বলি—হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত, মুনি-ঋষিও অনন্ত, কিন্তু আমাদের আয়ুঃ অতি অল্প; সর্বদা সাংসারিক কার্যের ঝঞ্ঝাট, স্ততরাং একজনের জীবনে সমস্ত শাস্ত্র অধীত হওয়া এবং প্রকৃত ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। স্ততরাং নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খিচুড়ী না পাকাইয়া সর্ব জাতির আদরণীয়, মানব-জীবনের উপদেষ্টা একমাত্র ধর্মজ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করা কর্তব্য। যদিও গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার লোক সমাজে স্থলভ নহে, তথাপি বারম্বার গীতা পাঠ এবং ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করা সকলেরই কর্তব্য। লোকদেখান ভণ্ডামী—লোকভুলানো ভোগলামী না করিয়া পূর্বোক্ত নিয়ম পালন করিয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে ক্রমশঃ সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত লয় হইবে। মনোলয় হইলে আর চাই কি? অতুল জ্ঞানী ভুলসীদাস বলিয়াছেন—

রাজ্য করৈ রাজ্যবশ, যোদ্ধা করৈ রণজই ।

আপন মনুকো বশ করৈ জো সব কা সেরা ওই ॥

বাস্তবিক আপনার মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন ; যিনি মনোজয়-
করিয়াছেন, তাঁহারই মানব-জীবন সার্থক । মহাত্মা কবীর সাহ-
বলিয়াছেন—

তন্থির মন্থির বচন্থির সুরত নিরত থির্ হোয় ।

কহে কবীর ইস্ পলক্ কো কলপ না পাওয়ে কোঈ ॥

অতএব সাধকগণ যোগসাধনকালে এই নিয়মগুলি পালন করিতে
উপেক্ষা করিবে না । আরও এক কথা, যে যে-ভাবে সাধনকার্য্যে
প্রবৃত্ত হইবে, সে সর্ব্বপ্রকারে তাহা গোপন রাখিবে । অনেকের
এরূপ স্বভাব আছে যে, নিজের বাহ্যদুরী জানাইয়া লোক-সমাজে
বাহবা পাইবার জন্ত এবং নাম, বশ ও মান লাভের জন্ত নিজের
সাধন-কথা সাধারণের সমক্ষে গল্প করে । কেহ বা সাধনফল কিছুমাত্র
সুবিতে পারিলেই লোকসমক্ষে প্রকাশ করে । ইহা নিতান্তই বোকামী,
সন্দেহ নাই । কারণ ইহাতে সাধকের বিশেষ ক্ষতি হয় । যোগেশ্বর
সহাদেব বলিয়াছেন—

যোগবিদ্যা পরা গোপ্যা যোগিনাং সিদ্ধিমিচ্ছতাং ।

দেবী বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্বীৰ্য্যা চ প্রকাশিতা ॥

—যোগশাস্ত্র

যে যোগী যোগসিদ্ধির বাসনা করে, সে অতি গোপনে সাধনকার্য্য
সম্পাদন করিবে । ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া গুপ্তভাবে
রাখিলে বীর্য্যবতী ও ফলবতী হয়, আর প্রকাশ করিলে নির্বীৰ্য্যা ও
নিফল হয় । এজন্য যে যেভাবে সাধন করুক, কিম্বা সাধনফল

কিছু কিছু অহুভূত হউক, প্রাণান্তেও প্রকাশ করিবে না। আর ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করত সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

—গীতা, ১৮.৬৬

অতএব সর্ব্বতোভাবে সেই কৃষ্ণচরণে* শরণাপন্ন হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই স্ত্রফল প্রাপ্ত হইবে। কারণ তাঁহার চিন্তায় তাঁহার ভাস্বর জ্যোতিঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া দিব্যজ্ঞানের উদয়ে মুক্তিপথ স্বগম হইবে। যেন স্মরণ থাকে, পুনরায় বলি—

ব্রহ্মচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ ।

অদাদুর্দ্ধং ভবেৎ সিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৪

যোগিগণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ দ্বীসঙ্গ বর্জন করিবে, মিতাহারী অর্থাৎ অপরিমিত আহার করিবে না, ত্যাগী অর্থাৎ কিছুতেই স্পৃহা রাখিবে না। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করিলে এক বৎসরে সিদ্ধিলাভ হয়।

* কৃষ্ণের নাম লিখিলাম বলিয়া কেহ যেন সাম্প্রদায়িকতা ভাব আনিয়া কোন প্রকার কুসংস্কারের বশীভূত হইবেন না। আমি নিম্নলিখিত অর্থে কৃষ্ণশব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। যথা—

কৃষি ভূঁবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভি-
ধীয়তে। কৃষা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ কালরূপেণ যঃ স কৃষ্ণঃ। কৃষা কৃষিচ পরমানন্দো-
নশ্চ তদান্তকর্ম্মণি ইতি কৃষ্ণঃ। আর একটা কথা মনে রাখুন—

কালী বলো কৃষ্ণ বলো কিছুতেই ক্ষতি নাই,
চিন্তা পরিষ্কার রেখে এক মনে ডাকা চাই।

কেশভস্মতুষাঙ্গারকীকসাদিপ্রদূষিতে
নাভ্যসেৎ পুতিগন্ধাদৌ ন স্থানে জনসঙ্কুলে ।
ন তোয়বহিসামীপ্যে ন জীর্ণারণ্যগোষ্ঠয়োঃ
ন দংশমশকাকীর্ণে ন চৈত্রে ন চ চত্বরে ॥

—স্কন্দ-পুরাণ

অতএব ঐরূপ যোগবিদ্বান্ স্থানপরিত্যাগ করত যতদূর সম্ভব গোপনীয় স্থানে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত ও অন্তঃকরণ প্রশান্ত হয় এরূপ স্থানে পরিষ্কার টাটকা গোময় দ্বারা মার্জনা করত কুশাসন, কন্দলাসন কিম্বা ব্যাঘ্র-মৃগাদির চর্মে উত্তর কিম্বা পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, পুষ্প, চন্দন ও ধূপাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া, অনন্তমনে নিশ্চিন্তচিত্তে যোগাভ্যাস করিবে ।

আসন-সাধন

স্থিরভাবে স্থখে উপবেশন করার নাম আসন । যোগশাস্ত্রে চতুরশীতি লক্ষ আসন উক্ত রহিয়াছে ; তন্মধ্যে পদ্মাসন শ্রেষ্ঠ । যথা—

আসনং পদ্মকমুক্তম্ ।

—গারুড়, ৪৯

পদ্মাসন—

বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা
দক্ষোরূপরি তথৈব বন্ধনবিধিং কৃৎ৷ করাভ্যাং দৃঢ়ং ।
তৎপৃষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ
এতদ্ব্যাধিবিকারনাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে ॥

—গৌরব্ধসংহিতা

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ সংস্থাপন করিয়া উভয় হস্ত পৃষ্ঠদিক্ দিয়া বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাদ্ব্যুষ্ঠ ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পদাদ্ব্যুষ্ঠ ধারণ এবং হৃদদেশে চিবুক সংস্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করার নাম পদ্মাসন।

পদ্মাসন দুই প্রকার; যথা—মুক্ত ও বদ্ধ পদ্মাসন। প্রোক্ত নিয়মে উপবেশন করাকে বদ্ধপদ্মাসন বলে, আর হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদিক্ দিয়া পদাদ্ব্যুষ্ঠ না ধরিয়া উরু দুইটির উপর হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া উপবেশনের নাম মুক্তপদ্মাসন।

পদ্মাসন করিলে নিদ্রা, আলস্য ও জড়তা প্রভৃতি দেহের মানি দূরীভূত হয়। পদ্মাসনপ্রভাবে কুণ্ডলিনী চৈতন্য হয় এবং দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মাসনে বসিয়া দন্তমূলে জিহ্বাগ্র ধারণ করিলে সর্বব্যাদি নাশ হয়।

সিদ্ধাসন—

যোনিস্থানকমজিঘ্রমূলঘটিতং কৃৎস্না দৃঢ়ং বিগ্রসেৎ
মেঢ়ে পাদমথৈকমেব হৃদয়ে ধৃৎস্বা সমং বিগ্রহম্।
স্থাপুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োহচলদৃশা পশ্যন্ ভ্রাবোরন্তরং
চৈতন্যাত্মকপাটভেদজনকং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥

—গোরক্ষসংহিতা

যোনিস্থানকে বামপদের মূলদেশের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আর এক চরণে মেঢ়দেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া এবং হৃদয়ে চিবুক বিগ্রস্ত করত দেহটিকে সমভাবে সংস্থাপন করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে দৃষ্টি-স্থাপনপূর্ব্বক অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়া নিশ্চলভাবে উপবেশন করাকে সিদ্ধাসন বলে।

সিদ্ধাসন সিদ্ধিলাভের পক্ষে সহজ ও সরল আসন। সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে অতি শীঘ্র যোগ-নিষ্পত্তি লাভ হয়। তাহার কারণ এই যে, লিঙ্গমূলে জীব ও কুণ্ডলিনীশক্তি অবস্থিত। সিদ্ধাসনের দ্বারা বায়ুর পথ সরল ও সহজগম্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরে তড়িৎশক্তি চলাচলের সুবিধা হয়। যোগশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে, সিদ্ধাসন মুক্তিদ্বারের কপাট ভেদ করে এবং সিদ্ধাসন দ্বারা আনন্দকরী উন্নয়নদশা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বস্তিকাসন—

জানুর্বোরন্তরে সম্যক্ কৃৎযা পাদতলে উভে।

সমকারঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥

জাহ্নু ও উরু এই উভয়ের মধ্যস্থলে পদতলদ্বয়কে সম্যক্ প্রকারে সংস্থাপন পূর্বক সমকার্যবিশিষ্ট হইয়া সুখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন বলে। স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া বায়ু-সাধন করিলে সাধক অল্প সময়ের মধ্যেই বায়ুসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং বায়ুসাধনজনিত ব্যভিচারেও কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

এই তিন প্রকার আসন ব্যতীত ভদ্রাসন, উগ্রাসন, বীরাসন, মণ্ডুকাসন, কুর্মাশন, কুকুটাসন, গুপ্তাসন, যোগাসন, শবাসন, সিংহাসন ও ময়ূরাসন প্রভৃতি বহুবিধ আসন প্রচলিত আছে। নানাবিধ আসন অভ্যাস করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; প্রাপ্তভূত তিন আসনের মধ্যে যাহার যেটা সুবিধা হয়, সেই আসন অবলম্বন করিয়া যোগসাধন করিবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আসনের নামে হাসিয়া অস্থির হয়। তাহারা বলে—“ঐরূপ ভাবে না বসিলে কি সাধন হয় না? আপন ইচ্ছামত বসিয়া সাধন করিব, এত

গুণগোলে দরকার কি?” ইহার মধ্যে কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসিলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-বৃত্তির ঐকান্তিকতা জন্মে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, দুঃখের চিন্তায় বা নিরাশায় লোকে গণ্ডে হাত দিয়া উপবেশন করিয়া থাকে। সেই সময় ঐরূপ অবস্থায় উপবেশন যেন স্বাভাবিক এবং সেই চিন্তার উপযোগী। সিদ্ধ যোগিগণ বলেন, বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্ন আসনে শরীর ও মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আরও এক কথা এই যে, যোগসাধনকালে দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকা যোগাভ্যাসের একটি প্রধানতম কার্য; কিন্তু এমনি তাহা ঘটয়া উঠে না, এই জন্ত আসনের প্রয়োজন। যোগাভ্যাসকালে যোগীর যে দৈহিক নূতন ক্রিয়া বা স্নায়ু-প্রবাহ নূতন প্রবাহে ও নূতন পথে চালিত হয়, তাহা মেরুদণ্ডের মধ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং মেরুদণ্ডকে যে ভাবে ও যে অবস্থায় রাখিলে ঐ ক্রিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই আসন-প্রণালীতে বিধিবদ্ধ আছে। মেরুদণ্ড, বক্ষোদেশ, গ্রীবা, মস্তক ও পঙ্করাস্থি—এই সকলগুলি যে ভাবে রাখা আবশ্যক, তাহা ঐ আসনে বসিবার প্রণালীতেই ঠিক আছে। আসন করিলে সেজন্ত আর অল্প কিছু শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। বিশেষতঃ আসনসিদ্ধি এমন কঠিনও ত কিছু নহে। যত্নপূর্বক কয়েক দিন মাত্র অভ্যাস করিলেই উহাতে ক্লান্তকার্য হওয়া যাইতে পারে।

প্রাপ্ত তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেরূপ আসনে বসিলে কোন প্রকার কষ্টানুভব না হয়, সে সেই প্রকার আসনই অভ্যাস করিবে। আসন করিয়া বসিলে যখন শরীরে বেদনা বা কোনরূপ কষ্ট অনুভূত না হইয়া একরূপ আনন্দের উদয় হইবে, তখনই জানিবে—আসন-সিদ্ধি হইয়াছে। উত্তমরূপে আসন অভ্যাস হইলে যোগসাধন আরম্ভ করিবে।

তত্ত্ব বিজ্ঞান

একমাত্র দেবদেব মহেশ্বর নিরাকার নিরঞ্জন। তাঁহা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হয়। তৎপরে সেই আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই পাঁচটি মহাভূত পঞ্চতত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, আবার তাহা হইতেই পুনরুৎপন্ন হইয়া থাকে ; যথা—

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।

পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥

—ব্রহ্মজ্ঞান-তত্ত্ব

পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই তত্ত্বেই তাহা-
লয়প্রাপ্ত হইবে। পঞ্চতত্ত্বের পর যে পরমতত্ত্ব, তিনি তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন।
মানব-শরীর পঞ্চতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মূত্রিকা হইতে অস্থি, মাংস,
নখ, ত্বক্ ও লোম এই পাঁচটি উৎপন্ন হইয়াছে। জল হইতে শুক্র, শোণিত
মজ্জা, মল ও মূত্র এই পাঁচটি; বায়ু হইতে ধারণ, চালন, ক্ষেপন,
সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই পাঁচটি। অগ্নি হইতে নিদ্রা, স্মৃতি, তৃষ্ণা,
ক্রান্তি ও আলস্য এই পাঁচটি এবং আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ,
মোহ ও লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের
গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার আকাশ—
শব্দ এই এক গুণবিশিষ্ট; বায়ু—শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণযুক্ত। অগ্নি
শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণবিশিষ্ট; জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস

এই চারি গুণযুক্ত এবং পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণসম্বিত। আকাশের গুণ কর্ণদ্বারা, বায়ুর গুণ শ্রবণদ্বারা, অগ্নির গুণ চক্ষুদ্বারা, জলের গুণ জিহ্বাদ্বারা এবং পৃথিবীর গুণ নাসিকাদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি।

সূক্ষ্মরূপেণ বর্তন্তে জ্ঞায়ন্তে তত্ত্বযোগিভিঃ ॥

—পবন-বিজয় স্বরোদয়ঃ

এই পঞ্চতত্ত্বময় দেহে পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। তত্ত্ববিং যোগিগণ তৎসমস্ত অবগত আছেন। গুহ্যদেশে মূলাধারচক্রটি পৃথিবীতত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রটি জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুরচক্রটি অগ্নিতত্ত্বের স্থান, হৃদদেশে অনাহতচক্রটি বায়ুতত্ত্বের স্থান এবং কর্ণদেশে বিশুদ্ধচক্রটি আকাশতত্ত্বের স্থান। সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে যথাক্রমে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসাপুটে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাম বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন কালে যথাক্রমে এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। তত্ত্ববিং যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন।

তত্ত্ব-লক্ষণ

পঞ্চতত্ত্বের আট প্রকার লক্ষণ স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে। প্রথমে তত্ত্বসংখ্যা, দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধি, তৃতীয়ে স্বরচিহ্ন, চতুর্থ স্থান, পঞ্চমে তত্ত্বের বর্ণ, ষষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ এবং অষ্টমে গতি।

মধ্যে পৃথ্বী হৃদয়চাপশ্চাৰ্দ্ধং বহতি চানলঃ ।

তিৰ্য্যগ্ বায়ুপ্রচারশ্চ নভো বহতি সংক্রমে ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

যদি নাসাপুটের মধ্যস্থান দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী-তত্ত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঐরূপ নাসাপুটের অধোভাগ দিয়া নিঃশ্বাস বহিলে জন-তত্ত্বের, উর্দ্ধভাগ দিয়া বহিলে অগ্নি-তত্ত্বের, পার্শ্বদেশ দিয়া বহিলে বায়ু-তত্ত্বের এবং নাসিকা-রন্ধের সর্বস্থান স্পর্শ করত ঘূর্ণিতভাবে নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবাহিত হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় হয় জানিবে।

মাহেয়ং মধুরং স্বাদু কষায়ং জলমেব চ ।

তিক্তং তেজো বায়ুরন্ন আকাশঃ কটুকস্তথা ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

যদি মুখে মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়, তবে পৃথিবী-তত্ত্বের, কষায়স্বাদে জন-তত্ত্বের, তিক্তস্বাদে অগ্নি-তত্ত্বের, অন্নস্বাদে বায়ু-তত্ত্বের এবং কটু-স্বাদে আকাশ-তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলম্ ।

দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারুণম্ ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

যখন বায়ু-তত্ত্বের উদয় হয়, তখন নিঃশ্বাসবায়ুর পরিমাণ অষ্ট অঙ্গুলি হইয়া থাকে। অগ্নি-তত্ত্বে চারি অঙ্গুলি, পৃথিবী-তত্ত্বে দ্বাদশ অঙ্গুলি জন-তত্ত্বে ষোড়শ অঙ্গুলি এবং আকাশ-তত্ত্বে বিশ অঙ্গুলি শ্বাসবায়ুর পরিমাণ হইয়া থাকে।

LIBRARY

No.....

Shri Shri 142 2020mayera Acharya

BANARAS

আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পীতা রক্তবর্ণো হতাশনঃ ।

মারুতো নীলজীমূত আকাশো ভূরিবর্ণকঃ ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

পৃথিবী-তত্ত্ব পীতবর্ণ, জল-তত্ত্ব শ্বেতবর্ণ, অগ্নি-তত্ত্ব লোহিতবর্ণ, বায়ু-তত্ত্ব নীল মেঘের ত্রায় শ্রামবর্ণ এবং আকাশ-তত্ত্বে নানা প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

চতুরশ্রং চার্কচন্দ্রং ত্রিকোণং বর্জুলং স্মৃতম্ ।

বিন্দুভিস্ত নভো জ্যেয়মাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণম্ ॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র

দর্পণোপরি শ্বাস পরিত্যাগ করিলে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহার আকার চতুষ্কোণ হইলে পৃথিবী-তত্ত্বের, অর্ধচন্দ্রের ত্রায় হইলে জল-তত্ত্বের, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি-তত্ত্বের, গোলাকৃতি হইলে বায়ু-তত্ত্বের এবং বিন্দু বিন্দুর ত্রায় দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে ।

মানবদেহের যখন যে নাসিকায় শ্বাসবহন হয়, তখন উপরোক্ত পঞ্চতত্ত্ব ক্রমান্বয়ে উদয় হইয়া থাকে । কখন কোন্ তত্ত্বের উদয় হয় এবং তত্ত্বের গুণাদি বুঝিয়া তত্ত্বানুকূলে গমন, মোকদ্দমা ও ব্যবসাদি যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই স্থসিদ্ধ হইবে । কিন্তু ভগবদন্ত এমন সহজ উপায় আমরা জানি না বলিয়া আমাদের কার্য্যনাশ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় । কোন্ তত্ত্বের উদয়ে কিরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে সফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিবরণ প্রকাশ করা এই গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় নহে ; সুতরাং বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না ।

এই পঞ্চতত্ত্ব সাধন করিলে সর্বপ্রকার সাধনকার্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়। স্থূল কথা, তত্ত্বসাধনে কৃতকার্য হইলে শারীরিক, বৈষয়িক ও পারমার্থিক সকল কার্যেই সুখ ও অসিদ্ধি হয়।

তত্ত্ব-সাধন

হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিযুগল দ্বারা দুই কর্ণকুহর, মধ্যমাঙ্গুলিযুগল দ্বারা নাসারন্ধ্রযুগল, অনামিকা অঙ্গুলিযুগল ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিযুগল দ্বারা মুখবিবর এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলিযুগল দ্বারা চক্ষুযুগল আচ্ছাদিত করিলে যদি পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন পৃথিবী-তত্ত্বের, শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইলে জল-তত্ত্বের, লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নি-তত্ত্বের, শ্রামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ু-তত্ত্বের এবং বিন্দু বিন্দু নানাবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় জানিতে হইবে।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে মাটিতে দুই পা পশ্চাদিকে মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া উপবেশন করিবে। পরে দুই হাত উন্টাইয়া দুই উরুতে স্থাপন করিবে অর্থাৎ উরুর উপর হাত দুইখানি চিৎ করিয়া রাখিবে, যেন অঙ্গুল্যগ্র পেটের দিকে থাকে। এইরূপ ভাবে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এক মনে ক্রমান্বয়ে পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

পৃথ্বী-তত্ত্বের ধ্যান—

লংবীজাং ধরণীং ধ্যায়েৎ চতুরশ্রাং সুপীতাভাম্ ।

সুগন্ধাং স্বর্ণবর্ণত্বমারোগ্যং দেহলাঘবম্ ॥

লং বীজ পৃথ্বী-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র । এই বীজ উচ্চারণপূর্বক এইরূপে পৃথিবীর ধ্যান করিতে হইবে ; যথা—এই তত্ত্ব উত্তম হরিদ্রাবর্ণ, হিরণ্যলাবণ্য-সংযুক্ত, চতুষ্কোণবিশিষ্ট, উত্তম গন্ধযুক্ত এবং আরোগ্য ও দেহের লঘুতাকরণ-শক্তিসম্পন্ন ।

জল-তত্ত্বের ধ্যান—

বংবীজং বারুণং ধ্যায়েদর্দ্ধচন্দ্রং শশিপ্রভং ।

ক্ষুংপিপাসাসহিষ্ণুং জলমধ্যস্থ মজ্জনম্ ॥

বং বীজ জল-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র । এই বীজ উচ্চারণপূর্বক এইরূপে জল-তত্ত্বের ধ্যান করিতে হইবে ; যথা এই তত্ত্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি-বিশিষ্ট, চন্দ্রের ত্রায় প্রভাযুক্ত এবং ক্ষুংপিপাসা-সহন ও জনমজ্জন-শক্তিসমন্বিত ।

অগ্নি তত্ত্বের ধ্যান—

রংবীজং শিখিনং ধ্যায়েৎ ত্রিকোণমরুণপ্রভম্ ।

বহ্নপানভোক্তৃত্বমাতপাগ্নিসহিষ্ণুতা ॥

রং বীজ অগ্নি-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র । এই বীজ উচ্চারণপূর্বক ধ্যান করিতে হইবে—এই তত্ত্ব ত্রিকোণবিশিষ্ট, অরুণবর্ণ, বহ্ন অন্নপান-ভোজনশক্তিসংযুক্ত এবং রৌদ্র ও অগ্নিতেজসহনশক্তি-সমন্বিত ।

বায়ু-তত্ত্বের ধ্যান—

যংবীজং পবনং ধ্যায়েদ্বৰ্জুলং শ্যামলপ্রভম্ ।

আকাশগমনাত্মক পক্ষিবদগমনং তথা ॥

যং বীজ বায়ু-তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র । এই বীজ উচ্চারণপূর্বক ধ্যান করিতে হইবে—এই তত্ত্ব গোলাকার শ্যামবর্ণবিশিষ্ট এবং পক্ষিগণের ত্রাঙ্ক গগনমার্গে গমনাগমনশক্তি-সমন্বিত ।

আকাশ-তত্ত্বের ধ্যান—

হংবীজং গগনং ধ্যায়েৎ নিরাকারং বহুপ্রভম্ ।

জ্ঞানং ত্রিকালবিষয়মৈশ্বর্য্যমগ্নিমাদিকম্ ॥

হং বীজ আকাশতত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র । এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে,—এই তত্ত্ব নিরাকার, বিবিধবর্ণসংযুক্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ এবং অগ্নিমাদি ঐশ্বর্য্য-সমম্বিত ।

প্রত্যহ একপ্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া মাটিতে বসিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উক্তরূপে ধ্যান করিলে ছয় মাসে নিশ্চয়ই তত্ত্বসিদ্ধি হইবে । তখন দিবা-রাত্রের মধ্যে নিজ শরীরে কখন কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা যখন-তখন অতি সহজে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এবং শরীর সুস্থ রাখা ও সাংসারিক-বৈষয়িক কার্য্যে সফল লাভ করা যায় । তত্ত্বসিদ্ধি হইলে লয়যোগ এবং অত্যাণ্ড যোগ-সাধন বিশেষ সহজ এবং সূক্ষ্ম হয় । আকাশ-তত্ত্বের উদয়ে সাংসারিক কার্য্যাদি না করিয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয় ।

তত্ত্বসাধন করিবার সময় কোনপ্রকার যোগ-সাধনও করা যায় । অতএব তত্ত্বসাধন করিবার সময় বসিয়া না থাকিয়া কোন প্রকার যোগসাধন করাও কর্ত্তব্য ।

তস্মা রূপং গতিঃ স্বাদো মণ্ডলং লক্ষণস্ত্বিদম্ ।

যো বেত্তি বৈ নরো লোকে স তু শূদ্রোহপি যোগবিৎ ॥

—পবনবিজয় স্বরোদয়

এইরূপে যিনি তত্ত্বসকলের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল ও লক্ষণসকল অবগত হন, তিনি শূদ্র হইলেও যোগী বলিয়া অভিহিত হয়েন ।

নাড়ী-শোধন

শরীরস্থ নাড়ীসকল মলাদিতে দূষিত থাকে ; নাড়ী শোধন না করিলে বায়ু ধারণ করা যায় না। সুতরাং যোগসাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে নাড়ীশোধন করিতে হয়। ইষ্টযোগে ষট্‌কর্মা দ্বারা শরীর শোধনের ব্যবস্থা আছে। যথা—

ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতি নৌলিকিস্ত্রাটকস্তথা।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্মাণি সমাচরেৎ ॥

—গোরক্ষ-সংহিতা, ৪র্থ অঃ

ধৌতি, বস্তি, নেতি, নৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয় প্রকার বহিঃক্রিয়া দ্বারা শরীর শোধনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে সকল গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীরই সাজে, সাধারণের পক্ষে তাহা বড় দুষ্কর। বিশেষতঃ উহা উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা। পরমযোগী শঙ্করাচার্য্য আন্তর প্রয়োগ দ্বারা যেক্রপ নাড়ীশোধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রকরণ লিখিত হইল। ইহাই সকলের পক্ষে স্থলভ।

আগে আসন অভ্যাস করিতে হয়; আসন সিদ্ধ হইলে, তারপর নাড়ীশোধন করিতে হয়।

স্থিরভাবে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট অল্প চাপিয়া বাম নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে এবং বিদ্যুন্মাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসিকা বন্ধ করত দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ছাড়িয়া দিবে; আবার দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা

দ্বারা ঐ বায়ু রেচন করিবে, কিন্তু গ্রহণ করা সমাপ্ত হইলে রেচন করিতে বিন্দুমাত্র কালও বিলম্ব করা উচিত নহে। প্রথম অভ্যাস-কালে প্রতিবারে এইরূপ যে একবার, তাহার তিনবার করিতে হইবে। তারপর তিনবার স্বন্দররূপে অভ্যাস হইলে পাঁচবার, তারপরে সাতবার করিতে হয়।

সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে এইপ্রকার একবার উষাকালে, একবার মধ্যাহ্নকালে, একবার সায়াহ্ন সময়ে এবং একবার নিশীথ সময়ে—এই চারিবার ঐ ক্রিয়া করিতে হইবে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে চারি সময়ে যত্নের সহিত অভ্যাস করিলে এক মাসের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ হইবে। কাহারও কাহারও দেড় কি দুই মাস সময়ও লাগিতে পারে।

নাড়ী-শোধনে সিদ্ধিলাভ করিলে দেহ খুব হালকা বোধ হইবে। আলস্য, জড়তা প্রভৃতি দূরীভূত হইবে। মধ্যে মধ্যে আনন্দে মন প্রিয়া উঠিবে এবং সময় সময় স্বগন্ধে নাসিকা পূর্ণ হইবে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, নাড়ী-শোধন সিদ্ধ হইয়াছে। তখন পশ্চাত্তপ্ত যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

মনঃ স্থির করিবার উপায়

মন স্থির না হইলে কোন কাজই হয় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও ভূচরী, খেচরী মূত্রাদি যত কিছু অল্পাধিক, সকলেরই উদ্দেশ্য—চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক মনোজয়। মদমত্তমাতঙ্গসদৃশ প্রমত্ত মনকে বশীভূত করা স্বকঠিন; কিন্তু উপায় আছে।

যাহার যে আসন অভ্যাস আছে, সে সেই আসনে উপবেশন-পূর্বক মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্থায়ী শরীরকে সোজা করিয়া বসিবে। পরে নাভিমণ্ডলে দৃষ্টিস্থাপন পূর্বক কিছুক্ষণ নিমেষোন্মেষ-বর্জিত হইয়া থাকিবে। নাভিস্থানে দৃষ্টি ও মন রাখিলে নিঃশ্বাস ক্রমে যত ছোট হইবে, মনও তত স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে। এইভাবে নাভির প্রতি দৃষ্টি ও মন রাখিয়া বসিলে কিছুক্ষণ পরে মন স্থির হইবে। মন স্থির করিবার এমন কৌশল আর নাই। অপিচ—

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ ।

মনসো ধারণকৈব ধারণা সা পরা মতা ॥

—ত্রিপঞ্চাঙ্গ যোগ

ইষ্টদেবের চিন্তা বা কোন ধ্যান-ধারণায় মন নিযুক্ত করিবার সময়ে মন যদি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে মন যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই বিষয় আত্মাহুতবে সমরস বোধে সর্বত্র ইষ্টদেব অথবা ব্রহ্মময় ভাবিয়া চিত্ত ধারণা করিবে। এইরূপ করিলে বিষয় ও ইষ্টদেবতা কিংবা বিষয় ও ব্রহ্ম অভিন্ন—একবোধে চিত্তের ধারণা বৃদ্ধি পাইয়া অতি সত্ত্বরেই কৃতকার্য হইতে পারিবে। এই উপায় ব্যতীত চিত্ত জয় করিবার স্মগম পন্থা ও সহজ উপায় আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আপনাকে ও জগতের সমস্ত পদার্থ ইষ্টদেব হইতে অভিন্ন ভাবে এবং তাঁহাকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করে, মুক্তি তাহার করতলগত। এই দুই উপায় ব্যতীত—

ট্রাটক যোগ

অভ্যাস করিলে সহজে মন স্থির হয় এবং নানাবিধ শক্তিলাভ হইয়া থাকে ; অভ্যাস করাও সহজ । যথা—

নিমেবোন্মেষকং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্মলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ ।

যাবদক্ষনিপাতঞ্চ ট্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥

স্থিরভাবে সূখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধাতু কিংবা প্রস্তরনির্মিত কোন সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে । ঐরূপ চাহিয়া থাকিবার সময় শরীর না নড়ে, মন কোন প্রকারে বিচলিত না হয়—এইরূপে যতক্ষণ চক্ষু দিয়া জল না পড়ে, ততক্ষণ চাহিয়া থাকিবে । অভ্যাসক্রমে বহু সময় ঐরূপ চাহিয়া থাকিবার শক্তি জন্মিবে ।

ভ্রমের মধ্যস্থ বিন্দুকে দৃষ্টিপূর্বক একাগ্র হইয়া যতক্ষণ চক্ষুতে জল না আইসে, ততক্ষণ থাকিতে থাকিতে ক্রমে দৃষ্টি ঐরূপ আবদ্ধ হয় । এরূপ হইলে ট্রাটক সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

ট্রাটক সিদ্ধ হইলে, চক্ষুর দোষ নষ্ট হয়, নিদ্রা-তন্দ্রাদি আয়ত্তীভূত হয় ও চক্ষুর রশ্মিনির্গমপ্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে মেস্‌মেরিজ্‌ম্ (Mesmerism) তাহা ট্রাটক-যোগেরই একটু আভাস মাত্র । ট্রাটক-যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, মেস্‌মেরিজ্‌ম্ অতি সহজে করা যায় । তবে পাশ্চাত্য মেস্‌মেরিজ্‌ম্ আর ট্রাটক-যোগে অনেক ব্যবধান । কেননা, মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌কারী জানে না যে কি দিয়া কি হইতেছে, কিন্তু ট্রাটক-যোগী মোহিষ্ণু এবং নিজের সকল সংবাদই রাখে । ট্রাটক সিদ্ধ হইলে হিংস্র জন্তুগণ পর্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে ।

একদা আমার যোগশিক্ষাদাতা মহাপুরুষের সহিত পার্শ্বত বন-ভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম ; সহসা একটা ব্যাঘ্র আমাদের সম্মুখীন হইল। আমি তো ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, মহাপুরুষ আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার চক্ষুযুগলকে ব্যাঘ্রের চক্ষুর্দ্বয়ের অভিমুখে ঠিক সমস্ত্রপাত-ক্রমে স্থাপিত করিয়া আপনার নেত্ররশ্মি সংঘত করিলেন। ব্যাঘ্রের একপদ অগ্রসর হইবারও ক্ষমতা হইল না ; সে চিত্রপুত্তলিকার তায় দণ্ডায়মান হইয়া লাদুল নাড়িতে লাগিল ; মহাপুরুষ যতক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেন, ব্যাঘ্রটি ততক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার চক্ষু হইতে স্বীয় দৃষ্টি অপসৃত করিবারাত্র ব্যাঘ্রটি দ্রুত বনমধ্যে প্রবেশ করিল, আর আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। পরে মহাপুরুষ আমাকে ট্রাটক-যোগের শক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ট্রাটক-যোগ অভ্যাস করিতে পারিলে সহজে লোককে নিদ্রিত, বশীভূত ও ইচ্ছামত কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

কুণ্ডলিনী-চৈতন্যের কোশল

কুণ্ডলিনী-তত্ত্বেই বলা হইয়াছে যে, কুণ্ডলিনী চৈতন্য না হইলে তপ-জপ ও সাধন-ভজন বৃথা। কুণ্ডলিনী অচৈতন্য থাকিতে মানবের কখনই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে না। মানব-জীবনের প্রধান কার্য ও যোগসিদ্ধির উপায়—কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন। যতগুলি সাধন আছে, সকলই কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিবার জন্ত। স্তত্রাং সর্বাগ্রে যত্নের সহিত কুণ্ডলিনী চৈতন্য করা কর্তব্য। মূলধারপক্ষে কুণ্ডলিনী

শক্তি স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে সাদৃশ্যবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া সর্পিণীর আকারে নিদ্রিত আছেন। বাবৎ তিনি দেহে নিদ্রিতা থাকেন, তাবৎ মানব পশুবৎ অজ্ঞানচ্ছন্ন থাকে, তাবৎ কোটি কোটি যোগাভ্যাস দ্বারাও জ্ঞান জন্মে না। যেমন চাবি দ্বারা কুলুপ খুলিয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করা যায়, তেমনি কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিয়া মূর্খাদেশে সহস্রারপদ্যে আনীত করিলেই ব্রহ্মদ্বার ভেদ হইয়া ব্রহ্মরূপ পথ উন্মুক্ত হয়। ইহাতেই মানবের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বাম পায়ের গোড়ালী দ্বারা যোনিদেশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দক্ষিণ পদ ঠিক সোজা ও সরল ভাবে ছড়াইয়া বসিবে, তৎপরে ঐ দক্ষিণ পদ দুই হাত দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিবে এবং কণ্ঠে চিবুক স্থাপিত করিয়া কুন্তক দ্বারা বায়ু রোধ করিবে। পরে প্রাণায়ামের প্রণালীক্রমে ধীরে ধীরে ঐ বায়ু রেচন করিবে। দণ্ডাহত সর্প যেমন সরল ভাব ধারণ করে, তেমনি এই ক্রিয়ার অন্ত্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি ঋজু আকার ধারণ করিবেন।

বিষতপ্রমাণ দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, কোমল, শ্বেতবর্ণ, সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টিত করিয়া কটিশূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে ভস্মদ্বারা গাত্র লেপন করতঃ গোপনীয় গৃহমধ্যে সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসাপুট দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্বক অপানবায়ুতে যুক্ত করিবে এবং যে পর্যন্ত সূক্ষ্মা-বিবরে বায়ু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, সে পর্যন্ত ক্রমশঃ অগ্নিনীমুদ্রা দ্বারা গৃহদেশকে আকৃষ্ট ও প্রসারিত করিবে। এইরূপ বদ্ধশ্বাস হইয়া কুন্তকযোগ দ্বারা বায়ুরোধ করিলে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হইয়া সূক্ষ্মা-পথে উচ্চ গমন করিবেন।

ঐক্য প্রক্রিয়ায় কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে যোনিমুদ্রাযোগে উত্থাপন করাইতে হয়। মূলাধার হইতে ক্রমে সমস্ত চক্রগুলি ভেদ করত সহস্রদলপদে উঠিয়া পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহাদের সামরন্ত-সম্মত অমৃত দ্বারা শরীর প্রাণিত হইতে থাকে। সেই সময় সাধক সমস্ত জগৎ বিশ্বত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যে অনির্বচনীয় অপার আনন্দে মগ্ন হয়, তাহা নিজে অনুভব ভিন্ন লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না; জীসংসর্গে শরীরে ও মনে যেরূপ অনির্দেশ্য আনন্দ অনুভব হয়, তদপেক্ষা কোটা কোটা গুণ অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। সে অব্যক্ত ভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষা নাই।

কুণ্ডলিনী-শক্তিকে কিরূপে উত্থাপন করিতে হয়, তাহা মুখে বলিয়া না দেখাইয়া দিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই, সুতরাং সে গুহ্য বিষয় অকারণ সাধারণ্যে প্রকাশ করা বৃথা।† সাধক কেবলমাত্র কুণ্ডলিনী-শক্তিকে চৈতন্য করার জন্য প্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে। তাহা এই—

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে দৃঢ়রূপে চিবুক স্থাপন করিবে, পরে হাত দুইটি সম্পূর্ণ করিয়া দুই হাতের কনুই (অর্থাৎ বাহু-মধ্যভাগ) হৃদয়ে দৃঢ়রূপে রাখিয়া নাভিদেশে বায়ু ধারণ করিবে এবং গুহ্যদেশকে অগ্নিনিমুদ্রা দ্বারা সঙ্কুচিত-প্রসারিত করিতে থাকিবে। এইরূপ নিত্য অভ্যাসে কুণ্ডলিনী শীঘ্রই চৈতন্য হইবে।

কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়া স্বমুখা-নালমধ্যে প্রবেশ করিলে সাধক স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে। সেই সময় পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডমধ্যে পিপীলিকা পরিভ্রমণের ন্যায় সির সির করিবে।

† কিরূপে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিতে হয়, তাহার ক্রিয়া .মৎ প্রণীত “জ্ঞানীশ্বর” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

লয়যোগ সাধন

যাহাদের সময় অল্প এবং যোগের নিয়ম পালনে অক্ষম, তাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিয়া পশ্চাল্লিখিত যে কোন লয়যোগ সাধন করিলেই চিত্ত লয় হইবে। বাহ্যলভয়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিতে পারিলাম না। তবে যে কয়টা লয়-সঙ্কেত লিখিলাম, ইহার মধ্যে যে-কোন এক প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া মনোলায় করিবে। ইহা অতি সহজ, স্বল্পায়াসসাধ্য এবং শীঘ্র ফলপ্রদ।

১। মূলাধারচক্রে ভগাকৃতি; এই চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে তেজোরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি সার্বত্রিকবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া অধিষ্ঠিতা আছেন। ঐ জ্যোতির্শ্রমী শক্তিকে জীবরূপে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও মুক্তি হইয়া থাকে।

২। স্বাধিষ্ঠানচক্রে প্রবালান্দুরসদৃশ উড্ডীয়ান নামক পীঠোপরি কুণ্ডলিনীশক্তিকে চিন্তা করিলে মনোলায় হয় এবং জগৎ-আকর্ষণের শক্তি জন্মে।

৩। মণিপুরচক্রে পঞ্চাবর্ত্তবিশিষ্ট বিদ্যুদ্বরণী চিৎস্বরূপা ভুজগী-শক্তির ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সর্বসিদ্ধিভাজন হয়।

৪। অনাহতচক্রে জ্যোতিঃস্বরূপ হংসকে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও জগৎ বশীভূত হয়।

৫। বিশুদ্ধচক্রে নির্মল জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে সর্বসিদ্ধি হয়।

৬। তালুমূলে ললনাচক্কে ঘণ্টিকাস্থান ও দশমদ্বার মার্গ কহে। এই চক্রে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়।

৭। আজ্ঞাচক্রে বর্ত্তুলাকার জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। ব্রহ্মরন্ধ্রে অষ্টম চক্রস্থিত সূচিকার অগ্রতুল্য ধূম্রাকার জালন্ধর নামক স্থানে ধ্যানদ্বারা চিত্তলয় করিলে নির্বাণপদ লাভ হয়।

৯। সোমচক্রে পূর্ণা সচ্চিদ্রূপা অর্দ্ধশক্তিকে ধ্যান করিলে মনোলয় ও মোক্ষপদ লাভ হয়।

এই নবচক্রের মধ্যে এক একটা চক্রের ধ্যানকারী সাধকগণের সিদ্ধি ও মুক্তি করতলগত। কারণ তাঁহারা জ্ঞাননেত্র দ্বারা কোদণ্ডদ্বয়মধ্যে কদম্বতুল্য গোলাকার ব্রহ্মলোকদর্শন এবং অন্ত্রে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি ঋষিগণ নবচক্রে লয়যোগ সাধন করিয়া যমদণ্ড খণ্ডন পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। যথা—

কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মৈস্তু সাধিতো লয়সংজ্ঞিতঃ ।

নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহান্বভিঃ ॥

—যোগশাস্ত্রঃ

অর্থাৎ বেদব্যাসাদি মহাআগণ নবচক্রে মনোলয় করিয়া লয়যোগসাধন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও বহুবিধ লয় ও লক্ষ্যযোগসংকেত শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—

১০। পরম আনন্দের সহিত স্বীয় হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবতার মূর্তি ধ্যান করিলে আত্মলীন হয়।

১১। নির্জ্ঞান স্থানে শববৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া একাগ্রচিত্তে নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া ধ্যান করিলে শীঘ্রই চিত্ত লয় হয়। ইহা চিত্ত লয় করিবার প্রধান ও সহজ উপায়।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে, অনেক লোককে ‘মুখচাপায়’ ধরে। তখন বোধ হয়, যেন বৃকের উপর কেহ চাপিয়া বসিয়া আছে,

শরীর ভারী বোধ হয়, ভয়ে চীৎকার করিতে গেলে স্পষ্ট কথা বাহির না হইয়া গৌঁ গৌঁ শব্দ করে। ইহাতেই লয়যোগের আভাস পাওয়া যায়।

১২। জিহ্বাকে তালুমূলে সংলগ্ন করিয়া উদ্ধর্গত করিয়া রাখিবে। ইহাতে চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমপদে লীন হয়।

১৩। নাসিকোপরি দৃষ্টি স্থির করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি পীতবর্ণ কিম্বা অষ্টাঙ্গুল রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে চিত্ত লয় ও বায়ু স্থির হয়।

১৪। ললাটোপরি শরচ্ছত্রের ত্রায় শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে মনোলয় ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

১৫। দেহমধ্যে নির্ঝাঁত নিকম্প দীপকলিকার ত্রায় অষ্টাঙ্গুল জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে জীব মুক্ত হয়।

১৬। হৃদয়মধ্যে সূর্য্যের ত্রায় তেজঃপুঞ্জ ধ্যান করিলে ঈশ্বর-সন্দর্শন লাভ হয়।

ইহার মধ্যে যাহার যেরূপ ক্রিয়াটী স্রবিধা বোধ হয়, সে সেইরূপে মনোলয় করিবে।

শব্দশক্তি ও নাদ-সাধন

শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষমূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃ মাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভ কালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদভাবে নাদবিন্দুরূপে প্রকাশমান হন। বিন্দু পরম শিব আর কুণ্ডলিনী নির্ঝাঁকলারূপা ভগবতী ত্রিপুরাদেবী স্বয়ং নাদরূপা। যথা—

আসীদ্বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা ।

নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমা কলা ॥

—বায়বী সংহিতা

আদি প্রকৃতিদেবীর নাম পরাপ্রকৃতি ; সূতরাং পরাপ্রকৃতি আত্মাশক্তিই নাদরূপা । এই প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয় । প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হয় । আকাশের গুণ শব্দ, অতএব সৃষ্টির পূর্বে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । শব্দ হইতে ক্রমে অগ্নি মহাভূত এবং এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হয় । এই জগৎ শাস্ত্রকারগণ “নাদাত্মকং জগৎ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তবেই দেখ, শব্দ কি প্রকার ক্ষমতাশালী ! যোগবলশালী ঋষিগণের হৃদয় হইতে শব্দ গ্রথিত ও মন্ত্ররূপে উদ্ভূত হইয়া এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বীৰ্য্যশালী হইয়াছে । শব্দ দ্বারা না হয় কি ? একজন বয়স্কগণের সহিত আমোদ-আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছে, এমন সময় যদি অদূরে করুণ ক্রন্দনধ্বনি উদ্ভূত হয়, তবে কখনও স্থিরচিত্তে আমোদে মত্ত থাকিতে সক্ষম হইবে না । আমি একজনকে ভালবাসি না, সে যদি কাতরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে আমার স্তব করে, নিশ্চয়ই আমার কঠিন হৃদয় দ্রব হইবে । শব্দেই সকলে পরস্পর আবদ্ধ । কোকিলের কুহ শব্দ শুনিলে, ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ধ্বনি কর্ণগোচর হইলে মনে কোন্ এক অজানা আকাজ্জক জাগিয়া উঠে, কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের পুরাতন কাহিনী মনে আইসে । আবার মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন, ময়ূরের কেকারব, ইহা শ্রবণে অগ্নি প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, মন কোন্ অমূর্ত্ত প্রতিমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ফেলে । শব্দই সঙ্গীতের প্রাণ ; তাই গান শুনিয়া লোক আত্মহারা—পাগলপারা হইয়া যায় । শব্দে জীব মোহিত হয়, শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত ; হরি এবং হরও নাদ হইতে ভিন্ন নহেন ।

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ ।

নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরো হরিঃ ॥

নাদের অন্ত নাই, অসীম, অপার । তাই হিন্দু-শাস্ত্রকর্তা বলিয়াছেন—

নাদাক্ষেপ্ত পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী ।

অত্ৰাপি মজ্জনভয়াং তুষ্ণং বহতি বক্ষসি ॥

কথাটা প্রকৃত বটে । নাদানুসন্ধানকারী তত্ত্বজ্ঞানী যোগী এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন । নাদরূপ সমুদ্রের পরপার যখন সরস্বতীর অজ্ঞাত, তখন মৎসদৃশ সামান্ত ব্যক্তির নাদের স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ।

নাদের অত্র নাম পরা । এই পরা মূলধারে, স্বাধিষ্ঠানে পশুন্তি, হৃদয়ে মধ্যমা এবং মুখে বৈথরী ।

আহেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাঅনা স্থিতম্ ।

ব্যক্তয়ে স্বস্ত্য রূপস্ত শব্দেহন নিবর্ততে ॥

—বাক্যপদীয়

সূক্ষ্ম বাগাঅ্যাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান, স্বীয় রূপের অভিব্যক্ত্যর্থ শব্দরূপে বৈথরী অবস্থায় নিবর্তিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ আমাদের সূক্ষ্ম বাগাঅ্যাতে যে আন্তরজ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইলে সেই অব্যক্ত আন্তরজ্ঞান প্রব্যক্ত হইয়া বৈথরী অবস্থায় মুখে প্রকাশ পায় ।

মূলধার পদ্য হইতে প্রথম উদিত নাদরূপ বর্ণ উখিত হইয়া হৃদয়গামী হইয়াছে । যথা—

স্বয়ং প্রকাশ্যা পশুন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ ।

সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী ॥

হৃদয়স্থ অনাহত পদে এই নাদ স্বতঃই উদ্ভিত হইতেছে। অন্+আহত—অনাহত; অর্থাৎ বিনা আঘাতে ধ্বনি হয়, এই বলিয়া হৃদয়স্থিত জীবাধারপদের ‘অনাহত’ নাম হইয়াছে। সদৃশক অভাবে নিজের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন বিষয়বিমূঢ় মন ঐ নাদধ্বনি উপলব্ধি করিতে পারে না। স্মৃতিমান সাধকগণ লিখিত কৌশল অবলম্বনে ক্রিয়া অহুষ্ঠান করিলে স্বতঃউদ্ভিত অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসামাগ্র অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। এই প্রক্রিয়ায় অতি সহজে ও শীঘ্রই মনোলায় করা যায় এবং মুক্তিপদ লাভ হয়।

যতপ্রকার লয়যোগ আছে, তন্মধ্যে এই নাদ-সাধন প্রধান। ক্রিয়াও অতি সহজ এবং সুখসাধ্য। শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

নাদানুসন্ধানং সমাধিমেকং মন্ত্যামহে অন্ততমং লয়ো নাম ।

যথানিয়মে সাধন করিলে নাদধ্বনি সাধকের শ্রুতিগোচর হয় এবং সমাধিভাবে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে। এই নাদতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত যোগীশ্বর। যথা—

যো বা পরাঞ্চ পশুন্তীং মধ্যমামপি বৈখরীম্ ।

চতুষ্টয়ীং বিজানাতি স গুরুঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

—নবচক্রেখর

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরা, পশুন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী প্রভৃতি নাদতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। এইরূপ গুরুর নিকট যোগোপদেশ লইয়া সাধন করিবে; নতুবা ভড়ং-ভড়ং দেখিয়া বা বচন-রচন শুনিয়া ভুলিলে নিশ্চয়ই ঠিকিতে হইবে।

নাদতত্ত্বের যেটুকু আভাস দিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, নাদই আত্মশক্তি। পূর্বেও অত্যাশ্চর্য্য শীর্ষকে বলিয়াছি, তপ, জপ বা সাধন-ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য—কুণ্ডলিনী-শক্তির চৈতন্য সম্পাদন। অতএব শৈব, বৈষ্ণব বা গাণপত্য প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায় গোঁড়ামি করিয়া যতই বড়াই করুক, প্রকারান্তরে সকলেই শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে। “শক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই”—এই প্রবাদবাক্য তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কয়টি লোক জানে? জানিলে আর গোঁড়ামি করিয়া নরকের পথ পরিত্যক্ত করিত না। আমি জানি, বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকে শক্তি-মূর্ত্তিকে প্রণাম এবং তৎনিবেদিত প্রসাদাদি গ্রহণ করেন না। কি মূর্থতা! প্রকৃতি-পুরুষ এক। স্তবরাং ভগবান্ এবং দুর্গা-কালী প্রভৃতি সকলেই অভিন্ন—এক। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গাদি সকলকেই অভেদ-ভাবে এক জ্ঞান না করিলে সাধনার ধারেও বাইবার উপায় নাই! শাস্ত্রে উক্ত আছে—

নানাভাবে মনো যস্ত তস্ত মোক্ষো ন বিদ্যতে ।

যাঁহার মন ভেদজ্ঞানযুক্ত, তাঁহার মুক্তি হয় না। আবার দেখুন—

নানা তন্ত্বে পৃথক্ চেষ্টা ময়োক্তা গিরিনন্দিনি ।

ঐক্যজ্ঞানং যদা দেবি তদা সিদ্ধিমবাগ্নুয়াং ॥

—মহানির্ঝণতন্ত্র, ৬ পৃঃ

হে গিরিনন্দিনি, নানা তন্ত্বে আমি পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াছি। যে ব্যক্তি তাহা এক ভাবিয়া অভিন্ন জ্ঞান করিবে, তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে। নিজ মুখে বলিয়াছেন—

শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্মায় কল্পতে ।

হে দেবি ! শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিকামনা হাশ্রজনক ও বৃথা ।
এই শক্তি বৈরাগীদিগের মহিমাস্বিতা মাতাজী মহাশয়ারা নহে, সেই
নির্বাণপদবিধায়িনী আত্মাশক্তি ভগবতী কুণ্ডলিনী । ইহার স্বরূপতত্ত্ব
বর্ণনা সাধ্যাতীত ।

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ।

তস্মৈ সর্বস্মৈ বা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তুয়সে তদা ॥

—চণ্ডী

জগতে সদস্য যে কোন বস্তুর শক্তিই সেই আত্মাশক্তির শক্তিস্বরূপা ।
সুতরাং সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা ব্রহ্মজ্ঞানবিনোদিনী কুলকুঠারঘাতিনী
কুলকুণ্ডলিনীশক্তির স্বরূপশক্তি বর্ণনা করিবার শক্তি আমার
নাই । অতএব পাঠকগণের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া
সেই চতুর্বর্ণস্বরূপা, খেচরীবায়ুরূপা, সর্বশক্তিধরী, মহাবুদ্ধিপ্রদায়িনী,
মুক্তিদায়িনী, প্রসুপ্তা ভুজগাকারা কুণ্ডলিনীশক্তির আরাধনা করা
সকলেরই কর্তব্য ।

পর্যাপ্রকৃতি আত্মাশক্তিই নাদরূপা । সুতরাং হৃদয়ে জীবিত পদ
হইতে স্বতঃ উথিত অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাধকগণ পরমানন্দ ভোগ
ও মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে । শাস্ত্রকারগণ বলেন—

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ ।

মারুতস্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাস্থিতঃ ॥

—হঠযোগপ্রদীপিকা

মনই ইন্দ্রিয়গণের কর্তা, কারণ মনঃসংযোগ না হইলে কোন
ইন্দ্রিয়ই কার্যক্ষম হয় না । মন প্রাণবায়ুর অধীন । এজন্ত বায়ু
বশীভূত হইলেই মন লয়প্রাপ্ত হয় । মন লয় হইয়া নাদে অবস্থিতি

করে। নাদ অর্থে অনাহত ধ্বনি। যে পর্য্যন্ত না জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগপ্রাপ্তি হয়, সেই পর্য্যন্ত অনাহতধ্বনির নিবৃত্তি হয় না। যোগের চরম সীমায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে ঐ অনাহতধ্বনি পরব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে।

“শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তি র্ন সংশয়ঃ।”

—যোগতারাবলী

অতএব অশ্রুতপূর্ব্ব এই অনাহত নাদ শ্রবণ করিলে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, পাঠকগণ এইসকল অবগত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাদসাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

নাদসাধনের সহজ উপায় এই—

পূর্ব্বোক্ত যে কোন কৌশলে কুণ্ডলিনী চৈতন্য ও ব্রহ্মমার্গ পরিষ্কার হইলে নাদ-সাধন আরম্ভ করিবে।

প্রথমতঃ ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বায়ু নাসিকার দ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ফুসফুসে বায়ু পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ সময়েই স্নায়ু প্রবাহে মনঃসংযোগ করিয়া ভাবিতে হইবে, যেন ঐ স্নায়ুপ্রবাহটি ইড়ানাড়ীর ভিতর দিয়া নিম্নদিকে নামিয়া কুণ্ডলিনীশক্তির আধারভূত মূলাধারপদ্মের সেই ত্রিকোণপীঠের উপর দৃঢ়রূপে আঘাত করিতেছে। এইরূপ করিয়া ঐ স্নায়ুপ্রবাহকে কিয়ৎক্ষণের জন্ত ঐ স্থানেই ধারণ কর। তদনন্তর চিন্তা কর যে, সেই সমস্ত স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহকে স্থানের সহিত অপর দিকে টানিয়া লইতেছ। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রত্যহ উষাকালে একবার, মধ্যাহ্নকালে একবার এবং সায়ংকালে একবারে করিতে হইবে। আর অর্দ্ধরাত্রিকালে ঐরূপ ফুসফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণরন্ধ্রযুগল বন্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে।

যথাশক্তি ধারণ করিয়া অল্পে অল্পে রেচন করিবে। পুনঃ পুনঃ ধারণ করিতে করিতে ক্রমাভ্যাসে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাত্তরস্থ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে।

যে কুণ্ডলিনী-চৈতন্য বা ঐসকল ক্রিয়া গোলযোগ মনে করে, তাহার পক্ষে আরও সহজ উপায় আছে। যথা—

নাভ্যাধারো ভবেৎ ষষ্ঠ স্তত্র প্রাণঃ সমভ্যাসেৎ।

স্বয়মুৎপত্ততে নাদো নাদতো মুক্তিরন্ততঃ ॥

—যোগ-স্বরোদয়

যোগসাধনোপযোগী স্থানে যে কোন আসনে মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড সোজা করিয়া উপবেশন পূর্বক একাগ্রচিত্তে ও নিশ্চিন্ত মনে নাভির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। এইরূপ নাভিস্থানে দৃষ্টি ও মন রাখিলে ক্রমে নিঃশ্বাস ছোট হইয়া কুণ্ডক হইবে। প্রত্যহ যত্নের সহিত দিবা-রাত্রির মধ্যে তিন-চারিবার ঐরূপ অভ্যাস করিলে কিছুদিন পরে স্বয়ং নাদ উত্থিত হইবে। অল্পে অল্পে বায়ু ধারণ করিলে নাদধ্বনি অতি শীঘ্রই শ্রুতিগোচর হয়।

এই দুই রকম কৌশলের যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই কৃতকার্য হইবে। প্রথমে ঝিল্লীরব অর্থাৎ ঝিঁঝিপোকা যেমন ভাবে ডাকে, সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইবে। তৎপরে ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে একে একে বংশীরব, মেঘগর্জ্জন, বাঁঝরীবাঁজের ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জন, ঘণ্টা, কাংস্ত, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাঁজের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইতে থাকে।

এইরূপ শব্দ শুনিতে শুনিতে কখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কোন শব্দ শুনিলে মাথা ঘুরিতে থাকে, কোন সময় কণ্ঠকূপ জলপূর্ণ হয়,

কিন্তু সাধক কিছুতেই ভ্রক্ষেপ না করিয়া আপন কার্য্য করিতে থাকিবে। মধুপানার্থী মধুকর যেমন প্রথমে মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মধুপান করিবার সময় মধুর স্বাদে একরূপ নিমগ্ন হয় যে, তখন তাহার আর গন্ধের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না, তদ্রূপ সাধকও নাদধ্বনিতে মোহিত না হইয়া শব্দ শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় করিবে।

ঐরূপ আরও অভ্যাসে হৃদয়াভ্যন্তর হইতে অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও তাহা হইতে ঐ দ্রুত প্রতিশব্দ শ্রুতিগোচর হইবে। তখন সাধক নয়ন নিমীলিত করিয়া অনাহতপদাঙ্কিত বাণলিঙ্গ শিবের মস্তকে নির্ঝাঁত নিষ্কম্প দীপশিখার ত্রায় জ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। ঐরূপ ধ্যান করিতে করিতে অনাহতপদাঙ্ক প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিবে।

অনাহতশ্চ শব্দশ্চ তশ্চ শব্দশ্চ যো ধ্বনিঃ ।

ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ ॥

—গোরক্ষ-সংহিতা।

সেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে সাধকের মন সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরম পদে লীন হইবে। তখন শব্দ রহিত এবং মন আত্মতত্ত্বে মগ্ন হইবে। সাধক সর্ব্বব্যাধিবিমুক্ত ও তেজযুক্ত হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। সেই সময়ের সেই ভাব অনির্ব্বচনীয় ! অবর্ণনীয় !! অলেখনীয় !!!

আত্মজ্যোতিঃ দর্শন

জ্যোতিঃই ব্রহ্ম । সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র জ্যোতিঃ ছিল । পরে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন হয় ।

স ব্রহ্মা স শিবো বিষ্ণুঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ ।

সর্বৈ ক্রীড়ন্তি তত্রৈতে তৎসর্বৈন্দ্রিয়সম্ভবম্ ॥

সেই স্বপ্রকাশরূপী অঙ্কর পরমজ্যোতিঃই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিববাচ্য । নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই জ্যোতির্মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য কিছু, তৎসমস্তই ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন । এই জ্যোতিঃই আত্মরূপে মানবদেহের অভ্যন্তরে সর্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । আত্মা ব্রহ্মরূপ হইয়াও মায়াপ্রভাবে বিষয়াসক্ত বলিয়া নিজেকে নিজে জানেন না । পরমব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা সর্বদেহেই বিরাজ করিতেছেন । যথা—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।

কন্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥

—শ্রুতি

একদেব পরমাত্মা সর্বভূতে গূঢ় অধিষ্ঠিত । তিনি সর্বব্যাপী সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতাধিবাস, সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল ও নিগুণ । যেমন হৃদ্মধ্যে মাখন, পুষ্পের অভ্যন্তরে স্নগন্ধ এবং কাষ্ঠে অগ্নি নিহিত থাকে, তদ্রূপ দেহমধ্যে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন ।

সকল মানবেরই প্রকাশ্য হই চক্ষু ভিন্ন আর একটা গুপ্ত নেত্র আছে। সেই তৃতীয় নেত্রের নাম গুরুনেত্র। যোগসাধন দ্বারা চিত্ত নির্মল ও স্থির হইলে ঐ গুরুনেত্র প্রকাশিত হয়; তখন ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বহু দূর-দূরান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আজ্ঞাচক্রোদ্ধে নিরালম্বপুরীতে ঈশ্বরসন্দর্শন বা ইষ্টদেব দর্শন কিম্বা কুণ্ডলিনীর স্বরূপরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান-নেত্রদ্বারাই দেহস্থিত ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ দর্শন করা যায়। যথা—

চিদাত্মা সর্বদেহেষু জ্যোতীরূপেণ ব্যাপকঃ।

তজ্জ্যোতিশ্চক্ষুরগ্রেষু গুরুনেত্রেণ দৃশ্যতে ॥

—যোগশাস্ত্র

চিদাত্মা জ্যোতিঃরূপে সকল দেহেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন; গুরুনেত্র দ্বারা চক্ষুর অগ্রভাগে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই আত্ম-জ্যোতিঃ সর্বদা শান্ত, নিশ্চল, নির্মল, নিরাধার, নির্বিকার, নির্বিকল্প ও দীপ্তিমান্। হৃদ্ধ মন্থন করিয়া যেমন নবনীত উত্তোলন করা যায়, সেইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শন হইলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্বপ্রবত্তে আত্মদর্শন করা কর্তব্য, শাস্ত্র-বাক্য এই—

আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ।

অর্থাৎ আত্মদর্শন মাত্রে মানবনিচয় নিশ্চয় জীবমুক্ত হয়। অতএব সকলেরই আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা উচিত। অত্যাশ্রয় প্রকার যোগসাধন অপেক্ষা আত্মজ্যোতিঃদর্শনক্রিয়া সহজ ও সুখসাধ্য। সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতিঃ দর্শনের উপায় এই—

যোগসাধনোপযোগী স্থানে, সাধক স্থিরচিত্তে যথানিয়মে আসনে (যাহার যে আসন উত্তমরূপে অভ্যাস আছে) উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরক্ষিত শুক্লাঞ্জে গুরুর ধ্যানানন্তর প্রণাম করিবে। গুরুকৃপা ব্যতীত জ্যোতিরূপ আশ্রদর্শন হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে—

অনেকজন্মসংস্কারাৎ সদগুরুঃ সেব্যতে বুধৈঃ ।

সম্ভৃষ্টঃ শ্রীগুরুর্দেব আশ্ররূপং প্রদর্শয়েৎ ॥

—যোগশাস্ত্র

বহুজন্মান্তরের সংস্কারবশতঃ পণ্ডিতব্যক্তি সদগুরুর সন্তোষ সাধন করিলে, গুরুকৃপায় আশ্ররূপ দর্শন করিয়া থাকে। অতএব গুরুধ্যান ও প্রণামানন্তর মনঃস্থির পূর্বক মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্থায় শরীরকে সোজা করিয়া উপবেশন করিবে। পরে নাভিমণ্ডলে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, উড্ডীয়ানবন্ধ সাধন করিবে। অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত অপানবায়ুকে গুহ্যদেশ হইতে উত্তোলনপূর্বক নাভিদেশে কুন্তক দ্বারা ধারণ করিবে। যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ করিতে হইবে।

ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ ।

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৩ পৃঃ

ঐরূপ মানস-যোগ ত্রিসন্ধ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহুর্তে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে এই তিন সময়ে ঐরূপে নাভিদেশে বায়ু ধারণ করিবে। বাবৎ নাভিস্থিত অগ্নিকে জয় করিতে পারা না যায়, তাবৎ অনন্তমনে ঐরূপ অমুষ্ঠান করা কর্তব্য।

নাভিকমল হইতে তিনটি নাড়ী তিন দিকে গমন করিয়াছে। একটা উর্দ্ধমুখে সহস্রদলপদ্ম পর্য্যন্ত, আর একটা অধোমুখে আধারপদ্ম পর্য্যন্ত, অত্র একটা মণিপূরপদ্মের নালস্বরূপ। এই নাড়ী স্বষ্টি-

মধ্যস্থিত মণিপুরপদ্বের সহিত একরূপ ভাবে সংযুক্ত যে, মনে হয় যেন মণিপুরপদ্বনালাে নাভিপদ্ব অবস্থিত। এই জন্ত সর্বপ্রকার যোগসাধনের সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা নাভিপদ্বধ্যান। নাভিদেশ হইতে সাধন আরম্ভ করিলে শীঘ্র সফল পাওয়া যায়। নাভিস্থানে বায়ু ধারণ করিলে প্রাণ ও অপানবায়ুর একত্ব হয় এবং কুণ্ডলিনী সুষুম্নাদ্বার পরিত্যাগ করেন, তখন প্রাণবায়ু সুষুম্নামধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

প্রথম ক্রিয়া নাভিস্থান হইতে আরম্ভ না করিলে কৃতকার্য হইতে পারা যায় না। অনেকে প্রথম হইতে একদম আজ্ঞাচক্রে ধ্যান লাগাইতে উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল। আমি যোগ-ক্রিয়া আলোচনায় যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি—“ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার স্থায়” একেবারে ঐরূপ করিতে যাইলে কখনই মনঃস্থির, চিত্তের একাগ্রতা কিম্বা কুণ্ডলিনী-চৈতন্য হইবে না। যাহারা প্রকৃত সাধনাভিলাষী, তাহারা নাভি হইতে কার্য আরম্ভ করিবে; তাহা হইলে ফলও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিতে পারিবে।

নিত্য নিয়মিতরূপে ঐরূপ নাভিস্থানে বায়ু ধারণ করিলে প্রাণ-বায়ু অগ্নিস্থানে গমন করিবে। তখন অপানবায়ুদ্বারা শরীরস্থ অগ্নি ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। ঐরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে আট-দশ মাসের মধ্যেই নানাবিধ লক্ষণ অল্পভূত হইবে। নাদের অভিব্যক্তি, দেহের লঘুতা, মলমূত্রের ত্রুস্বতা এবং জঠরাগ্নির দীপ্তি ইত্যাদি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। নিয়মিতরূপে প্রত্যহ ঐরূপ অল্পস্থান করিতে পারিলে তিন-চারিমাসের মধ্যেও উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

উপরোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশিত হইলেও নাভিস্থানে কুস্তক করিয়া প্রস্তুত নাগেন্দ্রের ত্রায় পঞ্চাবর্তা বিদ্যাদ্বরণা কুণ্ডলিনীর ধ্যান

করিবে। ঐরূপ বায়ু ধারণ ও কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে, কুণ্ডলিনী অগ্নিকর্তৃক সন্তাপিত বায়ুদ্বারা প্রসারিত হইয়া ফণা বিস্তারপূর্বক জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। যতদিন মন সম্পূর্ণভাবে নাভিহানে সংলীন না হয়, তাবৎ এইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধমুখে চালিত হইলে প্রাণবায়ু সুষুমা-মধ্যে গমন করিবে এবং সমস্ত বায়ু মিলিত হইয়া অগ্নির সহিত সর্ব শরীরে বিচরণ করিতে থাকিবে। যোগীগণ এই অবস্থাকে “মনোময়নী” সিদ্ধি বলেন। এই সময় নিশ্চয়ই সর্বব্যাপি বিনষ্ট ও শরীরে বলবৃদ্ধি এবং কখন কখন সমুজ্জল দীপশিখার ত্রায় জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে। ঐরূপ লক্ষণ অনুভূত হইলে তখন নাভিস্থল ত্যাগ করিয়া অনাহতপদে কার্য আরম্ভ করিবে। এখানেও প্রত্যহ ত্রিসঙ্খ্য। যথানিয়মে আসনে উপবিষ্ট হইয়া মূলবন্ধ সাধন করিবে। অর্থাৎ মূলধার সঙ্কোচ পূর্বক অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া প্রাণবায়ুর সহিত ঐক্য করিয়া কুস্তক করিবে। প্রাণবায়ু হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ হইলে পদ্মসমুদয় উর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। অনাহতপদে বায়ু ধারণা অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণবায়ু অনাহতপদে প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইবে। সেই সময় ভ্র-যুগলের মধ্যস্থান পর্যন্ত সুষুমা-বিবরে নবজলদজালে সৌদামিনীর ত্রায় জ্যোতিঃ সর্বদা প্রকাশ হইতে থাকিবে; সাধকের নয়ন নিমীলিত বা উন্মীলিত, সর্বাবস্থায় অন্তরে ও বাহিরে নির্বাত দীপকলিকার ত্রায় জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হইবে।

উক্ত লক্ষণ এবং অত্যাশ্র লক্ষণসকল সুস্পষ্ট বৃত্তিতে পারিলে বীজমন্ত্র (ব্রাহ্মণগণ প্রণব উচ্চারণ করিলেও পারেন) উচ্চারণ করিতে করিতে সান্নি প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ পূর্বক ভ্র-যুগলের মধ্যস্থিত আজ্ঞা-চক্রে আরোপিত করিয়া আত্মাকে ধ্যান করিবে। আজ্ঞাচক্রে বায়ু

নিরোধপূর্বক এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত একবারে লয়প্রাপ্ত হইবে। এই সময় সহস্রাবিগলিত অমৃতধারায় সাধকের কণ্ঠকূপ পূর্ণ হইবে—ললাটে বিদ্যুৎসদৃশ সমুজ্জ্বল আত্মদর্শন লাভ হইবে। তখন দেবতা, দেবোত্তান, মূনি, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য সাধকের নয়ন-পথে পতিত হইবে। সাধক অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দে মগ্ন হইবে। ফলে গুরুকৃপায় এই সময়ের ভাব যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, সে অব্যক্ত ভাব লেখনী সাহায্যে ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভুক্তভোগী ভিন্ন সে ভাব অন্তের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

যে পর্য্যন্ত কোদণ্ডমধ্যে চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংলীন না হয়, তাবৎ যথানিয়মে পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ ও ললাটমধ্যে বীজমন্ত্ররূপ পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় আত্মজ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। ক্রমশঃ উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সাধক কামকলার ত্রিবিন্দুর সহিত মিশিয়া যাইবে এবং ললাটস্থিত উর্দ্ধবিন্দু বিকশিত হইবে। আর চাই কি? মানব-জীবন ধারণ সার্থক! জ্ঞান-উপার্জন সার্থক!! সাধন-ভজন সার্থক!!!

যাহাদের মস্তিষ্ক সবল এবং মস্তিষ্ক ও চক্ষুর কোন পীড়া নাই, তাহারা আরও সহজ উপায়ে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পার। রাত্রিকালে গৃহের ভিতরে নির্ঝাঁত স্থানে সোজা হইয়া উপবেশন করিয়া আপন আপন চক্ষুর সমস্ত্রপাতে (যে কোন উচ্চ আধারে) মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রদীপ সর্ব্বপ কিস্বা রেড়ীর তৈলদ্বারা জালিয়া রাখিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরুর ধ্যান-প্রণামান্তর ঐ দীপালোক স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে; যতক্ষণ চক্ষুতে জল না আইসে, ততক্ষণ চাহিয়া রহিবে। ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃষ্টি দৃঢ় হইবে, তখন একটা মটর সদৃশ নীলবর্ণের জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে।

ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে ঐ দীপালোক হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিয়া যেদিকে চাহিবে, দৃষ্টির অগ্রে ঐ নীল জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে। তখন সাধক নয়ন মুদ্রিত করিয়াও ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে মনঃস্থিরের জন্ত কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নাভিস্থানে চাহিয়া থাকিতে হয়।

ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অন্তরে ও বাহিরে নীল বর্ণের জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে, তখন অনন্তমনে ঐ দৃষ্টি হৃদয়ে আনিবে। তথা হইতে নাসাগ্রে, তৎপরে জ্বর মধ্যস্থলে আনিবে। ভ্রমধ্যে দৃষ্টি স্থির হইলে শিবনেত্র করিবে। শিবনেত্র করিয়া যখন চক্ষুর তারা কতকাংশ কিম্বা সম্পূর্ণ উন্টাইয়া যাইবে, তখন তড়িৎসদৃশ দীপ-কলিকাকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। চক্ষুর তারা উন্টাইতে প্রথম কিছু অন্ধকার দৃষ্ট হইবে, কিন্তু সাধক তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে কিছুক্ষণ পরেই ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। পরমাত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া শান্তচিত্ত ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। জলমধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্বপানে দৃষ্টি সাধন করিয়াও ঐরূপ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা যায়। যদি কেহ—

ইচ্ছাদেবতা দর্শন

করিতে ইচ্ছা করে, তবে সামান্য চেষ্টাতেই কৃতকার্য হইতে পারিবে। সাধন-প্রণালী অল্প কিছুই নহে—চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি যত্ন ও অভ্যাসের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা

একত্র করা যায়, ক্রম-সঙ্কোচ-প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলেই সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত চিত্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু মাত্রেই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে। এইরূপে যে কোন বস্তুতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলে তাহা ধোয়াকারে পরিণত হইয়া ছদয়ে উদ্ভিত হয়। পূর্বোক্ত আত্মজ্যোতিঃ দর্শন-প্রণালীর যে কোন ক্রিয়া অহুষ্ঠান করিয়া কৃতকার্য হইলে, যখন জ্বর মাঝারে জ্যোতিঃশিখা দেখিতে পাইবে এবং চিত্ত শান্ত হইবে, তখন গুরুপদটি ইষ্টমূর্তি চিন্তা করিতে করিতে আত্ম ধোয়াহরূপ মূর্তিতে জ্যোতিঃ-মধ্যে প্রকাশিত হইবেন। এইরূপে কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, শিব, গণপতি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ, শিব-দুর্গার যুগলরূপ প্রভৃতি ঐ জ্যোতিঃ-র মধ্যে দর্শন করিতে পারা যায়।

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেও ইষ্টদেব কিম্বা অপর দেবদেবী দর্শন হইয়া থাকে। কারণ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আমাদের ভজনীয় পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। যথা—

ধ্যোয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিজ-আসনে আমাদের ধোয় নারায়ণ অবস্থিতি করেন। আমরা গায়ত্রী দ্বারাও তাঁহাকে সবিতৃমণ্ডলমধ্যস্থ বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকি। ঋগ্বেদেও এই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী পরমপুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য অনেক আলোচনা হইয়াছে। যথা—

ইহ ত্রবীতু য ইমং গাং বেদান্ত্র বামস্ত্র নিহিতং পদং বঃ ।

শীর্ষঃ স্কীরং দুহুতে গাবো অস্ত্র বত্রিং বাসনা উদকং পদাপুঃ ॥

—ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত

অর্থাৎ যে উন্নত আদিত্যের রশ্মিসমূহ বারি বর্ষণ করে এবং যিনি তাঁহার রূপ বিস্তার করিয়া রশ্মিদ্বারা উদক পান করেন, সেই আদিত্যের অন্তর্গত ভজনীয় পুরুষের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তিনি কে—
আমাকে শীঘ্র তাহা বলুন।

তবেই দেখ, সকলেরই ধ্যেয় পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে অবস্থিত আছেন। চেষ্টা করিলেই সাধক তাহা দর্শন করিতে পারিবে।
দর্শনের উপায় এই—

অগ্রে সাধক একদৃষ্টে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যাস করিবে। প্রথম প্রথম কষ্ট হইতে পারে; অভ্যাসে দৃষ্টি দৃঢ় হইলে নির্মল ও নিশ্চল জ্যোতিঃ নয়নে প্রতিভাত হইবে। তখন গুরুপদিষ্ট আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তি চিত্তা করিতে করিতে সূর্য্যের জ্যোতিঃমধ্যে ইষ্টদেবতার দর্শন পাইবে।

যাহাদের মস্তিষ্ক দুর্বল কিম্বা চক্ষুর কোন পীড়া আছে, তাহাদের সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টিসাধন করিতে নিষেধ করি। তাহারা প্রথমোক্ত প্রকারে ইষ্টদেব দর্শন করিবে।

অত্যাশ্র দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়োজন, তাহা হইতে অনেক কম চেষ্টাতেই রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন হইয়া থাকে। কারণ—ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধা; ইহারা সর্বদাই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সমস্ত জীব ব্যাপিয়া অবস্থিত। স্তত্রাং ভাব ও প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিলে, ভাব ও প্রাণ যুগলরূপে হৃদয়ে উদ্ভিত হইবেন। আবার কালী-সাধনায় আরও অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য লাভ করা যায়। কারণ—কালীদেবী আমাদের সর্বদা জড়িত।

অজ্ঞলোক হিন্দুধর্মের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারে না বলিয়াই হিন্দুকে জড়োপন্যাসক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া থাকে। তাহাদের দৃষ্টি চিরপ্রকৃত সংস্কারের শাসনে স্থূল গঠিত জড়-প্রাচীরের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক—জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকে। হিন্দুধর্মের গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাব ও দেবদেবীর নিগূঢ় তত্ত্ব হিন্দু যাহা বুঝে, তাহার ত্রিসীমানায় পহুঁছিতে অল্প ধর্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে। হিন্দু জড়োপন্যাসক, হিন্দু পৌত্তলিক কেন—তাহা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শী হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে সহুত্তর পাইতে পার। হিন্দুগণ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রিয়সম্ভব যাহা কিছু, তৎসমস্তেই ভগবানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন—তাই মৃত্তিকা, প্রস্তর, বৃক্ষ, পশ্বাদিতে পূজার আয়োজন করিয়াও ভগবানের বিরাট বিভূতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হিন্দু যে ভাবে বিভোর, জড়বাদীর তাহা হৃদয়ঙ্গম করা স্বকঠিন। হিন্দুধর্মের গভীর জ্ঞানাক্ষির উত্তাল তরঙ্গ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-গোষ্পদে প্রবাহিত করা যায় না ; বিশেষতঃ তাহা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। *

আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন

সাধক ! ইচ্ছা করিলে আপন ভৌতিক দেহের জ্যোতির্ময় প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পার। তৎসাধনপ্রণালীও অতি সহজ এবং সাধারণের করণীয়। আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শনের উপায় এই—

* মৎপ্রণীত “জ্ঞানীগুরু” গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের সবিশেষ গূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

গাঢ়াতপে স্প্রতিবিস্মীশ্বরং
 নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ম্ ।
 যদাহঙ্কনে পশ্চতি স্প্রতীকং,
 নভোহঙ্কনে তৎক্ষণমেব পশ্চতি ॥

যখন আকাশ নির্মল ও পরিষ্কার থাকিবে, সেই সময় বাহিরে রোদ্রে দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে আত্ম-প্রতিবিম্ব (ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্বক নিমেষোন্মেষবর্জিত হইয়া আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিবে। তাহা হইলে আকাশ-গাত্রে শুক্লজ্যোতির্বিশিষ্ট নিজের ছায়া দৃষ্টিগোচর হইবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে চক্ষুরেও আত্মপ্রতীক দৃষ্ট হইবে। তখন ক্রমশঃ আশে-পাশে চতুর্দিকে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে সাধক গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া থাকে।

রাতিতে চন্দ্রালোকেও এই ক্রিয়া সাধন করা যায়। যোগিগণ ইহাকে “ছায়া-পুরুষ-সাধন” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিয়া সাধক নিজের শুভাশুভ ও মৃত্যু-সময় সহজে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

দেবলোক দর্শন

সাধক ইচ্ছা করিলে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ব্রহ্মলোক, সূর্যালোক, ইন্দ্রলোক প্রভৃতি দেবলোক এবং দেবতাগণের গত লীলাও দর্শন করিতে পার। ক্ষুদ্র-হৃদয় অল্পজ্ঞানিগণ হয় ত একথা শুনিয়া উচ্ছ্বাসে

দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিবে,—“যাহা শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সাধুসন্ন্যাসী কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কণ্ঠে অবস্থিত, তাহা দর্শন করা যায় কি প্রকারে ? ইহা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র ॥”

অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে যাহাই বল, আমি জানি—তাহা দর্শন করা যায়। দেব-দেবীগণের লীলাকথা শাস্ত্রে পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে মানবের চিত্তে তাহার সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার ফল অল্পযায়ী দেব-মূর্ত্তির রূপ নিবদ্ধ হইয়া যায় ; তখন সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি তন্ময় ভাবে শ্রবণ করিয়া থাকে ; শ্রবণ করিতে করিতে সেই সকল বিষয় স্বপ্নে দৃষ্ট হয় ; তারপর জাগ্রত অবস্থাতেও সেই বিষয় তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। আর এক কথা—যাহা একবার হইয়াছে তাহা কখনও লুপ্ত হয় না, তাহার সংস্কার জগৎ আপন বক্ষে কত যুগ-যুগান্তর ধারণ করিয়া রাখে। তবে কথা এই যে, যে কার্য্য যত শক্তিশালী, তাহার সংস্কার তত প্রস্ফুট অবস্থায় থাকিয়া যায়। সাধনার বলে সেই সংস্কারকে জাগাইয়া দিলে আবার তাহা লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে।

সাধনায় চিত্তকে একমুখী করিতে পারিলে হৃদয়ে যে কম্পন উৎপাদিত হয়, সেই কম্পন ভাবের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, ভাব প্রস্ফুট হইয়া তাহার ক্রিয়াকে মূর্ত্তিমতী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করে। অতএব আপন চিত্ত অল্পযায়ী যে কোন দেবলোকের প্রতি মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারিলেই তাহা দর্শন করা যায়।

যোগসাধনে যাহাদের চিত্ত স্থির ও নির্মল হইয়া জ্ঞাননেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন বিষয়াসক্ত চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির দেব লোক বা গতলীলা দর্শন করা সহজসাধ্য নহে। দিব্যচক্ষু ব্যতীত ভগবানের ঐশ্বর্য্য কেহ দর্শন করিতে পারে না। গীতায় উক্ত

আছে—নানাবিধ যোগোপদেশেও যখন অৰ্জুনের ভ্রম দূরীভূত হইল না, তখন ভগবান্ বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিরাট মূর্তি অৰ্জুনের নয়ন-পথে পতিত হইল না। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুৰ্বা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

—গীতা ১১।৮

তবেই দেখ, শ্রীভগবানের প্রিয়সখা হইয়াও অৰ্জুন তাঁহার বিরাট বিভূতি দেখিতে পান নাই, অত্রে পরে কথা কি? পূর্ব পূর্ব সাধন করিয়া চিত্ত নির্মল ও একাগ্রতা সাধিত হইলে দেবলোক বা গতলীলা দর্শনের চেষ্টা করিতে হয়। দেবলোক দর্শনের উপায় এই—

“আত্মজ্যোতিঃ দর্শন” প্রণালীমতে সাধন করতঃ যখন চিত্ত লয় এবং ললাটে বিদ্যুৎ সদৃশ সমুজ্জ্বল আত্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, সেই সময় ঐ জ্যোতির্মধ্যে চিত্ত-অনুযায়ী যে কোন দেবলোক চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা-অনুযায়ী স্থান মূর্তিমৎ হইয়া আত্মজ্যোতির্মধ্যে প্রতিভাত হইবে।

সাধারণের জন্য আরও উপায় আছে—

এক খণ্ড ধাতু বা প্রস্তর সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি মনঃসংযোগ পূর্বক নির্গিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে এবং চিত্ত-অনুযায়ী দর্শনীয় স্থান চিন্তা করিবে। প্রথম প্রথম এক মিনিট দুই মিনিট করিয়া ক্রমে সময়ের দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে। ক্রমে দেখিবে, চিত্তের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান চিন্তানুযায়ী স্থানের ত্রায় সর্বশোভায় শোভাষিত হইয়াছে।

চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে জগতে তাহার অপ্রাপ্য ও দুঃসাধ্য কিছুই থাকে না। অনন্তমনা মন অনন্ত দিকে বিক্ষিপ্ত, সেই গতি রোধ করিয়া একদিকে চালিত করিতে পারিলে অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। ত্রায়ের মতে ইচ্ছা আত্মার গুণ।
যথা—

ইচ্ছাদেবপ্রযত্নমুখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গম্।

—ত্রায়-দর্শন

অতএব চিত্তকে একাগ্র করিয়া ইচ্ছাশক্তির সাধনবলে জগতে অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। ভারতীয় মুনি-ঋষিগণ মানবকে পাষাণে, কাঠের নোকাকে সোণার নোকায়, মুষিককে ব্যাঘ্রে পরিণত করিতেন—তাহাও এই সাধন-বলে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর রোগ আরোগ্য হয়, মানব বশীভূত হয়, গগনের গ্রহ-নক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন করা যায়, জ্যৈষ্ঠের দাবদন্ধ আকাশে নবীন নীরদমালা সৃষ্টি করা যায়, নবদ্বীপে বসিয়া বৃন্দাবনের সংবাদ আনান যায়, ফলে সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য করা যায়। পাশ্চাত্যদেশীয়গণ মেস্‌মেরাইজ, মিডিয়ম্, হিপনোটিজম্, মানসিক বার্তা-বিজ্ঞান, সাইকোপ্যাথি, ক্লায়ারভয়েন্স, প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া জীবজগৎ মোহিত ও আশ্চর্য্যাব্বিত করিতেছেন, তাহাও এই চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছা-শক্তির বলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাইওনিয়র নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক সেনেট সাহেব, থিয়োসোফিষ্ট্, সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিকা ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি (Madam Blavatsky) চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির সাধন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ডসকল সম্পাদন করতঃ মরজগতের মানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন,

তাহা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, দেবলোক দর্শন আর বেশী কথা কি ?

হিন্দুশাস্ত্রে ঐরূপ শত শত উদাহরণ থাকিতে বিদেশীয় উপমা লিপিবদ্ধ করায় কেহ যেন ক্ষুব্ধ হইও না ; বর্তমান যুগে এই প্রথা প্রচলিত। দেশীয় জু'ই-চামেলির আদর নাই, কিন্তু সেই ফুল বিদেশে যাইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে এসেন্স হইয়া আসিলে নব্য সভ্যগণ সবত্রে সমাদরে ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেকে মা-বোনের সহিত কথা বলিতেও দু-চারিটা ইংরাজী বুকুনী লাগাইয়া থাকে। আমিও সেই সভ্যসম্মত সনাতন প্রথা বজায় রাখিতে পাশ্চাত্য উদাহরণ সন্নিবেশিত করিলাম। কেহ যেন বিরক্ত হইয়া আরক্ত লোচনে শক্তবাক্য ব্যক্ত করিও না। আশা করি, পাঠকগণ স্তম্ভিত চিত্তে অনন্তমনে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া দেবলোক দর্শনের সত্যতা উপলব্ধি করিবে। একটি বস্তুকে দশ জন দশ দিক হইতে আকর্ষণ করিলে তাহার গতি সমভাবে থাকে ; কিন্তু দশ জনে একদিকে আকর্ষণ করিলে তাহার গতি কিরণ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তদ্রূপ অনন্ত দিগ্‌গামী মনের গতিরোধ করিয়া সর্বতোভাবে একমুখী করিতে পারিলে জগতে কিছুই অসম্ভব থাকে না, তবে প্রণালীবদ্ধ-ক্রমে বিচার ও যুক্তি দ্বারা করিতে হয়। বাহ্যবিজ্ঞানেও যে শক্তি—যে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন ইহাতেও তাহাই। পরিশেষে বক্তব্য এই, সকলেই চিত্তের একাগ্রতা সাধনপূর্বক সমস্ত দুঃখ বিদূরিত করিয়া জীবনে স্বথের বসন্ত আনয়ন করিবে। যেন মনে থাকে; চিত্তের একাগ্রতাসাধনই যোগের মূখ্য উদ্দেশ্য।

মুক্তি

নিত্যানিত্য বস্তুবিচার দ্বারা নিত্যবস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের সমস্ত সঙ্কল্প যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম মোক্ষ । যথা—

নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসারসমস্তসংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ ।

—নিরালম্বোপনিষৎ

সঙ্কল্প-বিকল্প মনের ধর্ম ; মন অতিশয় চঞ্চল । চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ হয় না । মনের একাগ্রতা জন্মিলে সেই মনকে জ্ঞানীব্যক্তিরূপে মৃত বলিয়া থাকেন । এই মৃত মন সাধনের ফলে মোক্ষরূপ হয় । জীবের অন্তঃকরণ যে সময়ে দৃঢ়তর উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে মোক্ষের আবির্ভাব ঘটে ; অতএব মোক্ষের অবধারণ করা কর্তব্য ।*

সংসারে আসক্তি ত্যাগ হইলেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য-সাধন দ্বারা পরিপক্বতা লাভ করিলেই মোক্ষ সংঘটন হয় । স্থূল কথায় সংসারে আত্যন্তিক বিরক্তির নাম মুক্তি । সাংসারিক ভোগাভিলাষ পূর্ণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না ; ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইলেই সাংসারিক সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া সংসার-কার্যে বিরাগ, অরুচি বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে । চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগের কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বহির্শুখীনতার নিবৃত্তি হইয়া যায় । এরূপ নিবৃত্তি হওয়ার নামই মুক্তি ।

* মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে মৎপ্রণীত “প্রেমিকগুরু” গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লেখা হইয়াছে ।

ইন্দ্রিয়গণের বহির্নুখীনতার জন্ত সংসারে যে প্রবৃত্তি, তাহারই নাম বন্ধন। সেই বন্ধনের কারণটি কৰ্ম্ম শব্দে উল্লিখিত হয়। কৰ্ম্ম নানা, এ কারণ বন্ধনও নানা। এই নানা প্রকার বন্ধনে জীব বন্দী হইয়া আপনাকে অতিশয় ক্লিষ্ট বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্ত দুঃখ ভোগ করে। সাংখ্যকারগণ এই দুঃখভোগ করাকেই হেয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যথা—

ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্।

—সাংখ্যদর্শন

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার দুঃখের নাম হেয়। প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হইলে যে বিষয়-জ্ঞান জন্মে, তাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ। যথা—

প্রকৃতিপুরুষসংযোগেন চাবিবেকো হেয়হেতুঃ।

—সাংখ্যদর্শন

অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগহেতু যে অবিবেক জন্মে, তাহাই হেয়হেতু।

তদত্যন্তনিবৃত্তির্হীনম্।

—সাংখ্যদর্শন

দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে হান অর্থাৎ মুক্তি বলে। সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়—

বিবেকখ্যাতিস্ত হানোপায়ঃ।

—সাংখ্যদর্শন

বিবেকখ্যাতিই হানোপায়, যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখোৎপাদন করে এবং প্রকৃতি-পুরুষের

বিয়োগে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ বা পার্থক্য বিবেক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে; সেই বিবেককেই হানোপায় বলে। ফলে বিবেক দ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়।—

প্রধানাবিবেকাদত্মাবিবেকস্ত তদ্বানৌ হানম্।

—সাংখ্যদর্শন

প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকই বন্ধনের হেতু এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকই মোক্ষের কারণ। দেহাদির অভিমান থাকিতে মোক্ষ হইতে পারে না। এই জন্ত বাহ্যতে পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়, এরূপ কার্য্যাহুষ্ঠানের প্রয়োজন।

যোগাঙ্গীভূত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা পাপাদির পরিস্কর্য হইলে জ্ঞান উদীপ্ত হইয়া বিবেক জন্মে। বিবেক দ্বারা মোহপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, পাশ ছিন্ন হইলেই মুক্ত হওয়া হইল। কপট বৈরাগ্য দ্বারা, বাক্যাঙ্ঘর দ্বারা কিম্বা বলপূর্ব্বক পাশ ছিন্ন হয় না; কেবল সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। সেই পাশ অর্থাৎ বন্ধন নানা প্রকার; তাহার মধ্যে আট প্রকার অত্যন্ত দৃঢ়। তাহাই অষ্টপাশ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—

স্বণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।

কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

—ভৈরবজামল

স্বণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও মান এই আটটীকে অষ্টপাশ বলে। যে ব্যক্তি স্বণারূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ থাকে, তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। যে শঙ্কারূপ পাশে বদ্ধ, তাহারও ঐরূপ

অধোগতি হইয়া থাকে। ভয়রূপ পাশ ছেদন করিতে না পারিলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। যে লজ্জাপাশে বদ্ধ থাকে, তাহার নিশ্চয়ই অধোগতি হয়। জুগুপ্সারূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে ধর্মহানি এবং কুলরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পুনঃ পুনঃ জঠরে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। শীলরূপ পাশে বদ্ধ ব্যক্তি মোহে অভিভূত হয়। মানরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পারত্রিক উন্নতিলাভ হৃদূরপর্যাহত।

ইত্যষ্টপাশাঃ কেবলং বন্ধনরূপা রজ্জবঃ।

এই অষ্টপাশ কেবল জীবের বন্ধনের রজ্জ্বরূপ। যে এই অষ্টপাশে বদ্ধ, তাহাকে পশু বলা যায়, আর এই অষ্টপাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। যথা—

এতৈর্ববদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ।

—ভৈরবজামল

এই বন্ধনমোচনের উপায় বিবেক। বিবেকই জীবের পাশ ছেদন করিবার খড়্গস্বরূপ। বিবেক-জ্ঞান সহজে উৎপন্ন হয় না। যোগাঙ্গীভূত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বাসনা ও মনোনাশ করিতে পারিলে তবে বিবেক-জ্ঞান জন্মে। কারণ অবিবেক-জ্ঞান জন্ম-জন্মান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। যথা—

জন্মান্তরশতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসারবাসনা।

সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ, ২।১৫

যে মিথ্যা সংসারবাসনা পূর্ব পূর্ব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বহুদিন যোগসাধন ব্যতীত আর অন্য কোন উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কঠোর অভ্যাস দ্বারা মন ও বাসনাকে

পরিক্ষয় করিতে হয়। দীর্ঘকাল যোগসাধন করিলে পর মন স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া বৃত্তিশূন্য হইয়া যায়। মন বৃত্তিশূন্য হইলে বিজ্ঞান ও বাসনাজয় (লোক-বাসনা, শাস্ত্র-বাসনা ও দেহ-বাসনা) আপনা হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বাসনাক্ষয়, হইলেই নিঃস্পৃহ হওয়া হইল। নিঃস্পৃহ হইলে আর কোনরূপ বন্ধন থাকে না, তখনই মুক্তিলাভ হয়। বাসনাবিহীন অচেতন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্য বিষয়ে সমাকৃষ্ট হয়, জীবের বাসনাই তাহার কারণ।

সমাধিমথ কৰ্ম্মাণি মা কৰোতু কৰোতু বা ।

হৃদয়ে নষ্টসৰ্ব্বোহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ, ২।২০

সমাধি অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হউক বা না হউক, যে ব্যক্তির হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা উদ্ভিত না হয়, সেই ব্যক্তিই মুক্ত। যিনি বিস্কৃত বুদ্ধি দ্বারা স্বাবর-জঙ্গমাди সমুদয় পদার্থের বাহ্য ও অভ্যন্তরে আত্মাকে আধারস্বরূপে সন্দর্শন করতঃ সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্বক অথও পরিপূর্ণস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনিই মুক্ত; কিন্তু বাসনা-কামনাজড়িত কয়জন জীব সে সৌভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? স্মৃতরাং সাধনা দ্বারা বাসনা ক্ষয় করিতে হইবে।

সাধনা নানাবিধ; স্মৃতরাং নানাবিধ উপায়ে মানবের মুক্তি হইয়া থাকে। কেহ বলেন, ভগবানের ভজনা করিলে মুক্তি হয়। কেহ কেহ বলেন, সাংখ্যযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। কেহ বা বলেন, ভক্তিবোধে মুক্তি হয়। কোন মহর্ষি বলেন, বেদান্তবাক্যের অর্থসমুদয় বিচার করিয়া কার্য্য করিলে মুক্তি হইয়া থাকে; কিন্তু সাংলোক্যাদি ভেদে মুক্তি চারি প্রকার কথিত আছে। একদা সনৎকুমার তৎপিতা

ব্রহ্মকে মুক্তির প্রকারভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে লোকপিতামহ বলেন—

মুক্তিস্তু শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্বিধং ।

সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্মৃতাং সামীপ্যং তৎসামীপতা ॥

সায়ুজ্যং তৎস্বরূপস্থং সাস্তি^১স্ত ব্রহ্মাণি লয়ং ।

ইতি চতুর্বিধা মুক্তির্নির্বাণঞ্চ তদুত্তরম্ ॥

—হেমাদ্রৌ ধর্মশাস্ত্রম্ ।

হে পুত্র ! আমি সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই দেবলোকপ্রাপ্তির নাম সালোক্য। সেই দেবতা-সমীপে বাস করাই সামীপ্য। তৎস্বরূপে অবস্থিতির নাম সায়ুজ্য। ব্রহ্মের মুক্তিভেদে লয়ের নাম সাস্তি^১। এই চতুর্বিধ মুক্তির পর নির্বাণ মুক্তি।

জীবে ব্রহ্মাণি সংলীনে জন্মমৃত্যুবিবর্জিতা ।

যা মুক্তিঃ কথিতা সদ্ভিস্তুনির্বাণং প্রচক্ষতে ॥

—হেমাদ্রৌ ধর্মশাস্ত্রম্ ।

জীব পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলে যে মুক্তি হয়, জ্ঞানীরা তাহাকেই নির্বাণ-মুক্তি বলিয়া থাকেন। নির্বাণ-মুক্তি হইলে আর পুনর্বার জন্মমৃত্যু হয় না। মহেশ্বর রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

সালোক্যমপি সারূপ্যং সাস্তি^১ং সায়ুজ্যমেব চ ।

কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা ॥

—শিবগীতা, ১৩।৩।

হে রাঘব ! সালোক্য, সারূপ্য, সায়ুজ্য, সাস্তি^১ ও কৈবল্য—মুক্তি এই পঞ্চবিধ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ-মুক্তি কৈবল্য-

মুক্তির নামান্তর মাত্র। বাহ ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ব্রহ্মভাব প্রকাশ করাই যোগের উদ্দেশ্য। সেই চরম ফল লাভই কৈবল্য।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাং ।

—পাতঞ্জল দর্শন, কৈবল্যপাদ, ২

প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়। যথা—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া ।

স্নেহাদ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্ত্বস্বরূপতাম্ ॥

কীটঃ পেশঙ্কতং ধ্যায়ন্ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ ।

যাতি তৎসাম্রাতাং রাজন্ পূর্বরূপমসংত্যজন্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৯।২২-২৩

দেহীব্যক্তি স্নেহ, ঘ্বেষ কিম্বা ভয়বশতঃই হউক, যে যে বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মন ধারণা করে, তাহার তাদৃশ রূপ প্রাপ্তি হয়; যে রূপ পেশঙ্কত কীট (কাঁচপোকা বা কুমরীকা পোকা) কর্তৃক তৈলপায়িকা (আরম্বলা) দ্ব্যত ও গর্ভমধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করতঃ পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। পুরুষ যখন কেবল বা নিগুণ হন অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত না হয়, আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকার-দর্শন হয় না, ঐরূপে নির্বিকার বা কেবল হওয়াকেই নির্বাণ বা

কৈবল্যমুক্তি বলে। দীর্ঘকাল যোগ-সাধনায় বখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার দেহভঙ্গ হইয়া জীব ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে, তখন কেবল একমাত্র নিকৃপাধি পরমাত্মাই প্রতীতি হইবে, এইরূপে হৃদয়াকাশে অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভাব হওয়াকেই কৈবল্যমুক্তি বলে।

জগতে যত কিছু সাধন-ভজনের বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সমস্তই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের জন্ত। জ্ঞানোদয় হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, শোক, তাপ, স্নেহ, দুঃখ, মান, অভিমান, রাগ, ঘেব, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া দাইবে। তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র স্ফুর্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্যস্ফুর্তি পাওয়া জীবদ্দশায় জীবমুক্তি এবং অন্তে নির্বাণ হওয়া বলিয়া কথিত হয়। তন্নিম্ন তীর্থে তীর্থে ছুটাছুটি, সাধু-সন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর দলে জুটাজুটি, কোপীন তিলক মালা-ঝোলার আঁটাআঁটি, সাধন-ভজনের কালে ফাটাফাটি করিলে এবং কর্মকাণ্ডের দ্বারা বা অগ্নি কোন প্রকারে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যথা—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা ।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥

যথা লৌহময়ৈঃ পার্শৈঃ পার্শৈঃ স্বৰ্ণময়ৈরপি ।

তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কৰ্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১০২-১১০

যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শত-কল্পেও জীবের মুক্তি হইতে পারে না। যেৰূপ লৌহ বা স্বর্ণময়

উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ জীবগণ শুভ বা অশুভ দ্বিবিধ কর্ম দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া আমি কর্মকাণ্ডের দোষ দর্শাইতেছি না। অধিকারভেদে কার্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যাহারা অল্পজ্ঞানী, তাহারা কর্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে উচ্চ অধিকারীর কার্য অহুষ্ঠান করিবে। নতুবা যাহারা একেবারেই নিরাকার ব্রহ্মলাভে প্রধাবিত হয়, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। অধিকার অহুসারে কার্য করিতে হইবে।

সকামাশ্চৈব নিক্শাম দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ ।

অকামানাং পদং মোক্ষং কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥

—মহানির্বাণ-তন্ত্র, ১৩ উঃ

এই সংসারে সকাম ও নিক্শাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার মধ্যে যাহারা নিক্শাম, তাহারা মোক্ষপদের অধিকারী; আর যাহারা সকাম তাহারা কর্মাহুযায়ী স্বর্গলোকাদি গমনপূর্বক নানা প্রকার ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া, কৃতকর্মের ক্ষয়ে পুনরায় ভুলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, কর্মকাণ্ডের দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন—

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মাণি নিশ্চলে ।

পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাং ॥

ন মুক্তির্জ্ঞাপনাদ্বোমাত্মপবাসশতৈরপি ।

ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভূৎ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ ।

দেহস্থোহপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥

বালকীড়নবৎ সর্বং নামরূপাদিকল্পনম্ ।
 বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥
 মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী ।
 স্বপ্নলন্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তদা ॥
 মূচ্ছিতাধাতুদার্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ ।
 ক্লিশান্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যাস্তি তে ॥
 আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ ।
 ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিস্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্ ॥
 বায়ুপর্ণকণতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।
 সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥
 উত্তমো ব্রহ্মসম্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।
 স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাদমাঃ ॥

মহানির্বাণ-তন্ত্র, ১৪ উঃ, ১১৪-১২২ শ্লোঃ

মহানির্বাণ-তন্ত্রের এই শ্লোককয়টিতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত
 হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যদ্বারে মুক্তির সম্ভাবনা নাই ।
 বাসনা-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোবৃত্তিশূন্য না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান
 সম্ভব হয় না । ত্যাগী বা সংসারী সকলের পক্ষে একই নিয়ম ।
 সাধু-সন্ন্যাসী কি বৈরাগী হইলেই মুক্তি হয় না ; মন পরিত্যক্ত করিয়া
 ক্রিয়ানিষ্ঠান করা চাই । কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ
 করিয়াছেন, কিন্তু ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি, জমি-জমা, গরু-ঘোড়া ও
 ঘর-বাড়ীতে তিনি গৃহীর ঠাকুরদাদা ।—এরূপ বৈরাগী বর্ত্তমান যুগে
 বিরল নহে ।

আকীটব্রহ্মপর্যন্তং বৈরাগ্যং বিষয়েষু ।

যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নিশ্চলম্ ॥

আরও দেখ, মহাত্মা দত্তাত্রেয় অবধূত-লক্ষণে কি বলিয়াছেন—

অ,—আশাপাশবিনিমুক্ত আদিমধ্যান্তনিশ্চলঃ ।

আনন্দে বর্ত্তেত নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

ব,—বাসনা বর্জিতা যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্ ।

বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

ধু,—ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তো নিরাময়ঃ ।

ধারণাধ্যাননিমুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

ত,—তত্ত্বচিন্তা ধূতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জিতঃ ।

তমোহংকারনিমুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

—অবধূত গীতা, ৮ অঃ

শাস্ত্রে যেরূপ ত্যাগীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এরূপ বৈরাগী নয়নগোচর হওয়া কঠিন। চাষ-আবাদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি গৃহীকে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা ছিল, তবে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া, জাত্যাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া ভেক লওয়া কেন? বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘরে বসিয়া কি ধর্ম হয় না? কোপীন পরিয়া, বৈষ্ণবীনামা বারবিলাসিনী গ্রহণ না করিলে কি গোপীবল্লভের কৃপা হয় না? আজকাল বৈষ্ণব একটা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যত কুড়ে-অকর্ম্মা খেতে না পেয়ে পেটের দায়ে বিবাহ-অভাবে রিপূর উত্তেজনায বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক নিরুদ্ধেগে সর্ব্ব অভাব পূরণ করিতেছে। জ্ঞানের নামে বুদ্ধানুলি; কিন্তু বাহ্য দৃশ্যে বিশ্ব কল্পিত। এক এক মহাপ্রভু ঘেন

পাকা পাইখানা! পাকা পাইখানার উপরে যেমন চুণকাম করা সাদা ধপধপে, ভিতরে মল-মূত্র পরিপূর্ণ; তদ্রূপ সর্কাদ্র অলকা তিলকা শোভিত করিয়া মালাঝোলা লইয়া নিয়ত মালা ঠক্ঠক্ করিতেছেন, কিন্তু অন্তর বিষয়-চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসা-দ্বेष ও অহংভাবে পরিপূর্ণ। এইরূপ বর্ণচোরা ঝুটার ঘটায় ঘটিরামগণ ভুলিয়া মাথা কোটে। গিটীর কৃত্রিম আবরণ ভাল নয় এবং অন্তর আবর্জনাপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে লোক-ভুলানো সাধুর ঢং কোন কার্যকরী নহে। কেহ বা তর্কে মূর্ত্তিমান্ অথচ পেটের ভিতর ডুবুরী নামাইয়া দিলে “ক” পাওয়া যায় না। যিনি জানে পাকা, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানিয়াছেন, তিনি কখনই তর্ক করেন না। জলন্ত ঘূতে লুচি ছাড়িয়া দিলে প্রথমতঃ শব্দ করে কিন্তু যতই রস মরিয়া আইসে, শব্দও তত কমিয়া যায়। গবারামগণ তাহা না বুঝিয়া নিজের বুদ্ধি নিজেই প্রকাশ করে। ফলে খাঁটা হইতে বাসনা করিলে মাটি হইতে হইবে। অহংভাবের প্রতিষ্ঠাশা, বশ-গৌরবের প্রত্যাশা বিন্দুমাত্র মনে থাকিলে প্রেম ও ভক্তি আসিতে পারে না। বাসনা বন্ধনের মূল। অহঙ্কারাবধি সর্কীশা ত্যাগ করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে হয় না, অনায়াসে ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করা যায়। জীব বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদসম্পন্ন, সেই বাসনা-কামনার খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে।

অত্যাশ্র উপায়ে নির্বাণমুক্তি লাভ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। যোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি নির্বাণপদ প্রাপ্তি হয়। সাধক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে চৈতন্য করাইয়া জীবাত্মার সহিত অনাহতপদমে আসিলে সালোক্য প্রাপ্ত হইবেন; বিশুদ্ধচক্র পর্য্যন্ত উঠিলে সাক্ষ্য প্রাপ্ত

হয়েন ; আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত উঠিতে পারিলে সাযুজ্য লাভ হয় ; আজ্ঞা-
চক্রের উপরে নিরালম্বপুরে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন বা জ্যোতির্গর্ভে
ইষ্টদেব দর্শন হইলে কিম্বা নাদে মনোন্ময় করিতে পারিলে নির্বাণমুক্তি-
প্রাপ্ত হয়েন ।

জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥

—জীবমুক্তি গীতা

এই জীবই শিবস্বরূপ, তিনি সর্বত্র সর্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া
বিরাজিত আছেন ; এরূপ দর্শনকারীকে জীবমুক্ত বলে। অতএব
পাঠকগণ এই গ্রন্থ-সন্নিবেশিত যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্বক
জীবমুক্ত হইয়া সংসারে পরমানন্দ ভোগ ও অন্তে নির্বাণমুক্তি লাভ
করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি যোগসাধনে অক্ষম, সে সংস্কার, বাসনা-
কামনা, সুখ-দুঃখ, শীত-আতপ, মান-অভিমান, মায়া-মোহ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা
সমস্ত তুলিয়া গিয়া, প্রাণের ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে মুক্তি
লাভ করিতে সক্ষম হইবে। *

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক পথহারা ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি
একজনও এতদগ্রন্থ পাঠে যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে
আমার লেখনী-ধারণ সার্থক। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি এবং অশ্র-
ধর্মাবলম্বিগণও এই প্রক্রিয়ায় সাধন করিয়া ফল পাইতে পারেন,
সন্দেহ নাই। যদি কেহ রীতিমত যোগশিক্ষা করিতে অভিলাষী
হন, অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, আমার

* ভক্তিপথে মুক্তি, ভক্তির সাধন, প্রেম-ভক্তির মাধুর্য্যস্বাদ, বৈরাগ্য-সন্ন্যাস প্রভৃতি
হিন্দুধর্মের চরম বিষয়গুলি মৎপ্রণীত “প্রেমিকগুরু” গ্রন্থে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

যতদূর শিক্ষা আছে এবং আলোচনা-আন্দোলনে যে সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনুসারে বুঝাইতে ও যত্নের সহিত ক্রিয়াদি শিক্ষা দিতে ক্রটি করিব না।* কিন্তু আমি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃদ্ধি-
 জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃদ্ধি-
 ভ্রুয়া হ্রবীকেশ হৃদিস্থিতেন
 যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

ওঁ মহাশান্তিঃ

— — —

যোগীশ্বর

দ্বিতীয় অংশ—মন্ত্রকল্প

দীক্ষা-প্রণালী

নমোহস্ত গুরবে তস্মাদিষ্টদেবস্বরূপিণে ।

যস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসারসংজিতম্ ॥

অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, অথও মণ্ডলাকার জগদ্ব্যাপ্ত ব্রহ্মপদ যাহা কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে, সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ নিত্যারাধ্য গুরুদেবের পদপঙ্কজে প্রণতিপূরঃসর তদুপদিষ্ট মন্ত্রকল্প আরম্ভ করিলাম ।

দীক্ষাগুরু হিন্দুদিগের নিত্যারাধ্য দেবতা । গুরুপূজা ব্যতীত হিন্দুদের ইষ্টদেবতার পূজা অসিদ্ধ হয় না । গুরুপূজা করিবার প্রথা হিন্দুদিগের অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত । গুরু সর্বত্রই পূজ্য ও সম্মানার্থ । বৈদিক হউন, তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, সৌর,

গাণপত্য যাহাই হউন, হিন্দুমাত্রেরই গুরুপূজা এবং গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যাং ন তীর্থং ন চ দেবতা ।

গুরোস্তুল্যাং ন বৈ কোহপি যদৃষ্টং পরমং পদম্ ॥

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ ।

ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যাং যদৃষ্টং পরমং পদম্ ॥

একমপ্যক্ষরং যন্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ ।

পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ভব্যং যদত্বা চানুগী ভবেৎ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে। যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন ভব্য নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিলে তাঁহার নিকটে ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন—

গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে,

সেই পাপী নরকে মজে ।

গুরুর এতাদৃশী পূজ্যভাব কেন হইল? বাস্তবিক যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষ্যকার লাভ হয়—যিনি অজ্ঞান-তিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানান্ধন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, সংসারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন করেন, তাঁহার অপেক্ষা ভগতে আর কে গরীয়ান্ মহীয়ান্ ও আত্মীয়

আছেন ? তাঁহাকে আমরা ভক্তি-প্রীতি প্রদান করিব না, তবে কাহাকে করিব ? কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে শিষ্যের পথপ্রদর্শক গুরু গৃহস্থ-লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। আজকাল গুরুগিরি ব্যবসারে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে গুরুর গুরুত্ব নাই, কর্তব্যবোধ নাই ; দীক্ষার উদ্দেশ্য গুরু-শিষ্য কেহই বুঝেন না। দীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ?

দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থং ক্রীয়তে পাশবন্ধনম্।

অতো দীক্ষ্যেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥

—যোগিনী-তন্ত্র, ৬ষ্ঠ পঃ

আরও দেখ—

দিব্যজ্ঞানং যতো দত্বাৎ কুর্যাৎ পাপক্ষয়ন্ততঃ।

তস্মাদীক্ষ্যেতি সা প্রোক্তা সর্বতন্ত্রস্ত সন্মতা ॥

—বিংশসার-তন্ত্র, ২য় পঃ

এই সকলের ভাবার্থ এই যে, দীক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞান হয় এবং পাপ ক্ষয় ও পাশবন্ধন দূর হয়। ইহাই ‘দীক্ষা’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং দীক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কয়জনের সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় ?—হইবে কেন ?

অভিজ্ঞশ্চোদ্ধারেন্মূৰ্খং ন মূৰ্খো মূৰ্খমুদ্ধরেৎ।

—কুলম্ভাবতার-কল্পসূত্রটীকা

অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারে ; কিন্তু অনভিজ্ঞ মূৰ্খ মূৰ্খকে উদ্ধার করিতে পারে না। ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায়-মধ্যে সাধক-শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া তাহার উদ্ধারাভিনাষী সদগুরু অতি কম। যে ব্যক্তি নিজে অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধনদশায় থাকিয়া

হাত-পা সঞ্চালন করিতে পারে না, - সে ব্যক্তি অপরের বন্ধন মোচন করিয়া দিবে কি প্রকারে? গুরুদেবই অন্ধকারমধ্যে থাকিয়া আকুল-বিকুলি করিয়া ঘুরিতেছেন, শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবেন কিরূপে? এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যবসাদার গুরুনামধারী অদ্ভুত জীব কলির এক কলি। এই সমস্ত গুরু-গোস্বামিগণ আত্মিক ও পূজাদির সময় ধ্যানে 'সোহং' ভাবনার স্থলে অন্ধকার দর্শন কিম্বা বাজারের অভিলষিত দ্রব্য ক্রয়, নয় ত বিষয়-চিন্তায় অতিবাহিত করেন। কেহ বা সর্বগাত্রে গোপীমুক্তিকালেপন, মুখে হরদম্ গোপীবল্লভ রব, আকর্ষণ-লব্ধিত লংকথ কিম্বা রঙ্গিন রেশমী বোলায় নিয়ত মালা ঠক্ঠক্ করিতেছেন কিন্তু মনে নানা চিন্তা এবং মুখে নানা কথা চলিতেছে। মন-কাণ নানা দিকে আকৃষ্ট, মুখেও অনবরত কথা, এদিকে বোলার ও মালার বিরাম নাই। এই গুরুসম্প্রদায় ছলে-কৌশলে কেবল শিষ্যসংগ্রহের চেষ্টায় নিয়ত ভ্রমণ করে। প্রকৃত জ্ঞানিগণ অশেষ সাধ্যসাধনায় শিষ্য করিতে স্বীকৃত হয়েন না; আর আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক ব্যবসাদার গুরু তোষামোদ করিয়া—নিজে বাড়ী হইতে ঘৃত-পৈতাদি আনিয়া যাচিয়া-সাধিয়া শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন; কিন্তু একবার শিষ্য করিতে পারিলে আর যায় কোথায়? নিয়মিত নির্দিষ্ট বার্ষিকী না পাইলে শিষ্যের মুণ্ডপাত করিয়া থাকেন। এই সকল গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দেন, যথা—

“হরি বল মোর বাছা,

বৎসরান্তে দিও চারি গুণা পয়সা আর একখানা কাছা।”

এরূপ গুরু সংসারে বিরল নহে। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনিময়ে বার্ষিক রজতখণ্ড আদায় করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলে দীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহই দৃষ্ট

হইয়া থাকে। গুরু শিষ্যালয়ে আসিয়া শিষ্যের কর্ণে এক ফুঁকা দিয়া কিঞ্চিৎ রক্তমুদ্রা সঞ্চিত এবং পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিবার জন্ত মৌরশী মোতকদমী সম্পত্তি স্বায়ত্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। গুরু তো স্বকর্ষ্য সাধন করিয়া স্বার্থোদ্দেশে অপর কাহারও মুণ্ডপাত করিতে যাউন; শিষ্যবেচারী এদিকে গুরুদত্ত সেই শুদ্ধ বর্ণমালাংশ যথাসাধ্য জপ করিতে লাগিলেক, কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে— তাহার হৃদয়ক্ষেত্রের অবস্থা “যথাপূর্বং তথাপরং”—সেই একই প্রকার। শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার—বন্ধন মোচন করিবার—দিব্য-জ্ঞান প্রদান করিবার এক ক্রান্তি শক্তি সে গুরুদেবের নাই। হায়রে স্বার্থান্ধ কলির গুরু! যদি টাকা লইয়া পাঁচ মিনিটে জীবাত্তার উদ্ধার সাধিত হইত, তাহা হইলে এত শাস্ত্রের আবশ্যক হইত না এবং মুনি-ঋষিগণ দীর্ঘকাল বনবাসী হইয়া কঠোর সাধনা করিতেন না।—আধুনিক ফুলবাবুর ত্রায় ঘড়ি-ছড়ি লইয়া টেরি বাগাইয়া মজা উড়াইতে কল্প করিতেন না।

আরও এক কথা। শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া কর্তব্য। বামকেশ্বর তন্ত্র ও নিরুত্তর তন্ত্রাদিতে উক্ত আছে যে, “যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশবিচার কোন মন্ত্র দীক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি যাবৎ চন্দ্র-সুধ্য থাকিবে, তাবৎকাল নরকে বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি অভিষিক্ত না হইয়া তান্ত্রিক মতে উপাসনা করে, তাহার জপ-পূজাদি অভিচারস্বরূপ হয়।” যথা—

অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম্য করোতি যঃ।

তস্ম পূজাদিকং কর্ম্য অভিচারায় কল্পতে ॥

—বামকেশ্বর তন্ত্র

দেখ, ব্যাপারখানা কি! কিন্তু কয়জন দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে অভিষেক করিয়া থাকে? শাক্তগণের প্রথমে শাক্তাভিষেক, তৎপর পূর্ণাভিষেক, তদনন্তর ক্রমদীক্ষা হওয়া কর্তব্য। ক্রমদীক্ষা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। যথা—

ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথং সিদ্ধিঃ কলৌ ভবেৎ।

ক্রমং বিনা মহেশানি সর্বং তেষাং বৃথা ভবেৎ ॥

—কামাখ্যা-তন্ত্র, ৩২ পৃ:

ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কলিযুগে কোন মন্ত্র সিদ্ধি হইবে না এবং ক্রম বিনা পূজাদি সমস্তই বৃথা। আমাদের দেশের সাধকাগ্রগণ্য ৩৬বিজ রামপ্রসাদ ক্রমদীক্ষিত হইয়া পঞ্চমুণ্ডীর* আসনে মন্ত্র জপ করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। অনেকে বলেন, “রামপ্রসাদ গান গাহিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।” কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নহে, আজিও তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন বিচ্যমান আছে, আমি স্বচক্ষে ঐ আসন দেখিয়াছি।

মহাত্মা রামপ্রসাদ ব্যতীত আর কেহ মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায় না; ইহার প্রধান কারণ—গুরুকুলের অবনতি। উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে মন্ত্রযোগে ফল হয় না। এই ত গেল এক পক্ষের কথা, দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রায়ই কেহ সদগুরু চিনে না। তাহারা মানবজীবন-পণ্ডকারী ভণ্ড গুরুর দোহুড়ি প্রতাপে ভুলিয়া বহুভাষ্যশূন্য সাধকগণকে উপেক্ষা করিতেছে, কাজেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও তাহাদের অভাব পূর্ণ হইতেছে না। কেহ বা কুলগুরুত্যাগ-জনিত মহাপাপপঙ্কে নিমজ্জন-আশঙ্কায় হ্রস্বদীর্ঘ-বোধবিবর্জিত ষণ্ডতুল্য

* বিধানানুযায়ী দুইটি চণ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালের মুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড এবং একটি সর্পের মুণ্ড, এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি-বিষয়ে বিশেষ দহায়তা হয়।

গগুমূখের চরণে লুপ্তিত হইয়াও অস্তিমে সেই দণ্ডধারীর দূতগণের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মনে করিয়া গণ্ডে হস্ত দিয়া ভয়ে লণ্ডভণ্ড হইতেছে। বাস্তবিক কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রানুসারে পৈতৃকগুরুত্যাগজন্ত দূরদৃষ্টশালী হইতে হয় ; তবে উপায় কি ?

উপায় আছে। পৈতৃকগুরু পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণান্তর পরে শিক্ষার জন্ত জগদগুরু মহেশ্বর—

সদগুরু

জ্ঞানের বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

মধুলুকো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাং পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ ।

জ্ঞানলুকস্তথা শিষ্যো গুরোঁ গুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥

—তত্ত্ববচন

মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অগ্ন ফুলে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুক শিষ্য এক গুরু হইতে অপর গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

অতএব, সকলেই পৈতৃক গুরুর নিকট প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদনন্তর উপযুক্ত গুরুর নিকটে উপদেশ লইবে এবং সাধনাভিলাষিগণ ক্রিয়াদি শিক্ষা করিবে। কিন্তু সাবধান!—ভিতরের খবর না জানিয়া বেশ-বিত্তাস বা হাব-ভাব বাক্যাড়ম্বর দেখিয়া যেন ভুলিও না। গুরু চিনিয়া ধরিতে না পারিলে ক্রমাগত এক গুরু হইতে অগ্ন গুরু, এইরূপ নিয়ত বেড়াইলে আর সাধন করিবে কবে? বর্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, আমাদের

দেশের গৃহস্থ গুরুর নিকট সাধকের অভাব পূরণ হইবে না। সেই জ্ঞান বালি, উপগুরু ধরিয়াও যেন বৃদ্ধাদুষ্ঠ চুষিতে না হয়। যাহাদের কুলগুরু নাই, তাহারা পূর্ব হইতে সাবধান হইবে। আমি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ; অনেক ভণ্ডের হাতে পড়িয়া কত দিন পণ্ড করিয়াছি। অতএব শাস্ত্রাদিতে যেরূপ গুরুর লক্ষণ লেখা আছে, তদনুসারে উপযুক্ত গুরু ধরিয়া উপদেশ লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা সফল আশা স্বদূরপর্যাহত। একেই তো বহুজন্ম না খাটিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি হয় না, তজ্জ্ঞান সর্বপ্রকার সাধনের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে ; অল্পজ্ঞানী অধম অধিকারিগণই মন্ত্রযোগ-সাধন করিয়া থাকে। তদুপরি উপযুক্ত উপদেষ্টার উপদেশে অন্তর্ভুক্ত না হইলে, গতান্তর নাই।

মন্ত্রতত্ত্ব

নাদতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভকালে কিছুই ছিল না ; প্রথমে গুণ ও শক্তির বিকাশ। গুণত্রয় ও শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্তলোকের সৃজন, পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। গুণ অব্যক্ত বীজের আয় সমস্ত বস্তুতেই থাকে, কিন্তু শক্তির সাহায্যে তাহার স্ফুর্তি হয়। পরমাণু, তন্মাত্রা এবং বিন্দু লইয়াই জগৎ। পরমাণুকেই গুণ বলা যায়। আর অহঙ্কার-তত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্রের সাকল্যে জগৎ সৃষ্টি হয়। বিন্দু শব্দ-ব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ

এবং চিদংশবীজ। ফলে বিনাশই একার্থবোধক এবং বিনাশই নিত্য সূক্ষ্মশক্তিব্যঞ্জক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি অমূর্ত গুণ ; সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী ইহারা ই তাঁহাদের সূক্ষ্ম শক্তি। গুণগুলি শক্তিসমন্বিত হইয়া স্থূল হইয়াছেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি সরস্বতী। সরস্বতী নাদরূপিণী শব্দব্রহ্ম ; সরস্বতী সেই শব্দব্রহ্মের চিদংশবীজ। ইহাই আমাদের মন্ত্র-বাদের মূলাত্মিকা শক্তি। যে শব্দ যে কার্যের জন্ম একত্রে গ্রথিত হইয়া যোগবলশালী ঋষিদিগের হৃদয় হইতে উথিত হইয়া পদার্থসংগ্রহে শক্তিমান হইয়াছিল, তাহাই মন্ত্ররূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব মন্ত্রশব্দ যে অলৌকিক শক্তিশালী ও বীৰ্য্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি ? যোগযুক্ত হৃদয়ের অত্যধিক স্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও বিকীরিত হয়।

বীজমন্ত্রসমৃদ্ধ শক্তির ব্যক্ত সূক্ষ্মবীজ। যেমন “ক্লীং” কৃষ্ণের সূক্ষ্ম ব্যক্ত বীজ। একটা অশ্বখবীজের উপমা ধর। বীজের যাহা খোসা-ভুসি, তাহাতে এমন কি আছে যাহাতে ঐ প্রকাণ্ড মহীৰুহের সৃষ্টি হইয়াছে ? রাসায়নিক বিশ্লেষণেও যদি কিছু বাহির করিতে না পারি, তবে চারি-পাঁচদিন মাটির মধ্যে থাকিয়া একদিন বৃক্ষাস্কুর কোথা হইতে বাহির হইল ? ক্রমে তাহা কোন্ অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ধাইয়া উঠিয়া পড়িল ? ঐ ক্ষুদ্র সর্বপরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ অশ্বখবৃক্ষ কারণরূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সহায়তায় সেই কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। তদ্রূপ দেব-দেবীর বীজ-মন্ত্রে তাঁহাদের সূক্ষ্ম শক্তি নিহিত থাকে ; শুনিতে সামান্য বর্ণ মাত্র কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা তাহার শক্তি জাগাইয়া দিলে, যে দেবতার যে বীজ সেই দেবতা-শক্তির কার্য্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে মন্ত্রে

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, মন্ত্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে
গ্রথিত আছে, তাহা সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই
মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাইবে। তন্মত্রে উক্ত রহিয়াছ যে—

মনোহন্ত্র শিবোহন্ত্র শক্তিরন্ত্র মারুতঃ।

ন সিধ্যন্তি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥

—কুলাৰ্ণবো

মন্ত্রজপকালে মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে
থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে, শতকল্পেও মন্ত্র-
সিদ্ধি হয় না। এই সকল তথ্য সম্যক্ না জানিয়া, সকলে বলে যে
“মন্ত্রজপ করিয়া ফল হয় না।” কিন্তু ফল যে আপনাদের ক্রটিতে
হয় না, তাহা কেহ বুঝে না। এই দেখ না, জগদ্গুরু যোগেশ্বর
কি বলিয়াছেন—

মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।

শতকোটিজপেনাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি ॥

—সরস্বতী-তন্ত্র

মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া শতকোটি জপ করিলেও
মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না।

অন্ধকারগৃহে যদ্বন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।

দীপনীরহিতো মন্ত্রস্তথৈব পরিকীর্তিতঃ ॥

আলোকবিহীন অন্ধকারগৃহে যেদ্রুপ কিছু দেখা যায় না, সেই-
দ্রুপ দীপনীরহীন মন্ত্রজপে কোন ফল হয় না। অতঃ তন্মত্রে ব্যক্ত
আছে—

“মণিপুরে সদা চিন্ত্যং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্।”

অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুৰচক্রে সর্বদা চিত্তা করিবে। বাস্তবিক মন্ত্রের প্রাণ মণিপুৰে, তাহা জানিয়া ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই চৈতন্ত হইবে না; স্তত্রাং প্রাণহীন দেহের ত্রায় অচৈতন্ত মন্ত্র জপ করিলে কোনই ফল হয় না। কিন্তু এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুৰে কি প্রকার, তাহা কোন ব্যবসায়ী গুরু বুঝাইয়া দিতে পারে কি? আমি জানি, গৃহস্থ লোকের মধ্যে একজনও নাই; যোগী ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ঐ সঙ্কেত ও ক্রিয়াস্থান জ্ঞাত আছেন।

অতএব সাধনাভিলাষী জাপকগণের যদি মন্ত্রজপ করিয়া ফললাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে রীতিমত মন্ত্র-চৈতন্ত করাইয়া জপ করিবে। জপরহস্ত সম্পাদনপূর্বক রীতিমত জপ করিয়া, বিধিপূর্বক সমর্পণ করিলে জপজনিত ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। জপরহস্ত সম্পাদন ব্যতিরেকে জপফল লাভ করা একান্তই অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জপরহস্ত ও জপসমর্পণবিধি প্রায় কেহই জানে না।* ইহার কারণ উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে জপাদির প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকল ব্যক্তিরই জপরহস্ত সম্পাদন করা কর্তব্য। কল্পকাসেতু, মহাসেতু, মুখশোধন, করশোধন প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রকার জপরহস্ত ক্রমান্বয়ে পর পর যথানিয়মে সম্পাদনপূর্বক জপান্তে বিধিপূর্বক জপসমর্পণ করিতে হইবে। জপরহস্ত আবার দেবতাভেদে পৃথক পৃথক আছে। স্তত্রাং বিংশতি প্রকার জপরহস্ত দেবতাভেদে পৃথক পৃথক ভাবে যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করা

* জপরহস্ত ও জপ-সমর্পণবিধি প্রভৃতি মন্ত্রের নানাবিধ জপের কৌশল ও সাধনাদি মংগরীত “তান্ত্রিকগুরু” পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনন্তব। বিশেষতঃ গ্রন্থদৃষ্টে সাধারণে ঐ জপহস্ত সম্পাদন করিতে পারিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। অত্র উপায়েও মন্ত্রচৈতন্য করা যায়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুরশ্চরণ করিয়া মন্ত্রচৈতন্যের চেষ্টা হইয়া থাকে।

মন্ত্র জাগান

চলিত ভাষায় পুরশ্চরণ-ক্রিয়াকে “মন্ত্র জাগান” বলে। পুরশ্চরণ না করিলে মন্ত্র-চৈতন্য হয় না, মন্ত্র-চৈতন্য না হইলে সে মন্ত্রপ্রয়োগে কোন ফল লাভ হয় না। অতএব যে কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পুরশ্চরণ করা কর্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এখনকার যজমান বা শিষ্য—গুরু বা পুরোহিতের নিকট হইতে পুরশ্চরণ-পদ্ধতি জানিয়া লইয়া যে পুরশ্চরণ করে, তাহাতে তাহারা কেবল অনর্থক অর্থব্যয় ও উপবাসাদি করিয়া থাকে মাত্র। ঐ সকল কারণেই হিন্দু-ধর্মের প্রতি লোকের অহুসার কমিয়া যাইতেছে। কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া যে কার্য্য সমাপন করিল, তাহাতে যদি কোন প্রকার সফল দৃষ্ট না হয়, তবে সে কার্য্য করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? ইহারাই আবার বলিয়া থাকে, “এখনকার লোক ইংরাজী পড়িয়া ধর্ম-কর্ম মানে না বা শাস্ত্রাদি বিশ্বাস করে না।” কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে যে তাহারাই সমধিক দোষী, তাহাদের ক্রটিতেই লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে, ইহা স্বীকার করে না।

পুরশ্চরণ ত মন্ত্রজপ নহে। মন্ত্র যেভাবে উচ্চারণ করিলে স্বরকম্পন হয়, মন্ত্র জাগানতে তাহাই শিক্ষা করিতে হয়। সঙ্গীত-শিক্ষার্থীকে রাগ-রাগিণী অভ্যাস করিতে যেমন স্থানবিশেষ দিয়া ঐ স্বর বাহির করিতে হয় অর্থাৎ গলা সাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করিতেও তদ্রূপ নাড়ী সাধিতে হয়। পুরশ্চরণ সেই নাড়ীসাধা। ইহা আমি রচাইয়া বলিতেছি না ; তত্ত্বে উক্ত আছে—

মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে ।

মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যানং পুনঃ পুনঃ ॥

—গৌতমীয়ে

মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য পরিজ্ঞানপূর্বক জপ করিবে।

মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারণপূর্বক কিরূপে জপ করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা করা পুরশ্চরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব জাপকগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে পুরশ্চরণ-ক্রিয়া শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই জপজনিত ফল প্রাপ্ত হইবে।

মন্ত্রসিদ্ধির সপ্ত উপায়

সম্যকরূপে পুরশ্চরণাদি সিদ্ধকার্যের অহুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় পূর্ববৎ নিয়মে পুরশ্চরণাদি করিবে। এইরূপে যথানিয়মে তিনবার পুরশ্চরণ করিয়াও হৃৎগা-

বশতঃ কেহ যদি কৃতকার্য হইতে না পারে, তথাপি ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষান্ত হইবে না ; শঙ্করোক্ত সপ্ত উপায় অবলম্বন করিবে ।
যথা—

ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং শোষণপোষণে ।

দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্নতু ॥

—গৌতমীয়ে

ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ ও দাহন—
ক্রমশঃ এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ।

ভ্রামণ—

যং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সকল গ্রহন করিবে । অর্থাৎ শিলারস, কপূর, কুসুম, বেণার মূল ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা মন্ত্রান্তর্গত বর্ণসকল ভিন্ন ভিন্ন করতঃ একটি বায়ুবীজ এবং একটি মন্ত্রাক্ষর, এইরূপে যন্ত্রতে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ লিখিবে । পরে, ঐ লিখিত মন্ত্র দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর পূজা, জপ ও হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ভ্রামণের দ্বারাও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে রোধন করিতে হইবে ।

রোধন—

ওঁ এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ জপের নাম রোধন । যদি রোধনক্রিয়া দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে বশীকরণ করিও ।

বশীকরণ—

আলতা, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, ধূস্তরবীজ ও মনঃশিলা—এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে ; এইরূপ করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করিবে ।

পীড়ন—

অধোত্তরযোগে মন্ত্র জপ করিয়া অধোত্তররূপিণী দেবতার পূজা করিবে। পরে আকন্দের দুগ্ধদ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পাদদ্বারা আক্রমণ পূর্বক সেই মন্ত্রদ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে—এই কার্যকে পীড়ন বলে। ইহাতেও কৃতকার্য হইতে না পারিলে মন্ত্রের শোষণ করিও।

শোষণ—

যং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে এবং ঐ মন্ত্র যজ্ঞীয় ভস্ম দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। এইরূপ শোষণ করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পোষণ করিতে হইবে।

পোষণ—

মূলমন্ত্রের আদি ও অন্তে ত্রিবিধ বালাবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গোদুগ্ধ ও মধু দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে। ইহারই নাম মন্ত্রের পোষণক্রিয়া। যদি ইহাতেও মন্ত্রসিদ্ধি না ঘটে, তবে শেষ উপায় দাহনক্রিয়া করিবে।

দাহন—

মন্ত্রের এক এক অক্ষরের আদি, মধ্য ও অন্তে রং এই অগ্নিবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং পলাশবীজের তৈল দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে। মহাদেব বলিয়াছেন, এই সকল ক্রিয়া অতি সহজ, চারি-পাঁচ দিনেই কৃতকার্য হওয়া যায়।

মন্ত্রসিদ্ধির সহজ উপায়

উপরে মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত যে সপ্তক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহা কোন অভিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হয়। কেননা, জনস্ত অগ্নিতে বর্জিকা ধরান সহজ। দ্বিতীয়তঃ কথা এই—যে মন্ত্র পুরস্চরণরূপ অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ হইল না, তখন বুঝিতে হইবে, হয় সে সাধকের ব্রহ্মপথ মুক্তির উপায় হয় নাই, নয় তাহার গুরুদত্ত মন্ত্র উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে মন্ত্র লওয়া হইয়াছে, সে মন্ত্র আর পরিত্যাগের উপায় নাই। পত্যন্তর গ্রহণে যেমন বিবাহিতা নারীগণের ব্যভিচার ঘটে, তদ্রূপ এক মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রানুসারে ব্যভিচার হয়। অতএব তখনকার অবস্থা কর্তব্য, কোন মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত সপ্তক্রিয়ার যে কোন ক্রিয়া দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করাইয়া লওয়া। ঐ সকল দ্রব্যাদি ও বীজাদি দ্বারা তিনি সাধকের শরীরে ঐ মন্ত্রেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু কথা এই—সে রূপ মন্ত্র-সিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তি সুলভ নহে। কাহারও ছুরদৃষ্ট বশতঃ ঐরূপ সিদ্ধব্যক্তি না-ও জুটিতে পারে। অতএব উপায় কি? উপায় আছে—

নিজে নিজেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে “ইথারের ভাইব্রেশনে” (Vibration of the Ether) মন্ত্র চৈতন্ত্য করা সহজ, কিন্তু তাহাও স্বল্পজ্ঞানী সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। একটি অতি সহজ ও সকলের করণীয় প্রণালীতে মন্ত্রচৈতন্ত্য করা হয়। সে ক্রিয়ানুযায়ী জপ করিলে বিনা আয়াসে মন্ত্রচৈতন্ত্য হয়। অগ্রে জপের বিশিষ্ট নিয়ম জানিয়া এবং মন্ত্রের—

ছিন্নাদি দোষশান্তি

করিয়া লইতে হয়। মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ এই যে, মন্ত্রসকল বহুদিন হইতে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে; যদি কোন ভুল-ভ্রান্তিতে তাহার কোন অংশ পতিত বা ছাড় হইয়া থাকে, তবে কম্পন ঠিক হয় না। কাজেই মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অক্ষরে শব্দ উত্থাপিত করে, অতএব অন্য অক্ষরাদির একত্র যোগে জপ করিলে ঐ মন্ত্রের সে দোষের শান্তি হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাকে কম্পনযুক্ত করিয়া লইতে পারে।

মন্ত্রের ছিন্নাদি যে সমস্ত দোষ নিরূপিত হইয়াছে, মাতৃকাবর্ণ-প্রভাবে সেই সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের এক একটা বর্ণ পূর্বে এবং এক একটা বর্ণ পরে যোগ করিয়া অষ্টোত্তরশত-বার (কলিতে চারিশত বত্রিশ বার) জপ করিবে, তাহা হইলেই মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষের শান্তি হয় এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে। আরও এক কথা—সেতু ভিন্ন জপ নিফল হয়, অতএব—

সেতু নির্ণয়

শাস্ত্রে কথিত আছে। কালিকা-পুরাণাদিতে লিখিত আছে, সর্বপ্রকার মন্ত্রেরই ওঁ এই বীজ সেতু। জপের পূর্বে ওঁকাররূপী সেতু না থাকিলে সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে ঐ মন্ত্র

বিশীর্ণ হইয়া যায়। অতএব সাধকগণ মন্ত্রজপের পূর্বে ও পরে সেতুমন্ত্র জপ করিবে। শূদ্রগণের ও উচ্চারণের অধিকার নাই। চতুর্দশ স্বর ও, ইহাতে নাদবিন্দু যোগ করিলে ওঁ হয়। ইহাই শূদ্রের সেতুমন্ত্র জানিবে।
পূজা-জপাদিতে—

ভূতশুদ্ধি

না করিলে অধিকার হয় না। অতএব জপের পূর্বে ভূতশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। বাহ্যভায়ে ভূতশুদ্ধির সংস্কৃতাংশ বাদ দিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য বঙ্গভাষায় লিখিত হইল।

“রং” এই মন্ত্র পড়িয়া জলধারার দ্বারা নিজের শরীরকে বেঠন করতঃ ঐ জলধারাকে অগ্নিময় প্রাচীর চিত্তা করিয়া হাত দুইটা উত্তানভাবে বামদক্ষিণক্রমে উপযুপরি স্বকোড়ে স্থাপন করিয়া মোহং (শক্তিবিশয়ে “হংস” ও শূদ্রসম্বন্ধে “নমঃ”) এইরূপ চিত্তা করিয়া হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তির সহিত সুম্প্রাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রক্রমে ভেদপূর্বক শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল-পদ্মের কর্ণিকামধ্যগত পরমাত্মাতে সংযোগ করিয়া, তাহাতেই শারীরিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, রূপ, শব্দ, ভ্রাণ, রসনা, ত্বক্, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে লীন চিত্তা করিবে। তৎপরে বামনাসাপুটে “ং” এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ চিত্তা করিয়া প্রাণায়ামপ্রণালী অনুসারে উক্ত বীজকে ষোলবার জপ করিয়া

বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করতঃ বাম নাসাপুট রোধ করিয়া চৌষটিবার জপ করতঃ কুম্ভক করিয়া বাম কুক্ষিস্থিত ক্লম্ববর্ণ খর্ব পিঙ্গলাক্ষ পিঙ্গলকেশ পাপপুরুষের সহিত স্বদেহকে শোষণ পূর্বক ঐ বীজ বত্রিশবার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে। আবার রক্তবর্ণ “রং” এই বহিবীজ দক্ষিণ নাসাপুটে চিন্তা করিয়া উহা ষোলবার জপ করতঃ বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় রোধ করিয়া উহা চৌষটিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া উক্ত বীজজনিত মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত স্বদেহ দক্ষ করিয়া পুনরায় বত্রিশবার জপ করিয়া বাম নাসাদ্বারা দক্ষ ভ্রমের সহিত বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় শুক্লবর্ণ “ঠং” এই চন্দ্রবীজ বাম নাসায় চিন্তা করিয়া তাহা ষোলবার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ করিয়া ঐ বীজাকার চন্দ্রকে ললাটে চিন্তা করিয়া উভয় নাসাপুট রোধ করতঃ “বং” এই বরুণ-বীজ চৌষটিবার জপ করতঃ কুম্ভক দ্বারা ললাটস্থ উক্ত চন্দ্র হইতে নিঃসৃত পঞ্চাশং মাতৃকাবর্ণ অমৃতধারার দ্বারা শরীরকে নূতন গঠিত চিন্তা করিয়া “লং” এই পৃথ্বীবীজ বত্রিশবার জপ করতঃ আত্মদেহকে সূদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। পরে “হংস” (দ্বী ও শূদ্রগণ “নমঃ”) এই মন্ত্র দ্বারা লয়প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাঙ্গা ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে পুনরায় স্বস্থানে চালনা করিবে। অনন্তর “সোহং” এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক জপে বা পূজাদিতে নিযুক্ত হইবে।

লক্ষ লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃত ভূতশুদ্ধি করিতে পারে কি-না সন্দেহ। ইড়া বা পিঙ্গলার পথে হইবে না; সুষুম্নাপথে দেহের সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত বৃত্তি ঐ কুণ্ডলিনী-শক্তির সাহায্যে সর্বতোভাবে একমুখী করাই ভূতশুদ্ধির মুখ্য উদ্দেশ্য। কেহ যদি ষথানিয়মে

ভূতশুদ্ধি করিতে না পারে, তাহারও সহজ উপায় আছে।
যথা—

জ্যোতির্মন্ত্র মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ।

এতজ্জ্ঞানপ্রভাবেন ভূতশুদ্ধিফলং লভেৎ ॥

— ভূতশুদ্ধিতন্ত্র

জ্যোতির্মন্ত্র অর্থাৎ “ওঁ হ্রৌঁ” এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে ভূতশুদ্ধির ফল হয়। আর এক প্রকার সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি আছে। যথা—

(১) ওঁ ভূতশৃঙ্গাটচ্ছিরঃস্বষুন্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে-
যোজয়ামি স্বাহা ।

(২) ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ।

(৩) ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ।

(৪) ওঁ পরমশিবস্বষুন্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল-
প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল সোহহং হংসঃ স্বাহা ।

কেবল এই চারিটি মন্ত্র পাঠ করিলেই ভূতশুদ্ধির ফল হয়। অতএব পাঠকগণের মধ্য বাহার যেটি সুবিধা হয়, সে তদনুসারে ভূতশুদ্ধি করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে। এক্ষণে—

জপের কৌশল

নিখিত হইতেছে। সাধকগণ পূর্বোক্ত মন্ত্রের দোষশাস্তি ও সেতুমন্ত্র-যোগে এই প্রকার অহুষ্ঠানে পূজা-হোমাদি বিহনেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যথা—

মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ ।

তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে ॥

—গৌতমীয়-তন্ত্র

সাধক প্রথমতঃ মনঃসংযমপূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুর ধ্যান-প্রণামানন্তর মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবে ।

মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরী ।

বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ॥

ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবনা হয় । মন্ত্রার্থ ভাবনা করিয়া মন্ত্র-চৈতন্য করিবে অর্থাৎ আপন আপন মূলমন্ত্রের পূর্ব্ব ও পরে “ঈং” এই বীজ যোগ করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে । অনন্তর মূলধার পদ্যের অন্তর্গত যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন, সার্বত্রিকবলয়াকার কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ; সাধক জপকালে মন্ত্রাক্ষরসমুদয় সেই কুণ্ডলিনী-শক্তিতে গ্রথিত ভাবনা করিয়া নিঃশ্বাসের তালে তালে অর্থাৎ পূরককালে চিন্তা দ্বারা ঐ কুণ্ডলিনী-শক্তি উত্থাপিত করতঃ সহস্রার-কমল-কর্ণিকার মধ্যবর্ত্তী পরমানন্দময় পরম-শিবের সহিত ঐক্য পায় যাইবে এবং রেচককালে ঐ শক্তিকে যথাস্থানে আনিবে । এইরূপ নিঃশ্বাসের তালে তালে যথাশক্তি জপ করতঃ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ভাবনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একবার সহস্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলধারে আনিবে । এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে সুষুম্নাপথে বিদ্যুতের তায় দীর্ঘাকার তেজঃ লক্ষিত হইবে ।

প্রত্যহ এইরূপ নিয়মে জপ করিলে, সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সন্দেহ নাই। নতুবা মালা-ঝোলা লইয়া বাহু অল্পঠানে শতকল্পেও ফল পাইবে না।

ব্রাহ্মণগণ যথাবৎ প্রণব উচ্চারণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ ও মনোলাভ করিতে পারিবে। যথাবৎ উচ্চারণ বলিতে, জপে স্বরকম্পন, তাহার অর্থভাবনা ও তাহাতে মনের অভিনিবেশ করার নামই প্রণবের সার্থক উচ্চারণ। যথা—

অ—উ—ম এই তিনটি অক্ষর লইয়া ওঁ শব্দ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক ঐ তিনটি অক্ষর—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ব্যক্ত বীজ। সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা উদারা, মূদারা, তারা, স্বরের এই তিনটি বিভাগ করিয়াছেন। ওঁ এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে যে স্বরবাহ্যারটি উদ্ভূত হইবে, তাহার মধ্যে ঐ বিভাগতিনটি থাকিবে এবং জীবের অবস্থান-স্থল ষড়্দল-কমল হইতেই প্রথমে স্বরের উৎপত্তি হইবে, তৎপরে অনাহতপদ্যে প্রতিধ্বনি করিয়া সহস্রারে ধ্বনিত হইবে, এমন ভাবে একটানে স্বরটি চালিত করিতে হইবে। চিৎকার করিয়া বলিলেই যে এমন হইবে, তাহা নহে। মনে মনে বলিলেও ঠিক এইরূপ স্বর-কম্পন করা যায়। সংসারের কাজ করিতে করিতেও ঐ ধ্যানে, ঐ জ্ঞানে নিমগ্ন থাকা যায়।

সর্বদা প্রণবের অর্থ ধ্যান ও প্রণব জপ করিলে সাধকের চিত্ত নির্মল হয়। তখন প্রত্যক্চৈতন্য অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা-সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সহিত উপাসনার যে সঙ্কেত ভাব, তাহা অর্থাৎ “ওঁ” বলিলে ঈশ্বরের স্বরূপ সাধক-হৃদয়ে সমুদিত হয়। কেন হয়, তাহা বড় জটিল ও কঠিন সমস্যা। তবে ইহা নিশ্চিত যে, প্রণব (ওঁ) ঈশ্বরের অতি ঘনিষ্ঠ অভিধেয় সম্বন্ধ।

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ সর্বাবয়ববর্দ্ধনম্ ।

আনন্দাশ্রুণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরী ।

গদ্গদোক্তিঃ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

—তন্ত্রসার

জপকালে হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ, সর্ব-অবয়বের বর্দ্ধিষ্ণুতা, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গদ্গদভাষণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। মনোরথ-সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। দেবতা-দর্শন, দেবতার স্বর শ্রবণ, মন্ত্রের বাক্য, শব্দ-শ্রবণ প্রভৃতি এবং অত্যাশ্চর্য লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফলকথা, যোগ-সাধনায় আর মন্ত্র-সাধনায় কোন প্রভেদ নাই; কারণ উদ্দেশ্যস্থান একই, তবে পথের বিভিন্নতা—এই মাত্র।

শয্যাশুদ্ধি

যাহারা রাত্রে শয্যায় বসিয়া জপ করিয়া থাকে, তাহাদের শয্যাশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। শয্যাশুদ্ধির মন্ত্র ও নিয়ম এই—

প্রথমে “ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা”—এই মন্ত্রে শয্যার উপরে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। স্ত্রীদেবতার

উপাসকগণ ত্রিকোণের কোণ নিম্নদিকে ও পুংদেবতার উপাসকগণ কোণ উপরদিকে রাখিবে। পরে “হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে মানস-পূজা করিয়া “হ্রীং মৃতকায় নমঃ ফট্” বলিয়া শয্যার উপরে তিনবার আঘাত ও ছোটিকা (তুড়ী) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। তদনন্তর করজোড়ে—

“ওঁ শয্যে ত্বং মৃতরূপাসি সাধনীয়াসি সাধকৈঃ।

অতোহত্র জপ্যতে মন্ত্ৰো হৃদয়াকং সিদ্ধিদা ভব ॥”

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক প্রার্থনা করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে।

মন্ত্রসিদ্ধিলাভ ও এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া যে সকল সাধকের জানিবার ইচ্ছা, প্রয়োজন হইলে শিখাইয়া দিতে পারা যায়। যাহাদের শিক্ষা ও সংসর্গ-দোষে মন্ত্র বা হিন্দুশাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস নাই, তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলে গুরুরূপায় মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা ও যোগের দু'একটি বিভূতি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি।

ক্ষমধ্বং পণ্ডিতা দোষং পরপিণ্ডোপজীবিনঃ।

মমাস্তুদ্ব্যাদিকং সর্বং শোধ্যং যুগ্মাভিরুক্তমৈঃ ॥

ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ

—•:••:•—

যোগীপুত্র

চতুর্থ অংশ—স্বরকল্প

স্বরের স্বাভাবিক নিয়ম

সর্ববর্ণসংপূজিতং সর্বগুণসমন্বিতম্ ।

ব্রহ্ম-মুখ-পঙ্কজ-জ-ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ ॥

দ্বিজরাজগামী ত্রিজগৎস্বামী নারায়ণের হৃদি-সরোজে যে দ্বিজ-
রাজের পদ-পঙ্কজ বিরাজিত, সেই দ্বিজবংশাবতংস ব্রহ্মাংশসমুত
ব্রহ্মজগণের চরণ-সরোজে নতশিরে নমস্কার করিয়া স্বরকল্প আরম্ভ
করিলাম ।

যোগসাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াবিশেষ অহুষ্ঠানপূর্বক যেমন
জীবাত্মার সহিত পরমাঙ্গার সংযোগ সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ হয়,
তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে
প্রত্যেক কার্য্যে সফল লাভ করা যায়, ভাবী বিপদাপদ ও মঙ্গলামঙ্গল

জ্ঞাত হওয়া এবং বিপদাদির হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্ৰাণ পাওয়া যায়। ভাবী রোগাদির আক্রমণ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বুঝিতে পারা যায়। বিনা ব্যয়ে স্বল্পায়াসে পীড়াদির হস্ত হইতে পরিত্ৰাণ পাওয়া যায়। ফলে স্বরজ্ঞানানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে পুঞ্জীকৃত নানা কার্য্যময় কৰ্ম্মক্ষেত্রে সকল কার্য্যেই সফল লাভ করতঃ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কাল-যাপন করা যায়।

বিশ্বপিতা বিধাতা মনুশ্যের জন্মসময়ে দেহের সঙ্গে এমন চমৎকার কৌশলপূর্ণ অপূৰ্ণ উপায় করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা জানিতে পারিলে সাংসারিক, বৈষয়িক কোন কার্য্যে বিফলমনোরথজনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না। আমরা সেই অপূৰ্ণ কৌশল জানি না বলিয়াই আমাদের কার্য্যনাশ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও রোগভোগ করিতে হয়। এই সকল বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার নাম স্বরোদয় শাস্ত্র। এই স্বরশাস্ত্র যেমন দুৰ্লভ, স্বরজ্ঞ গুরুরও তেমনি অভাব। স্বরশাস্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। আমি এই শাস্ত্র পর্যালোচনায় পদে পদে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। সমগ্র স্বরশাস্ত্র যথাযথ লিপিবদ্ধ করা এ ক্ষুদ্র পুস্তকে একান্ত অসম্ভব। কেবল সাধকগণের প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

স্বরশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

কায়ানগরমধ্যে তু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ।

দেহনগরমধ্যে বায়ু রাজাস্বরূপ। প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু গ্রহণের নাম নিঃশ্বাস এবং বায়ু পরিত্যাগের নাম প্রশ্বাস। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যুর শেষ

মুহূর্ত্ত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য হইয়া থাকে। এই শ্বাস-প্রশ্বাস আবার দুই নাসিকায় এক সময়ে সমভাবে প্রবাহিত হয় না। কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হইয়া থাকে; কচিং কখন এক-আধ মুহূর্ত্ত দুই নাসিকায় সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়। বাম নাসাপুটের শ্বাসকে ইডার বহন, দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলার বহন ও উভয় নাসাপুটে সমান ভাবে বহিলে তাহাকে সুষ্মার বহন বলে। এক নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া অল্প নাসিকা দ্বারা শ্বাস রেচনকালে বুঝিতে পারা যায় যে, এক নাসিকা হইতে সরলভাবে শ্বাসপ্রবাহ চলিতেছে, অল্প নাসাপুট বেন বন্ধ; তাহা হইতে অল্প নাসার স্রাব সরল ভাবে শ্বাস বাহির হইতেছে না। যে নাসিকার দ্বারা সরল ভাবে শ্বাস বাহির হইবে, তখন সেই নাসিকার শ্বাস ধরিতে হইবে। কোন্ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পাঠকগণ এইরূপে অবগত হইবে। ক্রমশঃ অভ্যাসবশে অতি সহজেই কোন্ নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, তাহা জানা যায়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় হইতে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবারাত্রমধ্যে বারো বার বাম, বারো বার দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমান্বয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন্ দিন কোন্ নাসিকায় প্রথমে শ্বাসের ক্রিয়া হইবে, তাহার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

যথা—

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।

প্রতিপত্তো দিনাশ্রাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে ॥

—পবনবিজয়-স্বরোদয়

শুদ্ধপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া চন্দ্র অর্থাৎ বাম নাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন

দিন ধরিয়া সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় প্রথমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ গুরুপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা—এই নয় দিনের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়-সময়ে প্রথমে বাম নাসিকায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী—এই ছয় দিনের প্রাতঃকালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস-আরম্ভ হইয়া আড়াই দণ্ড থাকিবে। পরে বিপরীত নাসিকায় উদয় হইবে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্তা—এই নয় দিন সূর্য্যোদয়-সময়ে প্রথমে দক্ষিণ নাসায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী—এই ছয় দিনে দিনমণির উদয়-সময়ে প্রথমে বাম নাসায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া আড়াই দণ্ডান্তরে অগ্র নাসায় উদয় হইবে। এইরূপ নিয়মে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাই মনুষ্য-জীবনে শ্বাস-বহনের স্বাভাবিক নিয়ম।

বহেত্তাবদ্ব্যটিমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দিশেৎ।

—স্বরশাস্ত্র

প্রতিদিন দিবারাত্র ষাট দণ্ডের মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসায় নির্দিষ্টমতে ক্রমান্বয়ে শ্বাসবহন-কালে ক্রমশঃ পঞ্চ-তত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়; ফলে সাংসারিক, বৈষয়িক সকল কার্য্যে সুফল লাভ করতঃ সুখে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা যায়।

বাম নাসিকার শ্বাসফল

যখন ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন স্থিরকর্মসকল করা কর্তব্য। সেই সময়ে অলঙ্কার ধারণ, দূরপথে গমন, আশ্রমে প্রবেশ, রাজমন্দির ও অট্টালিকা নির্মাণ এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে। দীঘি, কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় ও দেবস্তুম্ভাদি প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎকালে যাত্রা, দান, বিবাহ, নববস্ত্র পরিধান, শান্তিকর্ম, পৌষ্টিককর্ম, দিব্যৌষধিসেবন, রসায়নকার্য, প্রভুদর্শন, বন্ধুত্বসংস্থাপন এবং বহির্গমন প্রভৃতি শুভকার্যসকলের অনুষ্ঠান করিবে। বামনাসাপুটে শ্বাসবহনকালে শুভকার্যসকল করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু, অগ্নি ও আকাশতত্ত্বের উদয়সময়ে উক্ত কার্যসকলের অনুষ্ঠান করিতে নাই।

দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসফল

যখন পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন কঠিন ও ক্রুরবিচার অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকরণ, জ্ঞীসংসর্গ, বেষ্ঠাগমন, নৌকাদি আরোহণ, দুষ্টকর্ম, সুরাপান, তাত্ত্বিক মতে বীরমজ্জাদিসম্মত উপাসনা, দেশাদি ধ্বংস, বৈরীকে বিষদান, শাস্ত্রাভ্যাস, গমন, মৃগয়া, পশুবিক্রয়, ইষ্টক কাষ্ঠ পাষণ এবং রত্নাদি ঘর্ষণ ও বিদারণ, গীতাভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্র নির্মাণ, দুর্গ ও গিরি আরোহণ,

দ্যুতক্রীড়া, চৌর্য্য, হস্তী অশ্ব ও রথাদি বানে আরোহণ-শিক্ষা, ব্যায়ামচর্চা, মারণ ও উচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম সাধন, যক্ষিণী বেতাল ভূতাদি সাধন, ঔষধসেবন, লিপিলিখন, দান, ক্রয়-বিক্রয়, যুদ্ধ, ভোগ, রাজদর্শন, স্নানাহার প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মহাদেব বলিয়াছেন—বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, মোহন, বিদেহণ, ভোজন ও জীসঙ্গমে পিঙ্গলানাড়ী সিদ্ধিদায়িকা হইয়া থাকে।

স্বপ্নার স্বাসফল

উভয় নাসিকায় শ্বাসবহনকালে কোন প্রকারে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। করিলে তৎসমস্ত নিফল হইবে। সে সময় যোগাভ্যাস ও ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা কেবল ভগবান্কে স্মরণ করা কর্তব্য। স্বপ্নানাড়ী-বহনসময়ে কাহাকেও শাপ বা বর প্রদান করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞানানুসারে তিথি-নক্ষত্রানুযায়ী যথাযথ নিয়মে ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলে কোন কার্য্যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না; কিন্তু তৎসমস্ত বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমান পাঠক এই সংক্ষিপ্ত অংশ পড়িয়া যথাযথভাবে কার্য্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সফলমনোরথ হইবে।

রোগোৎপত্তির পূর্বজ্ঞান ও প্রতিকার

পূর্বের বলিয়াছি, গুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্যোদয়সময়ে প্রথমে বাম নাসিকায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্যোদয়কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু—

প্রতিপত্তো দিনান্তাহ্ৰবিপরীতে বিপর্যয়ঃ।

প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে যদি নিঃশ্বাসবায়ু নির্দিষ্ট মতের বিপরীত ভাবে উদ্ভিত হয়, তবে অমঙ্গল ঘটনা হইবে, সন্দেহ নাই। যথা—

গুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গকালে সূর্যোদয়সময়ে প্রথমে যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে পূর্ণিমামধ্যে গরমজনিত কোন পীড়া হইবে; আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে সূর্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, সেইদিন হইতে অমাবস্তার মধ্যে শ্লেষ্মাঘটিত বা ঠাণ্ডাজনিত কোন পীড়া হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দুই পক্ষ ঐক্য বিপরীত ভাবে নিঃশ্বাসবায়ু উদয় হইলে আত্মীয়-স্বজন কাহারও গুরুতর পীড়া কিম্বা মৃত্যু অথবা কোন প্রকার বিপত্তি হইবে। তিন পক্ষ উপযু্যপরি ঐক্য হইলে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু হইবে।

শুষ্ক কিম্বা কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ দিন প্রভাতে যদি ঐরূপ বিপরীত শ্বাসবহন বুঝিতে পার, তবে সেই নাসিকা কয়েক দিন বন্ধ রাখিলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এমন ভাবে সে নাসিকা বন্ধ রাখিতে হইবে, যেন সেই নাসাপুট দিয়া শ্বাস প্রবাহিত না হয়। ঐরূপ কয়েক দিন দিবারাত্র নিয়ত (স্নানাহারের সময় ব্যতীত) বন্ধ রাখিলে ঐ তিথির মধ্যে একেবারেই কোন রোগ ভোগ করিতে হইবে না।

যদি অসাবধানতা বশতঃ শ্বাসের ব্যতিক্রমে কোন পীড়া জন্মে, তবে যে পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত শুষ্কপক্ষে দক্ষিণ এবং কৃষ্ণপক্ষে বাম নাসিকায় যাহাতে শ্বাসবহন না হয়, এরূপ করিলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইবে। গুরুতর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অতি সামান্য ভাবে হইবে, আর হইলে স্বল্পদিনমধ্যে আরোগ্য হইবে। এরূপ করিলে রোগজনিত কষ্টভোগ করিতে ও চিকিৎসককে অর্থ দিতে হইবে না।

নাসিকা বন্ধ করিবার নিয়ম

নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, এই পরিমাণ পুরাতন পরিকার তুলা পুঁটুলির মত করিয়া, পরিকৃত শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মুড়িয়া মুখ শেলাই করিয়া দিবে। ঐ পুঁটুলি দ্বারা নাসিকাছিদ্রমুখ এরূপে বন্ধ করিয়া দিবে, যেন সেই নাসিকা দিয়া কিছুমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য না হইতে পারে। শ্বাসবাহনের কোনরূপ শিরোরোগ আছে কিম্বা মস্তিষ্ক দুর্বল, তাহারা তুলা

দ্বারা নাসারন্ধ্র বোধ না করিয়া, পরিষ্কার স্বচ্ছ আকড়ার পুঁটুলি দ্বারা নাসিকা বন্ধ করিবে।

যে কোন কারণে যতক্ষণ বা যতদিন নাসিকা বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন হইবে, ততক্ষণ বা ততদিন অধিক শ্রমজনক কার্য, ধূমপান, চীৎকারশব্দ, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি করা কর্তব্য নহে। বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা আমার আশ্রয় তাম্রকূটের স্বরসাল ধূমপানের স্বমধুরাস্বাদে রসনাকে বঞ্চিত করিতে রাজী নহে, তাহারা যখন তামাক খাইবে, তখন নাকের পুঁটুলি খুলিয়া রাখিবে। তামাক খাওয়া হইলে নাসারন্ধ্র বন্ধাদি দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া পূর্ববৎ পুঁটুলি দিয়া নাসিকাছিদ্র বন্ধ করিবে। যখন যে কোন কারণে নাসিকা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখনই এইরূপ নিয়মে কার্য করিতে উপেক্ষা করিও না। যেন নূতন বা অপরিষ্কৃত খানিকটা তুলা নাসা-ছিদ্রে গুঁজিয়া দেওয়া না হয়।

নিঃশ্বাস পরিবর্তনের কৌশল

কার্যভেদে ও অস্থান্য নানা কারণে এক নাসিকা হইতে অত্র নাসিকায় বায়ুর গতি পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কখন কার্যানুযায়ী নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হইবে বলিয়া বসিয়া থাকা কাহারই সম্ভবে না। স্বেচ্ছানুসারে শ্বাসের গতি পরিবর্তন করিতে শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। ক্রিয়া অতি সহজ, সামান্য চেষ্টায় শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হয়। যথা—

যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিপরীত নাসিকা বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে ; পরে সেই নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া বিপরীত নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে ; পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হইবে । যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া ঐরূপ করিলে অতি অল্প সময়ে শ্বাসের গতি পরিবর্তন করিয়া অগ্র নাসিকায় প্রবাহিত করা যায় । ঐরূপ ক্রিয়ার অল্পটান না করিয়া যে নাসাপুটে শ্বাস বহিতেছে, কেবল সেই পার্শ্বে কিছু সময় শয়ন করিয়া থাকিলেও শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হয় ।

পাঠক ! এই গ্রন্থে যে যে স্থানে নিঃশ্বাস পরিবর্তনের নিয়ম লিখিত হইবে, সেখানে এই কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্বাসের গতি পরিবর্তন করিবে । যে স্বচ্ছানুসারে এই বায়ু রোধ ও রেচন করিতে পারে, সেই পবনকে জয় করিয়া থাকে ।

বশীকরণ

আধুনিক অনেক ব্যক্তিকে বশীকরণ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে দেখা যায় । অনেকে সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে অগ্রে ঐ প্রার্থনা করিয়া থাকে । বশীকরণ-বিদ্যা তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে যেরূপ উক্ত আছে, তদনুসারে যথাযথ কার্য সম্পন্ন করা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে ।

বশীকরণ-প্রকরণে নিঃশ্বাসের মত সহজ ও অব্যর্থফলদায়ক আর কিছু নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য দু'একটি ক্রিয়া লিখিত হইল।

চন্দ্রঃ সূর্য্যেণ চাক্ষুষ্য স্থাপয়েজ্জীবমণ্ডলে ।

আজন্মবশগা বামা কথিতোহয়ং তপোধনৈঃ ॥

সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা চন্দ্রনাড়ীকে (ইড়াকে) আকর্ষণপূর্ব্বক হৃদয়স্থ বায়ুর সহিত সংস্থাপন করিয়া যে বামাকে ভাবনা করিবে, সেই ব্রহ্মণী আজীবন সাধকের বশীভূত থাকিবে।

জীবেন গৃহতে জীবো জীবো জীবন্ত দীয়তে ।

জীবস্থানে গতো জীবো বালা জীবনান্তবশকুং ॥

প্রথমে পূরক, পরে রেচক, তদনন্তর কুম্ভকপূরঃসর যে বামাকে চিন্তা করিবে, সে জীবনাবধি বশীভূত থাকিবে।

রাত্রৌ চ যামবেলায়াং প্রশ্লুপ্তে কামিনীজনে ।

ব্রহ্মবীজং পিবেদ্ যন্তু বালাজীবহরো নরঃ ॥

প্রহরেক নিশাযোগে কুলকুণ্ডলিনীদেবীর নিদ্রাকালে ব্রহ্মবীজ অর্থাৎ শ্বাসবায়ু পান করিয়া তাহার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধক যে নায়িকাকে ভাবনা করিবে, সেই নায়িকা আজীবন তাহার বশীভূত থাকিবে।

উভয়োঃ কুম্ভকং কৃত্বা মুখে শ্বাসো নিপীয়তে ।

নিশ্চলা চ যদা নাড়ী দৈবকন্যাবশং কুরু ॥

কুম্ভকপূর্ব্বক মুখদ্বারা নিঃশ্বাসবায়ু পান করিবে; এইরূপ করিতে করিতে যখন নিঃশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া থাকিবে, তখন যাহাকে ভাবনা করিবে, সে-ই বশীভূত হইবে। এই প্রক্রিয়ায় দেবকন্যাকে পর্য্যন্ত সাধক বশীভূত করিতে পারিবে।

বশীকরণ-প্রকরণে অনেক অব্যর্থফলপ্রদ ক্রিয়া লিখিত আছে, কিন্তু তৎসমস্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্তব্য বোধ করি না। পশুপ্রকৃতির মনুষ্য স্বীয় পাশব বৃত্তি চরিতার্থতামানসে ইহা প্রয়োগ করিতে পারে। যে কামরিপুর উত্তেজনায শিবোক্ত শাস্ত্রবাক্যের অপব্যবহার করে, তাহার তুল্য নারকী ত্রিজগতে নাই। অনেকে পুস্তকদৃষ্টে এই ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করিতে গিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী হয়; কিন্তু রীতিমত অহুষ্ঠানের ক্রটিতে যে ফল হয় না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।*

বশীকরণকার্যে মেঘচর্শ্বের আসন, কামদা নামক অগ্নি, মধু ঘৃত ও থৈ দ্বারা হোম, পূর্বমুখে বসিয়া জপ, প্রবাল হীরক বা মণির মালায় অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলি দ্বারা চালনা করিতে হয়; বায়ুতত্ত্বের উদয়ে, দিবসের পূর্বভাগে, মেঘ কণ্ঠা ধনু বা মীন লগ্নে, উত্তরভাদ্রপদ মূল। শতভিষা পূর্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্রে, বৃহস্পতি বা সোমবারযুক্ত অষ্টমী নবমী বা দশমী তিথিতে এবং বসন্তকালে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই কার্যে “বাণী” দেবতা এবং কলিতে মন্ত্রসংখ্যা চতুর্গুণ জপ করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে কাজ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফললাভ করিতে পারিবে। স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে যাইলে সফল-আশা ছুরাশা মাত্র। নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রিয়া করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিও, কিন্তু সাবধান!—কেহ যেন পাপানুসন্ধিস্থ হইয়া এই কার্য্যের অহুষ্ঠান করিয়া পরকালের পথ কষ্টকাকীর্ণ করিও না।

* তত্ত্বোক্ত অধিকার ও কার্য্যানুষ্ঠানগুলি মৎপ্রণীত “তান্ত্রিক গুরু” পুস্তকে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। অনধিকারী কেবলমাত্র কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ফল পাইবে কিরূপে?

বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য

অনিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা যেমন মানবদেহে রোগোৎপত্তি হয়, তেমনি ঔষধ ব্যবহার না করিয়াও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা রোগ নিরাময়ের উপায় নির্দ্ধারিত আছে। আমরা সেই ভগবৎ-প্রদত্ত সহজ কৌশল জানি না বলিয়া দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ ও অনর্থক চিকিৎসককে অর্থ দিয়া থাকি। আমি দেশপর্যটনকালে সিদ্ধযোগী মহাত্মাগণের নিকট বিনা ঔষধে রোগ-শান্তির সূক্ষ্মকৌশল শিক্ষা করি; পরে বহু পরীক্ষায় তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহার মধ্য হইতে কতিপয় অপূর্ব কৌশল প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ পশ্চাল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবে। দীর্ঘকাল রোগবিক্ষণা ভোগ, অর্থব্যয় কিম্বা ঔষধ দ্বারা উদর বোঝাই করিতে হইবে না। এই স্বরশাস্ত্রোক্ত কৌশলে একবার আরোগ্য হইলে সে রোগের আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। পাঠকগণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

জ্বর—

জ্বর আক্রমণ করিলে কিম্বা আক্রমণের উপক্রম বুঝিতে পারিলে তখন যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত জ্বর আরোগ্য ও শরীর সুস্থ না হয়, তাবৎ ঐ নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। দশ পনের দিন ভুগিবার মত জ্বর পাঁচ সাত দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। আর জ্বরকালে মনে মনে সর্বদা রূপার ত্রায় ষ্ঠেতবর্ণ ধ্যান করিলে শীঘ্র ফললাভ হয়।

নিসিন্দার মূল রোগীর হাতে বাঁধিলে সর্ববিধ জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

পালাজর—

শ্বেত অপরাজিতা কিম্বা বকফুলের কতকগুলি পাতা হাতে রগড়াইয়া কাপড় দিয়া মুড়িয়া পুঁটলি করিয়া, জ্বরের পালার দিন ভোরবেলা হইতে ভ্রাণ লইলে পালাজর বন্ধ হইবে।

মাথাধরা—

মাথা ধরিলে দুই হাতের কনুইয়ের উপর কাপড়ের পাড় বা দড়ি দ্বারা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পাঁচ সাত মিনিটে মাথাধরা আরোগ্য হইবে। একরূপ জোরে বাঁধিতে হইবে যেন রোগী হাতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে। যন্ত্রণা আরোগ্য হইলে বাঁধন খুলিয়া দিবে।

আর একরূপ মাথাধরা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ ‘আধ্বকপালে মাথাধরা’ বলে। কপালের মধ্যস্থান হইতে বাম বা দক্ষিণ দিকের অর্দ্ধেক কপাল ও মস্তকে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়। প্রায়ই এই পীড়া সূর্যোদয়কালে আরম্ভ হইয়া বেলা যত বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণাও তত বাড়িতে থাকে ; অপরাহ্নে কমিয়া যায়। এই রোগে আক্রমণ করিলে যে পার্শ্বের কপালে যন্ত্রণা হইবে, সেই পার্শ্বের হাতের কনুইয়ের উপর পূর্বোক্ত প্রকারে জোরে বাঁধিয়া রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্রণা উপশম ও রোগ শান্তি হইবে। পরের দিন যদি আবার মাথা ধরে এবং প্রত্যহ একই নাসিকায় নিঃশ্বাস বহনকালে মাথাধরা আরম্ভ হয়, তবে মাথাধরা বৃদ্ধিতে পারিলেই সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে এবং পূর্বমত হাত বাঁধিয়া দিবামাত্র আরাম হইবে। আধ্বকপালে মাথাধরায় এই ক্রিয়া করিলে আশ্চর্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শিরঃপীড়া—

শিরঃপীড়াগ্রস্ত রোগী ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসাপুটে শীতল জল পান করিবে ; ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে, মাথা ধরিবেনা বা সর্দি লাগিবে না। এই ক্রিয়া বিশেষ কঠিনও নহে। একটা পাত্রে শীতল জল রাখিয়া তাহার মধ্যে নাসিকা ডুবাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গলার ভিতর জল টানিতে হয়। অভ্যাসে ক্রমশঃ সহজ হইয়া যায়। এই পীড়া হইলে চিকিৎসক রোগীর আরোগ্য-আশা পরিত্যাগ করে ; রোগীও বিষম কষ্ট পাইয়া থাকে ; কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভ করিবে।

উদরাময়, অজীর্ণাদি—

অন্ন, জলখাবার প্রভৃতি যখন বাহ্য আহার করিবে, তাহা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস-বহনকালে করা কর্তব্য। প্রত্যহই এই নিয়মে আহার করিলে অতি সহজে জীর্ণ হয়, কখনও অজীর্ণ রোগ জন্মিবে না। যাহারা এই রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহারাও প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবে এবং ক্রমে রোগও আরাম হইবে। আহারান্তে কিছু সময় বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। যাহাদের সময় অল্প, তাহারাও আহারান্তে যাহাতে দশ পনের মিনিট দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ পূর্বোক্তনিয়মে তুলা দ্বারা নাসিকা বদ্ধ করিয়া দিবে। গুরুভোজন হইলেও এই নিয়মে শীঘ্র জীর্ণ হয়।

স্থিরভাবে বসিয়া একদৃষ্টে নাভিমণ্ডলে দৃষ্টিপূর্বক নাভিকন্দ ধ্যান করিলে এক সপ্তাহে উদরাময় আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বাসরোধপূর্বক নাভি আকর্ষণ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ একশত বার মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিলে আমাদি উদরাময়সজ্জাত সকল পীড়া আরোগ্য হয় এবং জঠরাগ্নি ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

প্লীহা—

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া এবং প্রাতে শয্যাভ্যাগের সময় হস্ত ও পদ সঙ্কোচ করিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর এপার্শ্বে ওপার্শ্বে আড়ামোড়া ফিরিয়া সর্বশরীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিতে থাকিবে। প্রত্যহ চারি পাঁচ মিনিট ঐরূপ করিলে প্লীহা-যক্ং আরোগ্য হইবে। চিরদিন ঐরূপ অভ্যাস থাকিলে প্লীহা-যক্ং রোগের জন্ম কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

দন্তরোগ—

প্রত্যহ যতবার মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, ততবার দুইপাটা দাঁত একত্র করিয়া একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। যতক্ষণ মল কিম্বা মূত্র নিঃসরণ হয়, ততক্ষণ দাঁতে দাঁতে চাপিয়া রাখা কর্তব্য। দুই চারি দিন ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হইবে। চিরদিন ঐরূপ অভ্যাস করিলে, দন্তমূল দৃঢ় ও দীর্ঘকাল কার্যক্ষম থাকে এবং দন্তের কোনরূপ পীড়া হইবার ভয় থাকে না।

ফিক্বেদনা—

বুকে, পিঠে বা পার্শ্বে—যে কোন স্থানে ফিক্বেদনা বা অস্থি কোন প্রকার বেদনা হইলে, যেমন বেদনা বুঝিতে পারিবে, অমনি কোন্ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিও, তাহা হইলে দুই চারি মিনিটে নিশ্চয়ই বেদনা আরোগ্য হইবে।

হাঁপানি—

যখন হাঁপানি বা শ্বাস প্রবল হইবে, তখন যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া অত্র নাসিকায় নিঃশ্বাসের গতি প্রবর্তিত করিবে; তাহা হইলে দশ পনের মিনিটে টান কমিয়া যাইবে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে একমাস মধ্যে পীড়াশান্তি হইবে। দিবসের মধ্যে যত অধিক সময় ঐ ক্রিয়া করিবে, তত শীঘ্র ঐ রোগ আরোগ্য হইবে। হাঁপানির মত কষ্টদায়ক পীড়া নাই, হাঁপানি বৃদ্ধির সময় এই নিয়ম পালন করিলে, কোনরূপ ঔষধ সেবন না করিয়াও আশ্চর্যরূপে আরোগ্য হইবে।

বাত—

প্রত্যেক দিন আহারান্তে চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়াইবে। একরূপভাবে চিরুণী চালনা করিবে যেন মস্তকে চিরুণীর কাঁটা স্পর্শ হয়। তৎপরে বীরাসনে অর্থাৎ দুই পা পশ্চাৎ দিকে মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া পনের মিনিট বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ দুই বেলা আহারের পর একরূপ বসিয়া থাকিলে যতদিনের বাত হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। একরূপ ভাবে বসিয়া পান-তামাক খাইতেও ক্ষতি নাই। সুস্থ ব্যক্তি ঐ নিয়ম পালন করিলে বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না; বলা বাহুল্য রবারের চিরুণী ব্যবহার করিও না।

চক্ষুরোগ—

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্বাগ্রে মুখের ভিতর যত জল ধরে, তত জল রাখিয়া, অত্র জল দ্বারা চক্ষুতে বিশবার ঝাপটা দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

প্রত্যেক দিন দুই বেলা আহারান্তে আচমন-সময়ে অন্ততঃ সাতবার চক্ষুতে জলের ঝাপটা দিবে।

যতবার মুখে জল দিবে, ততবার চক্ষু ও কপাল ধুইভে
ভুলিবে না।

প্রত্যহ স্নানকালীন তৈলমর্দনের সময় অগ্রে দুই পায়ের বৃদ্ধাস্থলির
নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে তৈল মাখিবে।

এই কয়েকটি নিয়ম চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতে
দৃষ্টিশক্তি সতেজ ও চক্ষু স্নিগ্ধ থাকে এবং চক্ষুর কোন পীড়া হইবার
সম্ভাবনা থাকে না। চক্ষু মহুশ্বের পরম ধন; অতএব প্রত্যহ এই
নিয়ম পালন করিতে কেহ ওদাস্য করিও না।

বর্ষফল নির্ণয়

চৈত্রমাসীয় শুক্লাপ্রতিপদ তিথির দিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ চান্দ্র
বৎসর আরম্ভ হইবার সময়ে এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ-প্রারম্ভে
বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তত্ত্বসাধনের ভেদাভেদ নিরূপণ ও নিরীক্ষণ করিবে।
যদি ঐ সময়ে চন্দ্রনাড়ী প্রবাহিত হয় এবং পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব কিম্বা
বায়ুতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে বহুমতী সর্বশস্ত্রশালিনী হইয়া দেশে
সুভিক্ষ উপস্থিত হইবে। আর যদি অগ্নিতত্ত্বের কি আকাশতত্ত্বের
উদয় পরিলক্ষিত হয়, তবে পৃথিবীতে বিষম ভয় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়া
থাকে। উক্ত সময়ে যদি স্রুম্মা নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা
হইলে সর্বকার্য পণ্ড, পৃথিবীতে রাষ্ট্রবিপ্লব, মহারোগ ও কষ্টযন্ত্রণাদি
উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেঘ-সংক্রমণ-দিনে অর্থাৎ মহাবিশুব-সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে যদি পৃথিবী-তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে স্বর্গাষ্টি, রাজ্যবৃদ্ধি, স্বভিক্ষ, স্বখ-সৌভাগ্যবৃদ্ধি এবং পৃথিবী বহুশস্ত্রশালিনী হয়। জল-তত্ত্বের উদয়েও ঐরূপ ফল জানিবে। যদি অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তবে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, অগ্নিবৃষ্টি এবং দারুণ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ুতত্ত্বের উদয় হইলে উৎপাত, উপদ্রব, ভয়, অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়, আর আকাশতত্ত্বের উদয়ে মানবের উদগার, সন্তাপ, জ্বর ও ভয় এবং পৃথিবীতে শস্ত্রহানি হইয়া থাকে।

পূর্বে প্রবেশনে স্বাসে স্ব-স্ব-তত্ত্বেন সিদ্ধিদঃ।

—স্বরোদয় শাস্ত্র

মেঘসংক্রান্তিকালে যখন যেদিকেই নাসাপুট বায়ুপূর্ণ থাকে অথবা নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবেশ করে, সেই সময়ে যদি সেই সেই নাসিকায় নির্দিষ্ট মত তত্ত্বসকলের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরের ফল শুভজনক হইয়া থাকে। অন্ত্যায় অন্তঃ জানিবে।

যাত্রা-প্রকরণ

কোন স্থানে কোন কার্যোপলক্ষে যখন যাত্রা করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যেদিকের নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বামাচারপ্রবাহেন ন গচ্ছেৎ পূর্ব উত্তরে ।

দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে ॥

— গবনবিজয়-স্বরোদয়

যখন বাম নাসিকায় শ্বাস চলিতে থাকিবে, তখন পূর্ব ও উত্তর দিকে গমন করিবে না এবং যখন দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাত্রা করিবে না। ঐসকল দিকে ঐ ঐ সময়ে যাত্রা করিলে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, এমন কি যাত্রাকারীর আর গৃহে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

যদি সম্পদ-কার্য্যের জন্ত যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে ইড়া নাড়ীর বহনকালে গমন করিলে শুভফল লাভ করিতে পারিবে। আর যদি কোনরূপ বিষম অর্থাৎ ক্রুরকর্ম সাধনের জন্ত গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যখন পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহিত হইবে, সেই সময় যাত্রা করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি শুক্র ও শনি-বারে কোন স্থানে গমন করিলে মৃত্তিকাতে সাত বার, আর অন্ত যে কোন বারে যাত্রা করিতে হইলে একাদশ বার ভূতলে পাদপ্রক্ষেপ করতঃ যাত্রা করিবে, কিন্তু বৃহস্পতিবারে কোন কার্য্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে অর্দ্ধপদ মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া যাত্রা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারা যায়। কোন কার্য্যোদ্দেশ্যে যদি শীঘ্র গমন করিবার আবশ্যক হয়, কুশল কার্য্যেই হউক, শত্রুসহ কলহেই হউক, কি কোন ক্ষতিনিবারণার্থেই হউক, যাত্রা করিতে হইলে তৎকালে যে দিকের নাসিকায় নিঃশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই দিকের অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে হইবে, পরে সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া সে সময়ে চন্দ্রনাড়ী বহিতে থাকিলে চারিবার

এবং সূর্য্যনাড়ী বহিতে থাকিলে পাঁচবার মৃত্তিকাতে পদনিষ্ক্ষেপ করিয়া গমন করিবে। এইরূপ নিয়মে যাত্রা করিলে তাহার সহিত কাহারও কলহ হয় না এবং তাহার কোন হানিও হয় না, এমন কি তাহার পায়ে একটি কণ্টকও বিদ্ধ হয় না। সে ব্যক্তি সর্ব্ব আপদ-বিপদ-বিবর্জিত হইয়া সুখে, স্বচ্ছন্দে, নিরুদ্ধেগে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে—শিববাক্যে সন্দেহ নাই।

কোন কোন স্বরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন, দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে চন্দ্রনাড়ীই মঙ্গলজনক এবং নিকটস্থ স্থানে গমন করিতে হইলে সূর্য্যনাড়ীই কল্যাণকর। সূর্য্যনাড়ী দক্ষিণ নাসায় প্রবেশ কালে যাত্রা করিতে পারিলে শীঘ্রই কার্য্যোদ্ধার হইয়া থাকে।

আক্রম্য প্রাণপবনং সমারোহেত বাহনম্।

সমুত্তরেৎ পদং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥

—স্বরোদয়-শাস্ত্র

কোনরূপ যানারোহণ করিয়া কোন কার্য্যে গমন করিতে হইলে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া গমন করিবে, তৎকালে যেদিকের নাসায় শ্বাস বহন হয় সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যানারোহণ করিবে; তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু বায়ু, অগ্নি বা আকাশতত্ত্বের উদয়ে গমন করিবে না। স্বর-জ্ঞানানুসারে যাত্রা করিলে শুভযোগের ক্ষণ ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

গর্ভাধান

ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ দিন পর্যন্ত গর্ভধারণের কাল ॥ ঋতুস্রাতা স্ত্রী সূর্য-চন্দ্রসংযোগে পৃথিবীতত্ত্ব কি জলতত্ত্বের উদয়কালে শঙ্খবল্লী ও গোহৃৎ পান করতঃ স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া স্বামীর নিকট পুত্রকামনা করিবে। সূর্য্যনাড়ী ও চন্দ্রনাড়ীকে একত্র সংযুক্ত করতঃ ঋতু রক্ষা করিলে পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। চন্দ্র-সূর্য্যসংযোগে অর্থাৎ রাত্রিকালে যখন পুরুষের সূর্য্যনাড়ী বহিবে, তখন যদি স্ত্রীর চন্দ্রনাড়ী বহে, তবে সেই সময় উভয়ে সঙ্গত হইবে।

বিষমাস্কে দিবারাত্রৌ বিষমাস্কে দিনাধিপঃ।

চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বক্ষ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥

— স্বরোদয়-শাস্ত্র

কি দিবা, কি রাত্রিতে যদি সুষ্মানাদী বহিতে থাকে, অথবা সূর্য্যনাড়ী বহে, আর সেইকালে যদি অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, সেই সময় ঋতুরক্ষা হইলে বক্ষ্যা নারীও পুত্রবতী হইবে। যখন সুষ্মানাদী দক্ষিণ নামায় প্রবাহিত হয়, সেই সময় ঋতুরক্ষা করিলে পুত্র জন্মিবে, কিন্তু হীনাক্ষ ও ক্লশ হইবে। স্ত্রী-পুরুষের একই নামায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত থাকিলে গর্ভ হইবে না। জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি হইবে, সে ধনী, সুখী ও ভোগী হইবে এবং তাহার যশঃকীর্ত্তি দিগ্দিগন্তব্যাপিনী হইবে। পৃথিবী-তত্ত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে সন্তান অতি ধনী, সুখী ও সৌভাগ্যশালী হইবে। পৃথিবী-তত্ত্বের উদয়ে গর্ভ হইলে পুত্র এবং জল-তত্ত্বের উদয়ে গর্ভ হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে। অগ্নি, বায়ু ও আকাশ-তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভপাত হইবে, অথবা সেই গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বিনষ্ট হইবে।

কার্য্যসিদ্ধিকরণ

কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্ত কাহারও নিকট গমন করিতে হইলে, যে নাসিকায় শ্বাসবহন হইতেছে, সেই দিকের পা অগ্রে বাড়াইয়া গমন করিবে। কিন্তু বায়ু, অগ্নি, কিম্বা আকাশ-তত্ত্বের উদয়ে যাত্রা করিবে না। তদনন্তর গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, যাহার নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে, তাহাকে সেই দিকে রাখিয়া কথাবার্তা বলিলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। চাকুরী প্রভৃতির উমেদারী করিতে যাইয়া এই নিয়মে কার্য্য করিলে সফল লাভ করিতে পারিবে।

মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে উপরোক্ত নিয়মে বিচারকের নিকট এজাহারাদি প্রদান করিলে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারা যায়।

প্রভু বা উদ্ধতন কর্মচারীর সহিত যখনই কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত থাকিবে, তাহাদের সেই পার্শ্বে রাখিয়া কথাবার্তা বলিবে, তাহা হইলে মনিবের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। দাসত্ব-উপজীবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা কম সুবিধার বিষয় নহে। তাহাদের সম্বন্ধে এই ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

যে দিকের নাসিকায় নিশ্বাসবায়ু বহিতে থাকে, সেই দিক আশ্রয়। পূর্বক যে কোন কার্য্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।
কিন্তু—

শত্রু-বশীকরণ

কার্য্যে তদ্বিপরীত ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ যে নাসিকায় নিশ্বাসবায়ু বহিতে থাকিবে, শত্রুকে তাহার বিপরীত

পার্শ্বে রাখিয়া কথাবার্তা বলিবে, তাহা হইলে ঘোর শত্রুও ভোগার অনুকূলে কার্য্য করিবে।

উভয়োঃ কুন্তকং কৃত্বা মুখে শ্বাসো নিপীয়তে।

নিশ্চলা চ যদা নাড়ী ঘোরশত্রুবশং কুরু ॥

— পবনবিজয়-স্বরোদয়

কুন্তকপূর্বক মুখ দ্বারা নিঃশ্বাসবায়ু পান করিবে, এইরূপ করিতে করিতে যখন নিঃশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া থাকিবে, তখন শত্রুকে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ ঘোর শত্রুও তাহার বশীভূত হইয়া যাইবে। চন্দ্রনাড়ী বহন সময়ে বামদিকে, সূর্য্যনাড়ী বহিবার কালে দক্ষিণ দিকে এবং সুষুম্না চলিবার কালে মধ্যভাগে থাকিয়া কার্য্য করিলে বিবাদে জয়লাভ করিতে পারা যায়।

যত্র নাড্যাং বহেদ্বায়ুস্তদন্তঃ প্রাণমেব চ।

আকৃশ্য গচ্ছেৎ কর্ণান্তং জয়ত্যেব পুরন্দরম্ ॥

— যোগ-স্বরোদয়

যে নাড়ীতে বায়ু বহন হয়, তন্মধ্যস্থিত প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ আকর্ষণ পূর্বক যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের চরণ অগ্রে ক্ষেপণপূর্বক গমন করিলে শত্রুকে পরাভব করিতে পারিবে।

অগ্নি-নিব্বাপনের কৌশল

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর আগুন লাগিয়া অনেকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। নিম্নলিখিত উপায়টী জানা থাকিলে অতি সহজে ও অত্যাশ্চর্য্যরূপে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা যায়।

আগুন লাগিলে যে দিকে তাহার গতি, সেই দিকে দাঁড়াইয়া যে নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসিকা দ্বারাই জল পান করিবে। একটা ছোট ঘটিতে করিয়া বাহার তাহার দ্বারা আনীত জলে ঐ কার্য্য হইতে পারে। তদনন্তর সপ্তরতি জল—

“উত্তরশ্রাধ দিগভাগে মারীচো নাম রাক্ষসঃ ।

তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হতো বহিঃ স্তম্ভ স্নাহা ॥”

এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। এই কার্য্যটা না করিয়া কেবলমাত্র উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সুফল লাভ করিতে পারিবে। আমরা বহুবার ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, অনেকের ধন-সম্পত্তিও রক্ষা হইয়াছে।

রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল

বধানিয়মে প্রত্যহ শীতলীকুস্তক করিলে কিছুদিনে শরীরের রক্ত-পরিষ্কার ও শরীর জ্যোতির্বিশিষ্ট হয়। শীতলীকুস্তকের নিয়ম—

জিহ্বয়া বায়ুমাক্ষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ ।

ক্ষণঞ্চ কুস্তকং কৃৎবা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ ॥

—গোরক্ষমংহিতা

জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ ঠোট দু'খানি সরু করিয়া বাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপন আপন দমভোর বায়ু টানিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গিলিবার মত করিয়া বায়ুকে উদরে চালনা কর; পরে ক্ষণকাল ঐ বায়ুকে কুস্তক দ্বারা ধারণ করিয়া উভয় নাসা দ্বারা রেচন করিবে। এইরূপ নিয়মে বারম্বার বায়ু টানিলে কিছুদিন পরে রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর কন্দর্পসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট হইবে। শীতলীকুস্তক করিলে অজীর্ণ ও কফ-পিত্তাদি রোগ জন্মিতে পারে না। চর্মরোগ প্রভৃতি রোগে রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবহার না করিয়া, তৎপরিবর্তে এই ক্রিয়া করিয়া দেখিবে, সালসা অপেক্ষা শীঘ্র স্থায়ী স্ফল লাভ করিতে পারিবে।

প্রত্যহ দিবা-রাত্রের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারি বার পাঁচ সাত মিনিট স্থিরভাবে বসিয়া ঐরূপ মুখ দিয়া বায়ু টানিতে ও নাসিকা দ্বারা ছাড়িতে হইবে। ফলে যত বেশী বার ঐরূপ করিতে পারিবে, তত শীঘ্র স্ফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

ময়লা, আবর্জনাদিপূর্ণ বায়ুদূষিত স্থানে, বৃক্ষতলে, কেরোসিন তৈল দ্বারা আলো-জ্বালিত গৃহে ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে এই ক্রিয়া করা কর্তব্য নহে। বায়ুরেচনান্তে হাঁপাইতে না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে স্থিরাননে উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে রেচক ও পূরকের কার্য করিবে।

ঐ প্রক্রিয়ায় দুর্জয় শূলবেদনা এবং বুক, পেট প্রভৃতিতে যে কোন আভ্যন্তরীণ বেদনা থাকিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

কয়েকটা আশ্চর্য্য সঙ্কেত

১। জ্বর হউক কিম্বা কোন প্রকার বেদনা, কি ফোর্টক, ব্রণাদি যাহাই হউক, কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে পারিলে তখন যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিবে। যতক্ষণ বা যতদিন শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন সেই নাক বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শীঘ্র শরীর সুস্থ হইবে, বেশীদিন ভুগিতে হইবে না।

২। রাস্তা চলিয়া বা কোন প্রকার পরিশ্রমজনক কার্য্যান্তে শরীর শ্রান্ত-ক্লান্ত হইলে অথবা তজ্জনিত ধাতু গরম হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিবে; তাহা হইলে অচিরে—অতি অল্প সময়ে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর সুস্থ হইবে।

৩। প্রত্যহ আহারান্তে আচমন করিয়া চিরুণীদ্বারা চুল আঁচড়াইবে। চিরুণী এমন ভাবে চালাইবে যে, তাহার কাঁটা মস্তক স্পর্শ করে। ইহাতে শিরঃপীড়া ও উর্দ্ধগ সঘঙ্কীয় কোন পীড়া এবং বাতব্যাদি জন্মিবার ভয় থাকিবে না। ঐরূপ কোন পীড়া থাকিলেও তাহা বৃদ্ধি হইবে না; বরঞ্চ ক্রমে আরোগ্য হইবে। শীঘ্র চুল পাকিবে না।

৪। প্রথর রৌদ্রের সময় কোন স্থানে যাইতে হইলে, কমাল, চাদর বা তোয়ালে প্রভৃতির দ্বারা কর্ণদুইটা আচ্ছাদন করিয়া, রৌদ্র-মধ্যে হাঁটিলে রৌদ্রজনিত কোন দোষ শরীর স্পর্শ করিবে না এবং রৌদ্রতাপে শরীর তাপিত বা ক্লিষ্ট হইবে না। কর্ণদুইটা এরূপে

আচ্ছাদন করা কর্তব্য যে, সমস্ত কাণ ঢাকা পড়ে এবং কাণে বাতাস না লাগে।

৫। স্মরণশক্তি হ্রাস হইলে, মস্তকের উপর একখানি কাষ্ঠকীলক রাখিয়া, তাহার উপর আর এক খণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া, ধীরে ধীরে তাহাতে আঘাত করিবে।

৬। প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টা পদ্মাসনে বসিয়া দন্তমূলে জিহ্বাগ্র চাপিয়া রাখিলে সর্বব্যাদি বিনষ্ট হয়।

৭। ললাটোপরি পূর্ণচন্দ্রদৃশ জ্যোতির্ধ্যান করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং কুষ্ঠাদি আরোগ্য হয়। সর্বদা দৃষ্টির অগ্রে পীতবর্ণ উজ্জল জ্যোতির্ধ্যান করিলে বিনা ঔষধে সর্বরোগ আরোগ্য ও দেহ বলি-পলিবিহীন হয়। মাথা গরম হইলে বা ঘুরিতে থাকিলে মস্তকে শ্বেতবর্ণ ও পূর্ণ শরচ্ছন্দ্র ধ্যান করিলে পাচ সাত মিনিটে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবে।

৮। তৃষ্ণার্ত হইলে জিহ্বার উপরে অন্নরসবিশিষ্ট দ্রব্য আছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। শরীর উষ্ণ হইলে শীতল বস্ত্র এবং শীতল হইলে উষ্ণ বস্ত্র ধ্যান করিবে।

৯। প্রত্যহ দুইবেলা স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাভিদেশে একদৃষ্টে চাহিয়া, নাভিতে বায়ু ধারণ ও নাভিকন্দ্র ধ্যান করিলে অগ্নিমান্দ্য, হুরারোগ্য অজীর্ণ ও উৎকট অতিসার ইত্যাদি সর্বপ্রকার উদরাময় নিশ্চয় আরোগ্য এবং পরিপাকশক্তি ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধিত হয়।

১০। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইবে, সেই দিকের করতল মুখে সংস্থাপন করিয়া শয্যা হইতে উঠিলে বায়ুসিদ্ধি হইয়া থাকে।

১১। রক্ত অপাটার্গের মূল হস্তে ধারণ করিলে ভূত-প্রেতা-দি-সম্ভূত সর্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয়।

১২। তেঁতুলের চারা তুলিয়া তাহার মূল গর্ভিণীর সম্মুখস্থ চুলে বাঁধিয়া দিবে, বাহাতে ঐ মূলের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় ; তাহা হইলে গর্ভিণী তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব করিবে। প্রসবমাত্রে চুলসমেত ঐ তেঁতুলমূল কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিও, নতুবা প্রসূতির নাড়ী পর্য্যন্ত বাহির হইবার সম্ভাবনা। যখন গর্ভিণী প্রসববেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, সে সময় ব্যস্ত না হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিও। শ্বেতপুনর্নবার মূল চূর্ণ করিয়া জননেন্দ্রিয়ের ভিতর দিলে গর্ভিণী শীঘ্র সুখে প্রসব করিতে পারে।

১৩। যে দিবাভাগে বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন রাখে, তাহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না ; আলস্য দূরীভূত ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। দশ পনের দিন তুলা দ্বারা ঐরূপ অভ্যাস করিলে, পরে আপনা হইতেই ঐরূপ নিয়মে নিঃশ্বাসের গতি হইবে।

১৪। প্রাতে ও বৈকালে কাগ্জ লেবুর পাতার ত্রাণ লইলে পুরাতন ও ঘুসঘুসে জ্বর আরোগ্যে হয়।

১৫। প্রত্যহ একচিন্তে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণাদির ধ্যান করিলে দেহস্থ সমস্ত বিকার নষ্ট হয়। এইজন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হিন্দুর নিত্যাধ্যায়। ব্রাহ্মণগণ নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিলে সর্বরোগমুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে জীবনযাপন করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, অস্বদেশীয় দ্বিজগণের মধ্যে অনেকে সন্ধ্যাদি করিয়া সময়ের অপব্যয় করে না। যাহারা করে, তাহারাও উপযুক্তরূপে সন্ধ্যাদি করিতে জানে না। সন্ধ্যার উদ্দেশ্য কি—এমন কি সন্ধ্যা-গায়ত্রীর অর্থাদি

পর্যন্ত জানে না; প্রাণায়ামাদিও উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। সন্ধ্যার সংস্কৃত বাক্যাবলী আওড়ানো, এই পর্যন্ত—নতুবা সন্ধ্যাদি দ্বারা কি করিতেছে, ছাইভস্ম, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে না। আমার বিশ্বাস, ভাব হৃদয়ঙ্গম না হইলে ভক্তি আসিতে পারে না; ঐরূপ সন্ধ্যা করা অপেক্ষা ভক্তিযুত চিত্তে আপন ভাষায় হৃদয়ের প্রার্থনা ভগবান্কে জানাইলে অধিক সফলের আশা করা যায়। পরমেশ্বর আর তো মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা শব্দ বুঝিতে পারিবেন না? সন্ধ্যায় প্রাণায়াম যেরূপ বিধিবদ্ধ আছে, তাহাতে প্রাণায়ামক্রিয়া এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ধ্যানে যথাক্রমে লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের চিন্তা—এই দুই মহতী ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার এক-একটি ক্রিয়ার কত গুণ, তাহা কেহই বুঝে না। আবার ত্রিসন্ধ্যার গায়ত্রীর ধ্যানেও ঐরূপ বর্ণ-চিন্তা হইয়া থাকে। আর্ধ্য-ঋষিগণের সন্ধ্যা-পূজাদির মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না, অথচ নিজের স্বস্থ বুদ্ধির মুন্সিয়ানা চালে ঐ সমস্ত বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপবাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি। নিশ্চয় জানিও—হিন্দু-দেবদেবীর নানা মূর্তি ও নানা বর্ণ যাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তাহা বৃথা নহে। সকল প্রকার ধর্মসাধন ও তপস্তার মূল—স্বস্থ শরীর। শরীর স্বস্থ না থাকিলে ও দীর্ঘজীবী না হইলে ধর্মসাধন এবং অর্থোপার্জনাদি কিছুই হয় না। অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্ধ্যঋষিগণ শরীর স্বস্থ ও পরমার্থ সাধন করিবার সহজ উপায়স্বরূপ দেব-দেবীর নানা বর্ণ নির্দেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা-উপাসনার সময় শ্বেত, রক্ত ও শ্রামাদি বর্ণের ধ্যান করিতে হয়। তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ—এই ত্রিধাতু সাম্য হয় ও শরীর স্বস্থ থাকে। এই জন্ত সেকালের ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ কত অনিয়মে থাকিয়াও

সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইতেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শিরঃস্থিত গুরুজ্ঞে স্নেহবর্ণ গুরুদেব ও রক্তবর্ণ তৎশক্তির ধ্যান করিবার বিধি আছে। ইহাতে যে শরীর কত সুস্থ থাকে, বিনাতি বাবুগণ তাহার বুঝিবে কি? যাহা হউক, কেহ যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবমূর্ত্তির কিম্বা গুরু ও তৎশক্তির ধ্যান করিয়া পৌত্তলিক, জড়োপাসক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধতমসে নিষ্কিণ্ণ হইতে রাজী না হও, তবে সভ্যতার অমল-ধবল আলোকে থাকিয়া অন্ততঃ স্নেহ, লোহিত ও শ্রামবর্ণ ধ্যান করিলেও আশাতীত ফল পাইবে। বর্ণ ধ্যান করিলে তো আর বর্ণ কাল হইবে না, বরং বিস্কুট-পাঁউরুটী-খাওয়া, জীর্ণ-শীর্ণ, বিবর্ণ শরীর স্নবর্ণসদৃশ হইবে। যাহা হউক, আমি সকলকে এই বিষয় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

১৬। পুরুষের দক্ষিণ নাসায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসায় নিঃশ্বাস বহন-কালে দাম্পত্য-সন্তোগ-সুখ উপভোগ করিবে। ইহাতে উভয়ের শরীর ভাল থাকিবে, দাম্পত্য-প্রেম বর্দ্ধিত হইবে; প্রণয়িনীও বশীভূত থাকিবে।

১৭। সন্তোগান্তে স্ত্রী-পুরুষের উভয়েই দম্ভের শীতল জল পান করিলে শরীর সুস্থ থাকে।

১৮। প্রত্যহ এক তোলা ঘূতে আট দশটি গোলমরিচ ভাজিয়া, ঐ ঘৃত পান করিলে রক্ত পরিষ্কার ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

চিরযৌবন লাভের উপায়

যৌবন লাভ করিতে—আশা করি, সকলেই আশা করিয়া থাকে। মহাভারতে উক্ত আছে, যযাতি স্বীয় পুত্রকে নিজের জরা অর্পণ করিয়া পুত্রের যৌবন লইয়া সংসারস্থ লুটিয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও দেখা যায়, বালকগণ ঘন ঘন বদনে ক্ষুর ঘষিয়া মোচ-দাড়ি তুলিয়া অসময়ে যুবক সাজিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকে, আর বৃদ্ধগণ পাকা চুল-দাড়িতে কলপ চড়াইয়া এবং নীরদন বদনগহ্বরে ডাক্তার-সাহায্যে কৃত্রিম দস্ত বসাইয়া পার্কতীর ছোট ছেলেটির ত্রায় সাজসজ্জা করতঃ পৌত্রের সহিত ইয়ারকি দিয়া বাই খেমটা খিয়েটারের আড্ডায় যুবকের হৃদমজা লুটিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইংরেজ-নারীগণও যৌবন-জোয়ারে ভাটা ধরিলে প্রাণান্ত পণ করিয়াও যৌবনের অবধা-অত্যাচারজনিত মেছেতা, ব্রণাদির কলঙ্ক বিনষ্ট করিবার জন্ত বদনের চর্ম উত্তোলন-পূর্বক যৌবনসৌন্দর্য্যে বিভূষিতা থাকিতে সাধ করে। স্বরশাস্ত্রানুসারে স্বল্পায়ুসে যৌবন রক্ষা করা যায়। যথা—

যখন যে অঙ্গে যে নাড়ীতে শ্বাসবহন হইবে, তখন সেই নাড়ী রোধ করিতে হইবে। যে পুনঃ পুনঃ শ্বাসবায়ুর রোধ ও মোচন করিতে সমর্থ হয়, সে দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন লাভ করিতে পারে। পাকা চুল, ফোকলা দাঁত, শিথিল চামড়ায় যুবক সাজিতে গিয়া বিড়ম্বনা ভোগ না করিয়া পূর্বে এই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারিলে, আর লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

অনাহত পদ্মের বর্ণনায় বলিয়াছি যে, উক্ত পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল আছে ; সহস্রারস্থিত অমাকলা হইতে যে অমৃত স্ফরণ হয়, সেই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হয়। এজন্ত মানবদেহে বলি, পলি ও জরা উপস্থিত হয়। যোগিগণ বিপরীতকরণ মুদ্রা অর্থাৎ উদ্ধাপদে হেঁটমুণ্ডে থাকিয়া কৌশলক্রমে স্ফরিত অমৃত সূর্য্যমণ্ডলের গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। তাহাতে দেহ বলি, পলি ও জরারহিত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু—

গুরুপদেশতো জ্ঞেয়ং ন চ শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ ।

অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণ গুরুপদেশ-সাপেক্ষ। বিপরীতকরণ মুদ্রা ব্যতীত খেচরীমুদ্রা দ্বারা সহজে ঐ স্ফরিত অমৃত রক্ষা করা যায়। খেচরী মুদ্রার নিয়ম। যথা—

রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবশয়েৎ ।

কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা ।

অবোর্ম্মধ্যে গতা দৃষ্টিমুদ্রা ভবতি খেচরী ॥

—ঘেরণসংহিতা

জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে তালুমধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে জিহ্বাকে উদ্ধাদিকে উল্টাইয়া কপালকুহরে প্রবিষ্ট করাইয়া ভ্রমরের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিলে খেচরীমুদ্রা হইবে।

কেহ কেহ তালুমূলে রসনাগ্র স্পর্শ করাইয়া ওস্তাদী করে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!—আসলে কিছু হয় না। ঐরূপে জিহ্বা রাখিয়া কি করিতে হয়, তাহা কেহ জানে না। খেচরীমুদ্রা দ্বারা ব্রহ্মরজ্জ-গলিত সোমধারা পান করিলে অভূতপূর্ব্ব নেশা হয় ; মাথা ঘোরে, চক্ষু আপনি অর্দ্ধনিম্নলিত ও স্থির থাকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়।

এইরূপে খেচরীমূত্রা সিদ্ধ হয়। খেচরীমূত্রাসাধন দ্বারা ব্রহ্মরজ্জ হইতে সে সুধা স্ফরণ হয়, তাহা সাধকের সর্বশরীর প্রাণিত করে। তাহাতে সাধক দৃঢ়কায়, বলি পলি ও জরারহিত, কন্দর্পের ত্রায় কান্তিবিশিষ্ট এবং পরাক্রমশালী হইয়া থাকে। প্রকৃত খেচরীমূত্রা সাধন করিতে পারিলে সাধক ছয়মাসমধ্যে সর্বব্যাধিমুক্ত হয়।

খেচরীমূত্রা সিদ্ধ হইলে নানাবিধ রসাস্বাদ অনুভূত হয়। স্বাদ-বিশেষে পৃথক ফল হইয়া থাকে। ক্ষীরের স্বাদ অনুভূত হইলে ব্যাধি নষ্ট হয়। স্নেহের আস্বাদ পাইলে অমর হয়।

আরও অগ্নাত উপায়ে শরীর বলি, পলি ও জরারহিত করিয়া যৌবন চিরস্থায়ী করা যায়। বাহ্যল্যভয়ে সমস্ত উপায় লিখিত হইল না।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়

সংসারে দীর্ঘকাল বাঁচিতে কাহার না ইচ্ছা? কচিং কেহ রোগে, শোকে বা অগ্নাত দারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করে; আর যোগিগণ জীবন ও মৃত্যু উভয়ের প্রতি উদাসীন। তন্নিম্ন সকলেরই দীর্ঘকাল বাঁচিতে সাধ আছে। কয়জন মনুষ্যকে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়? অকালমৃত্যু এত লোককে প্রত্যহ শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে যে, জীবনের পূর্ণ সংখ্যা

যে কতদিন, তাহা কাহাকেও জানিতে দেয় না। অকালমৃত্যু কেন হয় এবং তন্নিবারণের উপায় কি? আর্ধ্যঋষিগণ মৃত্যুর কারণ নির্দেশ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে নিজেই নিজ মৃত্যুর কারণ। অদৃষ্ট বা দৃষ্ট এই উভয় কারণের মূলই স্বয়ং। তাঁহারা বলেন, কর্মফলভোগের জন্ত দেহ তদুপযোগী হইয়া থাকে। সঙ্কল্প-বিকল্পই জীবের জন্ম-মৃত্যুর প্রধান কারণ। সুতরাং কর্মফল যতক্ষণ, দেহও ততক্ষণ; যখন কর্মফল থাকিবে না, তখন আর দেহের প্রয়োজন কি? অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেহ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তবে দেহের পরিত্যাগ দুই প্রকারে হয়; এক, কর্ম নিঃশেষিত হইলে, জীব যখন পূর্ণজ্ঞানের সহিত অনায়াসে পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিত দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন তাহাকে মোক্ষ বলা যায়; অপর যখন জীবের সঞ্চিত কর্ম দেহকে অনুরূপ ভোগের অল্পযুক্ত বোধে, জীবকে অবশ ও অজ্ঞানাবৃত করতঃ বলপূর্বক স্থলদেহ পরিত্যাগ করায়, তখন তাহাকে মৃত্যু বলা যায়। এইরূপ মৃত্যুকে জ্ঞান অথবা যোগানুষ্ঠানাদি দ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে। চিন্তকে সর্বপ্রকার বাসনা, দুরাশা প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত রাখা দীর্ঘজীবন লাভের প্রধান উপায়। কাম, ক্রোধ, লোভাদি প্রবল রিপুগণ যাহাতে কোনমতে চিন্তকে পীড়া দিতে না পারে, তাহাই কর্তব্য। ঈশ্বরে ভক্তি ও নির্ভর করিয়া সন্তোষস্বাপানে রত হইতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ বিশেষ অসাধ্য বোধ হয় না। দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তাগণ বিশেষ গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যুর কারণ এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা-আন্দোলন এখানে নিম্প্রয়োজন। স্বর-শাস্ত্রানুসারে কিরূপে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

মানবশরীরে দিবারাত্র যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তাহার নাম প্রাণ। শ্বাস বাহির হইয়া পুনঃ দেহে প্রবেশ না করিলেই জীবের মৃত্যু হইয়া হইয়া থাকে। নিঃশ্বাসের একটা স্বাভাবিক গতি আছে। যথা—

প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তো নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলম্।

—স্বরোদয়

মহুগ্নের নিঃশ্বাস গ্রহণ সময় অর্থাৎ নাসিকার দ্বারা সহজ নিঃশ্বাস টানিবার সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত নিঃশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় বার অঙ্গুলি শ্বাসবায়ু বহির্গত হয়। নাসারন্ধ্র হইতে একটা কাঠি দ্বারা অঙ্গুলি মাপিয়া সেই স্থলে একটু তুলা ধরিয়া দেখিও, যদি তাহা ছাড়াইয়াও বায়ু যায়, তবে তুলা সরাইয়া দেখিবে, কতদূর তাহার গতি হইল;—স্বাভাবিক অবস্থায় বার অঙ্গুলির অধিক গতি হইলে বুঝিতে হইবে, জীবন ক্ষয়ের পথে গিয়াছে। প্রাণায়াম জানা থাকিলে, সহজে সেই ক্ষয় নিবারণ করা যায়।

মানবের নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় বার আঙ্গুল পরিমাণে নিঃশ্বাস-বায়ু নির্গত হয়, কিন্তু ভোজন, গমন, রমণ, গান প্রভৃতি কার্য্যবিশেষে স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। যথা—

দেহাঙ্গিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদদশাঙ্গুলিঃ।

গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্থখা ॥

চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পাস্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশাঙ্গুলিঃ।

মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশত্বক্তং ব্যায়ামে চ ততোহধিকম্ ॥

স্বভাবেহস্তু গতো মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।

আয়ুক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদগতে ॥

গান করিবার সময়ে ষোল অঙ্গুলি, আহার করিবার সময়ে কুড়ি অঙ্গুলি, গমনকালে চক্ৰিশ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ত্রিশ অঙ্গুলি এবং স্ত্রী-সংসর্গকালে ছত্রিশ অঙ্গুলি নিঃশ্বাসের গতি হইয়া থাকে। শ্রমজনক ব্যায়ামকার্যে তাহারও অধিক নিঃশ্বাস পাত হইয়া থাকে।

যে কোন কার্য্যকালেই হউক, বার অঙ্গুলির অধিক নিঃশ্বাসের গতি হইলেই জীবনীশক্তির বা প্রাণের ক্ষয় হইতেছে বুঝিতে হইবে। প্রাণায়ামাদির দ্বারা এই অস্বাভাবিকী গতিকে স্বভাবে রাখাই দীর্ঘ-জীবন লাভের প্রধানতম উপায়। মৈথুনে যে জীবনের হানি হয়, নিঃশ্বাসের গতির দীর্ঘতাই তাহার প্রধান কারণ। আবার যাহাদের জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়াছে, স্থূল কথায় ধাতুদৌৰ্বল্য রোগ জন্মিয়াছে, তাহাদের নিঃশ্বাস অতি ঘন ঘন ও আশী আঙ্গুল দীর্ঘ পাত হয়, কাজেই তাহাদিগকে আরও শীঘ্র মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া থাকে।

যোগাস্থীভূত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা ঐ নিঃশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই জীবনী-শক্তি রক্ষার একমাত্র উপায়। আবার যে ব্যক্তি যোগপ্রভাবে স্বাভাবিক গতি হু'এক অঙ্গুলি করিয়া হ্রাস করিতে পারে, সর্বসিদ্ধি ও অমানুষী ক্ষমতা তাহার করতলগত।* এইরূপে যোগের উচ্চাবস্থায় উপনীত হইলে, একেবারে বায়ু নিরোধ করিয়া

*একান্দুলকৃতন্যানে প্রাণে নিজ্জামতি মতা ।
আনন্দস্তু দ্বিতীয়ে স্ত্রাৎ কবিশক্তিষ্টতীয়কে ॥
বাচঃ সিদ্ধিশ্চতুর্থে তু দূরদৃষ্টিস্ত পঞ্চমে ।
ষষ্ঠে ভ্রাকাসগমনং চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে ॥
অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধয়ো নব ।
দশমে দশমুত্তিষ্ঠি ছায়ানাশো দশৈককে ॥
দ্বাদশে হংসচারশ্চ গন্ধামৃতরসং পিবেৎ ।
আনখাগ্রে প্রাণপূর্ণে কস্ত ভক্ষ্যঞ্চ ভোজনম্ ॥

—পবন-বিজয়-স্বরোদয়

বহুদিন কাটাইয়া দিতে পারা যায়। প্রাচীন যোগিগণের কথা স্বতন্ত্র ; বর্তমান কালেও ভূকৈলাসের সাধুর কথা কে না জানে ? ৮কাশীধামের জৈলঙ্গস্বামীর বিবিধ বিচিত্র শক্তিলীলা কে না শুনিয়াছে ? জৈলঙ্গস্বামী দুই চারি ঘণ্টা জলমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইত না। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে ম্যাক্‌গ্রেগর প্রভৃতি সাহেবের সম্মুখে হরিদাস-সাধুকে চল্লিশ দিন এক বাস্ত্রের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখা হইয়াছিল ; চল্লিশ দিন পরে দেখা গিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

প্রাণবায়ুর বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমাণু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নিঃশ্বাস নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে আয়ুক্ষয় নিশ্চিত। নিদ্রা, গান, মৈথুন প্রভৃতি যে যে কার্যে প্রাণবায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, সেই কার্য যত অল্প করিবে, ততই সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। নিয়মিতরূপে প্রাণায়াম করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে। প্রাণ শব্দে বায়ু, আর আয়াম অর্থে নিরোধ ; প্রাণায়ামের সময় কুস্তক করিলে প্রাণবায়ু নিরোধ হয়, শ্বাসপ্রবাহ হয় না, এই হেতু জীবন দীর্ঘ ও রোগশূন্য হয়।

শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, কার্য্যগুণে পরমাণু বৃদ্ধি এবং কার্য্যদোষে অল্লায়ু হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বলেন—কাম, ক্রোধ, চিন্তা, হুঁরাশা প্রভৃতিই জীবের মৃত্যুর কারণ। একই কথা—স্বরশাস্ত্রকারগণ এক কথায় ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। শ্বাসের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতাই দীর্ঘায়ু ও অল্লায়ু হইবার প্রধান কারণ। শাস্ত্রবেত্তাগণের যুক্তির সহিত স্বরজ্ঞানীর সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। কেননা তাঁহারা যে সকল কার্য্যে মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিতেছেন, সেই সকল কার্য্যেই নিঃশ্বাসের দীর্ঘগতি অবধারিত হইতেছে। অতএব যাহার

যত প্রাণবায়ু অল্প খরচ হইবে, তাহার তত আয়ুর্বৃদ্ধি ও রোগাদি অল্প হইবে। তদনুযায় নানাবিধ পীড়া ও আয়ুনাশ হইবে, সন্দেহ নাই। বিচক্ষণ পাঠক নিঃশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্যাদি করিতে পারিলে দীর্ঘ-জীবন লাভ বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে বুঝিতে পারিবে। নিঃশ্বাসবায়ুর একেবারে বাহ্যগতি রুদ্ধ করিয়া তাহা অন্তরাভ্যন্তরে প্রবাহিত করিতে পারিলে, সেই যোগেশ্বর হংসস্বরূপ হইয়া গঙ্গামৃত পান করতঃ অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার মস্তকের চুল হইতে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে; সুতরাং তাঁহার পান-ভোজনের প্রয়োজন কি? তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করতঃ অন্তরমধ্যে পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। যে উপায়ে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, তাহাতেই মানুষের মুক্তি হইয়া থাকে।

পূর্বেই মৃত্যু জানিবার উপায়

প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে সূর্য্যাস্ত যেমন অবশুস্ভাবী, দিবালোক অপসারিত হইলে যামিনীর অন্ধকার যেমন নিশ্চিত, তেমনি জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু হইবেই। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।

—মোহমুদগার

বাস্তবিক অনবরত পরিবর্তনশীল নশ্বর সংসারে কোন বিষয়ের স্থিরতা নিশ্চয়তা নাই, কেবল মৃত্যু নিশ্চিত। আমাদের দেশের মধুকবি মধুর স্বরে গাহিয়া গিয়াছেন—

জন্মিলে মরিতে হবে,

অমর কে কোথা কবে,—

চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?

এই মর জগতে কেহই অমরত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কেবল শাস্ত্রমুখে শুনা যায় যে—

“অশ্বখামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।

কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥”

এই সাতজন মাত্র মৃত্যুকে রক্ষা দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তাহাও লোক-লোচনের প্রত্যক্ষীভূত নহে। মৃত্যু অনিবার্য, জন্মগ্রহণ করিলে আর কিছু হউক বা না হউক, মৃত্যু অবশ্যস্বাবী। আজ হউক, কাল হউক কিম্বা দশ বৎসর পরে হউক, একদিন সকলকেই সেই সর্বগ্রাসী শমন-সদনে গমন করিতেই হইবে।

একদিন মৃত্যু যখন নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য, তখন কতদিন পরে প্রেম-পুত্রলিকা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা ছাড়িয়া, ধনজনপূর্ণ স্বথের সংসার ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? বিশেষতঃ মৃত্যুর পূর্বে জানিতে পারিলে সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্যের বিশেষ স্বেচছা হয় এবং নাবালক পুত্র-কন্যার তত্ত্বাবধানের ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বন্দোবস্ত, বিষয়-বিভবের স্বেচ্ছালা বিধান করা যায়। আরও স্বেচছা এই যে, মৃত্যুসবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি নিপতিত

হইলে পরকালের পথও পরিষ্কৃত করা যায়। সংসার-আবর্তে ঘূর্ণ্যমান ও মায়া-মরীচিকায় মুহমান, বিবিধ বিলাস-বাসনা-বিজড়িত হইয়া যাহারা মরজগতে অমর ভাবিয়া সতত স্বার্থসাধনে রত—ধর্মপ্রবৃত্তি মনোরুত্তিতে স্থান দেয় না, তাহারাও যদি জানিতে পারে যে, মৃত্যু ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আর ছয় মাস, এক মাস, কি দশদিন পরে প্রাণারামদায়িনী সহধর্মিণী ও আত্মৈকাংশ পুত্র-কন্যা ছাড়িয়া—সাধের ধন-ভবন, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ ইত্যাদি ভব-সংসারে সব ছাড়িয়া শূন্যহস্তে নিঃস্বল অবস্থায় একা চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অবশ্য তাহারা তত্ত্বপথের পথিক হইয়া ধর্ম-কর্মের দ্বারা পরলোকের ইষ্টসাধন করিতে পারে। তন্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ ও স্বরোদয় প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুপ্রকার মৃত্যুলক্ষণ লিখিত আছে। তৎপাঠে মৃত্যুলক্ষণ নির্ধারণ করা সাধারণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য। আমি যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট যে সকল মৃত্যুলক্ষণ শুনিয়া বহুবার বহু লোকের দ্বারা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ সত্য ফল দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বহুপরীক্ষিত কয়েকটি লক্ষণের মূল উদ্ধৃত করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া সাধারণের সুবিধার্থে বঙ্গভাষায় লিখিয়া দিলাম।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিনে এক দিবারাত্র যাহার উভয় নাসিকায় সমান বেগে একত্রে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ তিন বৎসর পরে তাহার মৃত্যু ঘটিবে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে দুই দিবা-রাত্র যাহার দক্ষিণ নাসিকার খাস বহন হয়, সেই দিন হইতে দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে তিন দিবারাত্র যাহার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিঃশ্বাস বাহির হয়, সেই দিন হইতে এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইবে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে নিরন্তর যাহার রাত্রিকালে ইড়া ও দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে ষোল দিন পর্যন্ত যাহার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিন হইতে এক মাসের শেষ দিনে তাহার মৃত্যু হইবে।

বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম দিনে ক্ষণমাত্রও বাম নাসাপুটে শ্বাসবহন না হইয়া, যাহার দক্ষিণ নাসায় নিরন্তর নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, পনেরদিনমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার মল, মূত্র, শুক্র, ও অধোবায়ু এককালে নির্গত হয়, দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয়।

যে ব্যক্তি নিজের জ্বর মধ্যস্থান দেখিতে না পায়, সেই দিন হইতে সপ্তম কিম্বা নবম দিনে তাহার মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি নাসিকা দেখিতে না পায়, তিনদিনে এবং জিহ্বা দেখিতে না পাইলে, এক দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি আকাশস্থ অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃকামণ্ডল নামক নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

যাহার উভয় নাসাপুটে একেবারেই নিঃশ্বাসপ্রবাহ রহিত হইয়া মুখ দিয়া শ্বাস বাহির হয়, সত্ত্ব সত্ত্বই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

যাহার নাসিকা বন্ধ, কর্ণদ্বয় উন্নত হয় এবং নেত্রদ্বারা অনবরত অশ্রু নির্গত হয়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়।

ঘৃত, তৈল অথবা জলচ্ছায়ায় আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনকালে যে ব্যক্তি নিজ মস্তক দেখিতে না পায়, সে এক মাসের অধিক বাঁচে না।

স্বরতে রত হইলে প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে যে ব্যক্তির হাঁচি হয়, সে ব্যক্তি পঞ্চম মাসের অধিক জীবিত থাকে না।

স্নান করিবামাত্র যাহার হৃদয়, চরণ ও মস্তক শুষ্ক হয়, তিন মাসে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে গর্দভাক্রুত, তৈলনিপ্ত ও ভূষিত দর্শন করে, সে ব্যক্তি শীঘ্র যমালয়ে নীত হয়।

যে ব্যক্তি লৌহদণ্ডধারী, কৃষ্ণবস্ত্রপরিধান, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করে, সে ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে যমালয়ে অতিথি হইয়া থাকে।

যাহার সর্বদা কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হয়, তাহার ষণ্মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়।

বিনা কারণে সহসা স্থলকায় ব্যক্তি যদি কুশ হয় এবং কুশ ব্যক্তি স্থল হয়, তবে একমাসমধ্যে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

হস্ত দ্বারা কর্ণকূহর অবরুদ্ধ করিলে কর্ণের অভ্যন্তরে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার শব্দ শুনিতে না পায়, একমাসমধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।

বান্ধালীর চির প্রচলিত মাটির প্রদীপ, যাহা সর্বপ তৈল দ্বারা সলিতা-সহযোগে জালিত হয়, সেই প্রদীপনির্বাণের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হইলে ষণ্মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

তাহার দন্ত ও কোষ টিপিলে বেদনা অনুভূত হয় না, তিনমাসমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ মৃত্যুচিহ্ন আছে, কিন্তু সমস্ত বলা সূদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। আর এক কথা, এই সকল লক্ষণ কাহারও শরীরে প্রকাশ না হইলেও না হইতে পারে; বিশেষতঃ নিঃশ্বাসের গতি ও শ্বাসের পরিচয় জানা না থাকিলে প্রথম লক্ষণগুলি বুঝা যায় না। সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, কয়েকটি লক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তির হইবে ইহা স্থিরনিশ্চয়। পরীক্ষায় তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটি লক্ষণ লিখিত হইল।

দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাকের সমান মস্তকের উপর কিম্বা ভ্রুর উর্দ্ধে কপালের উপর রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কজীর নীচে সমানভাবে দৃষ্টিপাত করিলে হাত অত্যন্ত সরু দেখা যায়; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যে দিন হাতের সহিত মুষ্টির যোগ নাই, হাত হইতে মুষ্টি বিভিন্ন দৃষ্ট হইবে, সেই দিন হইতে ছয় মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে বুঝিতে হইবে।

ঐ লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর প্রত্যহ প্রাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রের কোণ কিঞ্চিৎ টিপিয়া ধরিলে তাহার বিপরীত দিকে নেত্রাভ্যন্তরে সমুজ্জল তারকার আয় একটি বিন্দু দৃষ্ট হয় কি-না পরীক্ষা করিবে। যে দিন হইতে ঐ জ্যোতিঃ দেখা না যাইবে, সেই দিন হইতে দশ দিনে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

আমি অনেক লোকের দ্বারা ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছি। মৃত্যুর পূর্বে ঐ দুইটি লক্ষণ সকল ব্যক্তির শরীরে

হইবে ; ঐ লক্ষণ বুঝিবার জ্ঞান কাহারও নিকট বিজ্ঞা-বুদ্ধি ধার করিতে হইবে না। এই দুইটী পরীক্ষা সকলেই নিজে নিজ নিজ শরীরে দৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিবে।

যোগী, অযোগী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে মৃত্যুর পূর্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার ঘটয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্বে ঐ সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিলে, মৃত্যুর জ্ঞান প্রস্তুত হওয়া অতি কর্তব্য। যেন ধন-সম্পদ, বিষয়-বিভব, স্ত্রী-পুত্রাদির ভাবনা ভাবিয়া, অসার মায়ামোহে মুহমান হইয়া আসন কথা ভুলিও না। কিছুই সঙ্গে যাইবে না। কেবল—

এক এব স্মৃদ্ধক্ষ্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।

অতএব পরজন্মে যাহাতে পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রকার দুঃখ-সম্পদ ভোগ করা যায়, তাহার জ্ঞান প্রস্তুত হওয়া একান্ত কর্তব্য। মৃত্যুকালীন সাংসারিক কোন বিষয়ে চিন্তা আসক্ত থাকিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

—গীতা ৮।৬

মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান পরমযোগী রাজা ভরত, হরিণ-শিশুকে চিন্তা করিতে করিতে মরিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে হরিণদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “তপ জপ বৃথা কর, মরিতে জানিলে হয়” এই চলিত বাক্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল কারণে স্পষ্ট বুঝা

যায় যে, যে স্বরূপ রূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সে তদহরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্ত মৃত্যুকালে বিষয়-বিভবাদি ভুলিয়া ভগবানের পাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ করা সকলেরই কর্তব্য। ভগবান্ বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্বরমুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রযাতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

—গীতা, ৮।৫

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের চিন্তা করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে সে ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সকলেরই মরণের পূর্বলক্ষণগুলি জানিয়া সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহারা যোগী, তাহারা মৃত্যুকে নিকটে জানিয়া যোগাবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে জ্যোতিঃর পথে গমন করিয়া উত্তমা গতি লাভ করিতে পারিবে। অন্ততঃ মৃত্যুকালে যদি যোগ-স্মৃতি বিলুপ্তি না হয়, তবে জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। আর যাহারা অব্যোগী, তাহারা মরণের লক্ষণগুলি দেখিয়া অস্থির না হইয়া, যাহাতে ভগবানের প্রতি সতত মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পার, নিয়ত সেই চেষ্টা করিবে। ভগবানের ধ্যান ও তাঁহার নাম স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। পরিশেষে—

উপসংহার

কালে ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় আমার প্রত্যক্ষ সত্য—বিশেষতঃ স্বরকল্পের “বিনা ঔষধে রোগ-আরোগ্য” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহা বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছেন। অতএব পাঠকগণ জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের প্রচারিত সাধনে অবিশ্বাস করিও না। তাঁহাদের সাধনসমুদ্র-মহানে এই সুধার উদ্ভব হইয়াছে; এ সুধাপানে মরজগতের মানুষ অমরত্ব লাভ করিবে, আত্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ আকাজক্ষা দূরীভূত হইবে। পাশ্চাত্য দেশীয়গণের বাহ্য বিজ্ঞান দেখিয়া ভুলিয়া আৰ্য্যশাস্ত্রে অনাদর করিলে, স্বর্গহে পায়সান্ন পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহে মুষ্টিভিক্ষা করার ত্রায় বিড়ম্বনা ভোগ করা হইবে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার ত্রিসীমায় পৌছিতে অত্র ধর্ম্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে। আজিও হিন্দুগণ যে জ্ঞান বক্ষে রক্ষা করিতেছে, তাহা বুদ্ধিবীর শক্তি অগ্রের নাই। এই দেখ না, বাঙ্গালী ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করতঃ হোমার, ভার্জিল, ডাণ্টে, সেক্সপিয়র প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজ-কবিগণের পুঁজিপাট। তন্ন তন্ন করিয়া বেওয়ারিস ময়দার ত্রায় যাহা ইচ্ছা তাহাতেই পরিণত করিতেছে; কিন্তু কয়জন ইংরাজ শঙ্করাচার্য্যের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? কোন্ ইংরাজ পাতঞ্জল-সূত্রের এক ছত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইবে? তবে হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল-পরিত্যাগ জড় হইয়াছে, কাজেই হিন্দুকে জড়োপাসক প্রভৃতি যাহা

ইচ্ছা বলা যাইতে পারে—নতুবা যে জড়বাদীদের ধর্মের অস্থি-মজ্জায় জড়ত্ব, বাহাদের ধর্ম এখনও দুষ্কপোষ্য শিশুর ত্রায় যথেষ্টগমনে পরমুখাপেক্ষী, আশ্চর্যের বিষয় তাহারাই হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, পাঠক! “গণ্ডায় আঙা” বলার ত্রায় অপরের যুক্তিতে “হাঁ” বলিয়া যাওয়া লঘুচেতার কার্য। হিন্দুধর্ম বৃদ্ধিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে হিন্দু যাহা করে, তাহার একবিন্দুও কুসংস্কার এবং মিথ্যা নহে। হিন্দুধর্ম গভীর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃষ্ট ব্যক্তিগণ ভাবিয়া থাকে যে, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই, তাহার কোনও মূল্যই নাই; —তাই তাহারা সকল কাজেরই বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। বিজ্ঞান জ্ঞানের একমাত্র উপায় হইলেও সকল বিষয়ের উপযোগী নহে অথবা তর্ক-বুদ্ধি সকল লোকের সকল কালের উপযোগী নহে। সকল অবস্থাতেই যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হয়, তাহা হইলে মানবের দুঃখের সীমা থাকে না। প্রত্যেক কার্যের বৈজ্ঞানিক সত্য জানিয়া তবে তাহার অহুষ্ঠান করিব, এই বিবেচনা ভুল। নির্জীব রজঃকণা হইতে এমন দেবোপম মহুশ্যসন্তান কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? রজনীতে কেনই বা জীব নিদ্রাতে আচ্ছন্ন হয়, রজনী-অবসানেই বা কে আবার তাহাদের জাগাইয়া দেয়? পালাজের এক বা দুইদিন অন্তর ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে অলক্ষিতে আসিয়া কিরূপে রোগীকে আক্রমণ করে? এই সকল বিষয়ে যুক্তি কেহ খুঁজিয়া পাইয়াছ কি?—তবে অসম্ভব, অযৌক্তিক বলিয়া চীৎকার করা কেন? বিশ পনের টাকা বেতনের রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালারগণ “টরেন্টকা” শিখিয়া তারে সংবাদ “আদান-প্রদান” না করিয়া যদি বলে “কোন শক্তির বলে তারযোগে এই কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা না জানিয়া না

বুঝিয়া ফাঁকা সংবাদদাতার কার্য করিব না।”—তবে তো তাহার এ জীবনে চাকুরীর মধুর স্বাদ উপভোগ হইল না। কেননা, তাহাদের স্থূল বুদ্ধিতে সেই বিশাল তত্ত্বের ধারণা একেবারেই অসম্ভব। নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করে বলিয়া শিক্ষিতের মান নহে। পশুতেই স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছে, কিরূপ কার্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছে; সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়া শিক্ষিতের এত মান। মূর্থ কিছুই জানে না, আপন প্রকৃতি-অহুসারে কার্য করে, তাই তাহার পদে-পদে দোষ। বর্তমান যুগে হীনবুদ্ধি অন্নাযু হইয়া আমরা ধর্মেরও যুক্তি-বিজ্ঞান খুঁজিয়া বেড়াই। কিন্তু প্রত্যেক কার্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, তাহা কে জানে? তবে বহুকালের বহুপুরুষপরম্পরায় প্রকাশিত জ্ঞান-গরিমা গণ্ডুষে উদরসাৎ করা একেবারে অসম্ভব। ভগবানের বিশাল বিচিত্র ভাণ্ডারে অনন্ত শক্তি-সম্পত্তি সঞ্চিত; উদ্বেগ, নিম্নে, পশ্চাতে, সম্মুখে, স্থূলে, স্থক্ষে ইহ-পরকালের কত অগণিত, অজানিত, অপ্রকাশিত তত্ত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত, কে তাহার ইয়ত্তা করে? অনন্তের অনন্ত শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। তাই বলিতেছি, জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধিকার অহুসারে ধর্মকার্য করা সর্বথা কর্তব্য।

আমাদের কি যে স্বভাবের দোষ, কেহই আপন বুদ্ধির হীনতা স্বীকার করিতে চাই না। যে সর্ববাদিসম্মত বোকা, সে-ও তাহা বিশ্বাস করে না। একদা আমি, আমার জন্মপল্লীর শূদ্রধরগণের কারখানায় বসিয়া একটি বন্ধুর সহিত নিউটন-প্রচারিত মাধ্যাকর্ষণের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। নিকটে এক শূদ্রধর গাড়ীর পায়

পড়িতেছিল, “ফলটা শূন্যে বা উর্দ্ধে” কিম্বা আশেপাশে না যাইয়া নিম্নে কেন পড়িল?” এই বাক্যে সে হাসিয়া অস্থির; সে নিম্নে পড়ার কতকগুলি কাঠকাটা বুদ্ধির যুক্তি দেখাইয়া আমাদের এমন কি নিউটনকে পর্যন্ত গঞ-আকার+ধঞ-আকার বানাইয়া দিল। তবেই দেখ, আমরা নিজে সেই আর্থ্য-ঋষিগণের জ্ঞান গরিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই বিশালত্বের ধারণা হয় না—তাহা স্বীকার না করিয়া শাস্ত্রবাক্যকে বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেই। পাঠক! আমিও একদিন এই শ্রেণীর অগ্রণী ছিলাম। আমার যে গ্রামে জন্ম হয়, তথায় ভদ্রলোকের বাস নাই; যে হুঁদশ ঘর ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দেখে নাই অথচ পাশ্চাত্যশিক্ষাদীপ্তও নহে—অন্ধবিশ্বাসী। কেবল বিরাট তর্কজাল, জাতীয় দলাদলি, গ্রামান্তরে না যাইয়া পিঁড়েই বসিয়া পেঁড়োর সমাচার প্রভৃতি গ্রাম্য বিজ্ঞতার বড়াই লইয়া কালযাপন করে। সন্ধ্যা-আহিক, তপ-জপ, পূজাদির প্রকৃত মর্ম্ম জানে না ও উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল সে গ্রামে নহে, প্রায় পৌনে-ঘোল আনা গ্রামেই এইরূপ দেখা যায়। এই জন্তই ক্রমে লোকের ধর্ম্মে-কর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। আমিও ঐরূপ স্থানে জন্মিয়া তাহাদের সংসর্গে লালিত-পালিত হইয়া সেইরূপ শিক্ষাই প্রাপ্ত হই। পরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মনের গতি কেমন কিম্বুতকিমাকার হইয়া দাঁড়াইল; দেবতাতত্ত্ব ও আরাধনা কুসংস্কার মনে করিলাম। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞানে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই মহান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা উপাসনা নিত্যকার্য্য পর্যন্ত প্রত্যবায় মনে করিলাম। জ্ঞানের অভাবে বুঝিতাম না—সৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায় ?

হালফ্যাসানের বিবেকবাদিগণের বিবেকবুদ্ধিসম্মত নজীরে নব্য অভিজ্ঞ সাজিয়া অনভিজ্ঞের ত্রায় বিজ্ঞ বুদ্ধগণের কথা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না; অদৃষ্টনেমির আবর্তনে—মতি-গতির পরিবর্তনে গুরুর কৃপায় ও শাস্ত্রমাহাত্ম্যে এবং কার্য-কারণের প্রত্যক্ষতা ফলে পূর্বের অপূর্ব সংস্কার উড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং এখন স্বকপোল-কল্পিত ধর্মমতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সেই জন্ত বলিতেছি আর্য্যশাস্ত্রের জটিল রহস্য উদ্ভেদ করিতে না পারিলে নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধির ত্রুটি ভুলিয়া তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণের মহদ্বাক্য অগ্রাহ্য করিও না।

এই গ্রন্থের পরে রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি যোগের উচ্চাঙ্গ ও সাধন-কৌশল, ব্রহ্মচর্য্যসাধনোপায়, বিদ্যুসাধন, শৃঙ্গারসাধন, কুমারী-সাধন, পঞ্চমকারে কালীসাধন প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত গুহ্যসাধন এবং রসতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধনা প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের জটিল রহস্য আমি “জ্ঞানীগুরু” “তান্ত্রিকগুরু” ও “প্রেমিকগুরু” গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। জ্ঞান, ধর্ম ও সাধনপিপাসু স্বকৃতিমান সাধকগণ যদি শাস্ত্রোক্ত সাধনের সম্যক তত্ত্ব জানিবার বাসনায় এই দীনের আশ্রমে অল্পগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হন, তবে গুরুকৃপায় যেরূপ শিক্ষা আছে এবং আলোচনা-আন্দোলনে যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনুসারে সাদরে সযত্নে বুঝাইতে ত্রুটি করিব না।

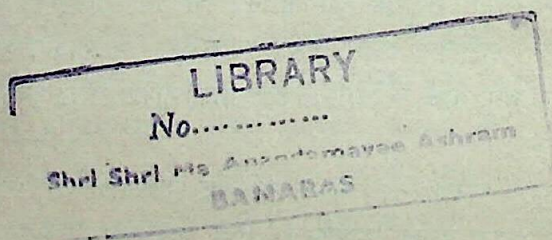
এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া অজ্ঞানের স্থূলল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে, এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায়—তখন বুঝিতে পারিবে, আর্য্যঋষিগণের যুগ-যুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপঃপ্রভাবে বিজ্ঞাত এবং লোকহিতার্থে প্রচারিত কি

অমূল্য রত্ন শাস্ত্রে সজ্জিত আছে। অন্ধবিশ্বাস ভাল নহে, অন্ধসন্ধান করিয়া—সাধন করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি কর। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের অবলম্বিত সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদনুসারে সাধন-ভজন করিয়া মানবজন্ম সার্থক ও পরমানন্দ উপভোগ কর। হিন্দুধর্মের বিজয় হৃন্দুভিবাঞ্চে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিনিয়ত কর। হিন্দুধর্মের বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিয়া সমগ্র দেশের সমগ্র জাতিকে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত কর। আমরাও এখন জনম-মরণ-ভয়নিবারণ সত্যসনাতন সচ্চিদানন্দপুরুষের পদারবিন্দ-বন্দনাপুরঃসর ভাবুক ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।

ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবো মাং প্রসীদতু ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্ণবমস্তু



আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের
অমর অবদান

সারস্বত গ্রন্থাবলী

১ ব্রহ্মচর্য সাধন

প্রতি সংস্করণ

গ্রন্থকারের চিত্র সম্বলিত

মূল্য ১'২৫

বাঙ্গালা—চতুর্দশ সংস্করণ

ইংরেজী—প্রথম সংস্করণ

অসমীয়া—চতুর্থ সংস্করণ

হিন্দী—দ্বিতীয় সংস্করণ

উড়িয়া—প্রথম সংস্করণ

সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তি ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পুস্তকখানিতে ব্রহ্মচর্যসাধনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাহার উপকারিতা বিবৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য রক্ষার (বীৰ্য্যধারণের) কতকগুলি যোগোক্ত সাধনপ্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। শুক্রসম্বন্ধীয় রোগের স্বরশাস্ত্রোক্ত ও অবধৌতিক ঔষধের ব্যবস্থা আছে।

২ যোগীশুর

চতুর্দশ সংস্করণ—মূল্য ৩'০০

যোগ ও সাধন-পদ্ধতি

সহজ উপায়ে যোগশিক্ষার অপূর্ব গ্রন্থ।

হিন্দী সংস্করণ—৩'০০

৩ জ্ঞানীশুর

গ্রন্থকারের চিত্র সম্বলিত

১০ ম সংস্করণ

মূল্য ৫'০০

ইহাতে জ্ঞান ও যোগের উচ্চাঙ্গ-

সমূহ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে

আংশিক সূচী উদ্ধৃত হইল।

নানাকান্ডে—ধর্ম কি, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, শাস্ত্র-বিচার, তন্ত্র-পুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতারহস্ত, একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন, হিন্দুধর্মের গৌরব, হিন্দুদিগের অবনতির কারণ, হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব, দৈতাদৈবত বিচার, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি।

জ্ঞানকাণ্ডে—জ্ঞান কি, জ্ঞানের বিষয়, সাধনচতুষ্টয়, অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি, সমাধি অভ্যাস, জ্ঞানযোগ, ব্রহ্ম-নির্বাণ ইত্যাদি।

সাধনকাণ্ডে—সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুণ্ডলিনীসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ ও তৎসাধন, প্রাণায়াম সাধন, প্রকৃতিপুরুষযোগ, যোনিমুদ্রা সাধন, ভূতশুদ্ধি সাধন, জীবন্মুক্তি, যোগবলে দেহত্যাগ ইত্যাদি।

৪ তান্ত্রিকগুরু

এতদ্দেশে তন্ত্রমতেই দীক্ষা ও নিত্য-

নবম সংস্করণ

নৈমিত্তিক ক্রিয়াবলাপ হইয়া থাকে।

গ্রন্থকারের হাক্‌টোন চিত্রসহ

স্বতরাং এ পুস্তকখানি যে সাধারণের

মূল্য ৩.০০ মাত্র

বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই

বাহ্যল্য। সাধারণের অবগতির জ্ঞাত নিম্নে সূচীগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

মুক্তিকল্পে—তন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রোক্ত সাধনা, মকারতত্ত্ব, সপ্ত আচার, ভাবত্ৰয়, তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ, শক্তি উপাসনা, দেবমূর্তিতত্ত্ব, সাধনার ক্রম ইত্যাদি।

সাধনকল্পে—গুরুকরণ ও দীক্ষাপদ্ধতি, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, অন্তর্ধাণ বা মানসপূজা, জপরহস্য ও সমর্পণবিধি, পঞ্চমকারে কালীসাধনা, চক্রাঙ্ঘ্রান, তন্ত্রের ব্রহ্মসাধন, তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে—যোগিনীসাধন, হনুমদেবের বীরসাধন, সর্বজ্ঞতা লাভ, দিব্যদৃষ্টি লাভ, অদৃশ্য হইবার উপায়, অগ্নি নিবারণ, শূলরোগ প্রতিকার, জ্বরাদি সর্বরোগ শাস্তি, কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

৫ প্রেমিকগুরু

ইহাতে জীবনের পূর্ণতম সাধনা

অষ্টম সংস্করণ

প্রেমভক্তি ও মুক্তির বিষয় বিশদরূপে

গ্রন্থকারের প্রতিমূর্তি সহ

বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির

মূল্য ৩.২৫

জ্ঞাত সংক্ষিপ্ত সূচী উদ্ধৃত হইল।

পূর্ববন্ধে—ভক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, ভক্তিবিশয়ে অধিকারী, ভক্তিলাভের উপায়, চতুষ্টয় প্রকার ভক্তির সাধনা, চৈতন্যোক্ত সাধনপঞ্চক, পঞ্চভাবের সাধনা, রাধাকৃষ্ণ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, শাক্ত ও বৈষ্ণব, কিশোরীভজন, শৃঙ্গারসাধন ইত্যাদি।

উত্তরস্কন্ধে—ভক্তিই মুক্তির কারণ, মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ, বেদান্তোক্ত নির্বাণ মুক্তি, মুক্তিলাভের উপায়, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ, অবধূতাঙ্গ সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর কর্তব্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তদ্বর্ষ, আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরান্দদেব, ভগবান্ রামকৃষ্ণ, জীবমুক্ত অবস্থা ইত্যাদি।

৬ মায়ের কৃপা

এই গ্রন্থে মা—কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা অধিকারভেদে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীগুরুর কৃপাই যে সাধনা ও সিদ্ধির মূল, তাহা সত্য ঘটনাবলদ্বনে লিখিত হইয়াছে। উপদেশগুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রদান করিয়াছেন। অষ্টম সংস্করণ, মূল্য ৬০ পয়সা মাত্র। হিন্দী সংস্করণ ১ টাকা।

৭ কুস্তযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী

এই গ্রন্থে কুস্তযোগ, তাহার স্থান ও সময়, সাধুসম্মিলনী কি উদ্দেশ্যে কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাধকগণের বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। বিগত ১৩২১ সালের চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুস্তমেলা হইয়াছিল, ইহাতে তাহার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ১২৫।

৮ তত্ত্বমালা প্রথম খণ্ড

এই খণ্ডে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, মহাবিজ্ঞাতত্ত্ব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় পূজা-পার্বণ ও উৎসবদির তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ১০০ টাকা মাত্র।

৯ তত্ত্বমালা দ্বিতীয় খণ্ড

এই খণ্ডে—ভগবত্তত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, নীলাতত্ত্ব, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎসবদির তত্ত্বসমূহ বিবৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের চরম তত্ত্ব অবগত হইবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ১০০ টাকা মাত্র।

১০ তত্ত্বমালা তৃতীয় খণ্ড

এই খণ্ডে আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগতত্ত্ব, যোগনিদ্রাতত্ত্ব, নিবৃত্তিতত্ত্ব, সেবাতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, মৃত্যুতত্ত্ব, অশৌচতত্ত্ব, উৎসবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব ইত্যাদি হিন্দুর সাধনা-সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১'২৫ মাত্র।

১১ সাধকাষ্টক

এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পুত্র জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক চরিত্র-গঠন ও ধর্ম্মলাভে বিশেষ সহায়তা করিবে। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ১'০০ টাকা মাত্র।

১২ বেদান্ত-বিবেক

ইহাতে নিত্যানিত্যবিবেক, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোষ-বিবেক, আত্মানাত্মবিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১'২৫

১৩ শিক্ষা

শিক্ষার আদর্শ, সমস্তা, সমাধান, প্রয়োগ—এই পর্ব্বচতুষ্টয়ে বিভক্ত। শিক্ষাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া দেখিবার ইহা অভিনব প্রয়াস। শিক্ষাকে কি করিয়া জীবনে ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্কেত এই পুস্তকে পাইবেন। ২য় সংস্করণ, মূল্য ২'০০ টাকা মাত্র।

১৪ উপদেশ-রত্নমালা

এই পুস্তকখানিতে ঋষি ও সাধু-মহাপুরুষদিগের কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। সপ্তম সংস্করণ, ০'৫০ পয়সা মাত্র।

১৫ স্তোত্রমালা

সারস্বত-মঠে পঠিত নিত্য-নৈমিত্তিক স্তোত্রসমূহের সংগ্রহ। বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। দশম সংস্করণ, ০'৫০ পয়সা মাত্র।

১৬ শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন-কথা, আত্মপরিচয়, তত্ত্বোপদেশ ও অভয়বাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহা গীতাপাঠের

শ্রায় শ্রী-পুত্রাদি পরিজন সমভিব্যাহারে প্রতিটি গৃহে নিত্য পঠিত হইলে সংসারে
বিমল আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ও
হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ মূল্য ৪০০ টাকা মাত্র।

১৭ অভয়বাণী

১৮ নিগমবাণী

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক শ্রীমদাচার্য স্বামী নিগমানন্দ
তদীয় শিষ্য-ভক্তবৃন্দ সমীপে লিখিত পরমহংসদেব তদীয় শিষ্য-ভক্তগণের
ও শ্রীমুখ-কথিত আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ নিকট স্বহস্তে যে সমস্ত উপদেশপূর্ণ
বাণীবিশেষের সংগ্রহ। হতাশায়ুক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত
নিরাশ প্রাণের একমাত্র অবলম্বন। পত্রাবলী হইতে সার্বভৌম বাণী-
ইহা পাঠ করিলে শক্তি, শান্তি ও গুণির সঙ্কলনে এই গ্রন্থের প্রকাশ।
আনন্দ পাইবেন। মূল্য ০৫০ পয়সা। মূল্য ০৫০ পয়সা মাত্র।

১৯ কীর্ত্তনমালা

সারস্বত মঠ, আশ্রম ও তদন্তর্গত সঙ্ঘসমূহে গীত কীর্ত্তন ও সঙ্গীতসমূহের
অপূর্ণ সমাবেশ। মূল্য ২০০।

২০ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণকে উপলক্ষ্য
করিয়া প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ-বাণীর অপূর্ণ সমাবেশ। অমৃতের মতই মধুর।
মূল্য ২০০ টাকা।

২১ নিগম-প্রসাদ

শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী তত্ত্ববাণী। ১৫০ টাকা।

২২ শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব সঞ্চয়ন

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে অভিনব গ্রন্থ। একাধারে বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণের
সার নির্ধায়াস এবং সাধনসিদ্ধি মহাপুরুষগণের মর্ম্মবাণীর অপূর্ণ সমাবেশ।
মূল্য ২০০ টাকা।

২৩ সঙ্ঘবাণী

সারস্বত সঙ্ঘের সম্যক্ পরিচয়,
তাহার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ভাবধারা,
সঙ্ঘসেবীদের কর্তব্যনির্দেশ। মূল্য
০.৫০ পরস।

২৪ মনঃশিক্ষা

মনকে লক্ষ্য করিয়া উদ্ভোষিত
সাধনোপদেশ—অচঞ্চল ব্রাহ্মীস্থিতি-
লাভের অব্যর্থ সঙ্কেত—শান্তির অমৃত
নির্ধার। মূল্য ২.০০ টাকা।

২৫ উৎকলতীর্থে

মনোরম ভাষার উড়িষ্কার তীর্থসমূহের প্রাঞ্জল বিবরণ; বহু দার্শনিক,
পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের প্রাণম্পর্শী সমাবেশ। মূল্য ৪.০০
টাকা।

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের

হাফ্টোন প্রতিমূর্ত্তি

বড় সাইজ ১. টাকা, মাঝারী সাইজ ১০ আনা, ছোট সাইজ নানা রকমের
—প্রত্যেকটি ১০ আনা। কার্ড সাইজ পকেটে রাখার উপযুক্ত ৮০ আনা।

—প্রাপ্তিস্থান—

- (১) আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ (যোরহাট) আসাম।
- (২) দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা।
- (৩) মহেশ লাইব্রেরী, ২১১, শ্রামাচরণ দেষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

আর্য্য-দর্পণ

[সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র]

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারি-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত
ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। ৬১তম বর্ষ (১৩৭৫) চলিতেছে।
বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডলসহ ৫. পাঁচ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম,

পোঃ হালিসহর (২৪ পরগণা)।

সারস্বত মঠান্তর্গত শাখাশ্রম ও সঙ্ঘসমূহ হইতে প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

ঠাকুরের চিঠি—ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণ-সমীপে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। ১ম খণ্ড ১১০, ২য় খণ্ড ১১০ সিকা, ৩য় খণ্ড ১১০ সিকা।

সন্মিলনীর চিঠি—১৩৩৮ হালিসহর ভক্ত-সন্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশরাশি। ১২ টাকা।

ঠাকুর হরিদাস—শ্রীময়হাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ, নামসাধনার মূর্ত্ত-বিগ্রহ ঠাকুর হরিদাসের পুত্র জীবন-কথা। মূল্য ১০ আনা।

হিন্দুধর্ম—হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ। মূল্য দুই আনা।

জয়গুরু নাগ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন—মূল্য দশ পয়সা।

সদগুরু নিগমানন্দ—শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন বিশ্লেষণ। এক টাকা।

দেবকের দিনলিপি—সাধকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের বাণী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১২ এক টাকা হিসাবে।

নিগম-স্মৃতি—কবিতার ছন্দে ঠাকুরের জীবন-কথা। মূল্য ছয় আনা।

শ্রীশ্রীগুরুগীতা—সংস্কৃত মূল ও তাহার প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ। ছয় আনা।

আচার্য্যপ্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবসম্পর্কিত। গুরু-শিষ্য বা ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলার উচ্ছল প্রকাশ। মূল্য ১২ এক টাকা।

আমি কি চাই—ঠাকুরের প্রাণের চাওয়া। ১০ আনা।

হিন্দুবোধন—যুমন্ত জাতির জাগরণের বিদ্যুদ্গুণ। বার আনা।

নিয়মপঞ্চক—শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রোক্ত পাঁচটি নিয়মের প্রাঞ্জল বিস্তার। ১০ আনা।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনগঠনোপযোগী উপদেশ-রাশিতে সমলঙ্ঘিত—প্রতিগৃহে রাখার এবং বিবাহবাসরে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত। পরিবর্দ্ধিত অভিনব তৃতীয় সংস্করণ। ৩২ টাকা।

নিত্যালোকের ঠাকুর—ভাবলোক বা নিত্যালোকের অপূর্ণ বর্ণনা। ১২

মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর—২য় সংস্করণ, বার আনা।

কামাখ্যায় কুমারীপূজা—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ণ সমাবেশ। সাধকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অনুভূতি; শেষাংশে কবিতায় ‘কামাখ্যাदर्शन’। মূল্য ১৮ টাকা মাত্র।

নিগমানন্দদর্শন—সমস্বয়ী চিন্তার মৌলিক আকর। “শঙ্করের মত ও গৌরান্দের পথ”—এর দার্শনিক বিশ্লেষণ। মূল্য ২৮ টাকা।

অমিয় স্মৃতি—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের অমিয় মধুর স্মৃতি অবলম্বনে রচিত কবিতার নিবন্ধ। মূল্য ১০।

প্রেমসেবোত্তরা গতি—বৈষ্ণবশাস্ত্র মহনে উদ্ভূত অমৃত লহরী। ২৮ টাকা।

গুরুপূর্ণিমা ৯/০, ঝুলনপূর্ণিমা ১০ আনা, জন্মাষ্টমী ১০ আনা।

শঙ্করের মত ও গৌরান্দের পথ—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। ১৮ টাকা।

মিলন-বাণী—স্বললিত কবিতার ছন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী। প্রথম খণ্ড ১৮ টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮ টাকা।

ছন্দে অভয়বাণী—কবিতার আকারে গ্রথিত শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী। ১০ আনা।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃতসিন্ধু—গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে অপরূপ গ্রন্থ। গুরু-ভক্তের প্রাণের নিধি। মূল্য বার আনা।

শ্রীশ্রীসদগুরুমহিমা—পঞ্চছন্দে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন। ১০ আনা।

শ্রীশ্রিনিগমানন্দ-কথামৃত—১ম খণ্ড ৩৮, ২য় খণ্ড ৩ ও ৩য় খণ্ড ২৮ হিঃ।

সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ ৩৫০, ভক্তচরিতামৃত ২০০, শ্রীকৃষ্ণ ৪০০

নীলাচলের পথে—শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় স্মৃতি-বিজড়িত বিরহ-বিধুর ভক্ত-প্রাণের মর্শ্বনিঙাড়ী ভাবোচ্ছ্বাস। মূল্য ১০ আনা।

কচির কুজন—সুকুমারমতি কচি, কাঁচা ও কিশোর ছাত্রদের উপযোগী বিবিধ ছন্দে গাঁথা ২১টা সরল ও জ্ঞানগর্ভ কবিতার সমাবেশ। জীবন-গঠনের যাহুমন্ত্র। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ (বোরহাট) আসাম।

২। দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণা)।

৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২১১, গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

